পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

গবেষক

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অভীক মজুমদার

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certified that the Thesis entitled

"পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ" Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Sri Aveek Majumder, Assistant Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata-32. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Candidate:

Dated: Dated:

সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

শুরুর কথা ১

প্রথম অধ্যায়- প্রতিগ্রহণ: হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাক্-পঞ্চাশ আধুনিক বাংলা কবিতা ৭৫

২.১ তিনের দশকের কবি ও কবিতা ৭৫

২.২ চারের দশকের কবি ও কবিতা ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়- জীবনানন্দ দাশ ও পাঁচের দশকের কবি ও কবিতা ১০৭

৩.১ জীবনানন্দ দাশের কাব্য পরিক্রমা ১০৭

৩.২ পাঁচের দশকের কবি ও কবিতা ১১৮

চতুর্থ অধ্যায়- পঞ্চাশের কবিদের জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ১৬১

৪.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ১৬২

৪.১.১ কবিতার ছন্দে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ ১৬৩

৪.১.২ অনন্ত নক্ষত্রবীথিঃ জীবনানন্দীয় পঙ্‌ক্তি উপমা ও চিত্রকল্পের প্রতিগ্রহণ ১৯৯

৪.১.৩ প্রেম, প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ২২৬

৪.২ বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ২৪৭

৪.৩ আরো তিনজন কবির কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ২৮৪

৪.৩.১ আলোক সরকারের কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ২৮৪

৪.৩.২ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ ২৮৯

৪.৩.৩ উৎপল কুমার বসুর কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ২৯৬

অবশেষে ৩২২

গ্রন্থপঞ্জী ৩৪৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লিখতে গিয়ে আমি বহু মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। এই সহায়তা ছাড়া আমার পক্ষে এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হতো।

সবার প্রথমে আমি আমার মা বাবা সহ পরিবারের সকল আত্মজনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তাঁদের নিয়মিত উৎসাহ না পেলে এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভবপর হতো না। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

আমার গবেষণার পথ প্রদর্শক আমার মাস্টারমশাই এবং এই অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক অভীক মজুমদারের সুচিন্তিত পরামর্শই ছিল আমার পাথেয়। আমার প্রগলভতায় কখনো এতটুকু ধৈর্য না হারিয়ে সস্নেহে তিনি শুধরে দিয়েছেন যাবতীয় ভুলত্রুটি। তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে যখনই প্রয়োজন সময় দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভবপর হতো না। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

তুলনামূলক সাহিত্যে আমার শিক্ষক অধ্যাপক স্বপন মজুমদার এই গবেষণা শুরুর সময়ে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার শিক্ষক অধ্যাপিকা শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত বিভিন্ন সময়ে সুপরামর্শ এবং বেশ কয়েকটি গ্রন্থ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপিকা সুচরিতা চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর মূল্যবান এবং সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম পাঠ যাঁর থেকে নিয়েছি সেই অধ্যাপিকা ঈপ্সিতা চন্দ এই কাজে আমাকে ভীষণ ভাবেই সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক স্যমন্তক দাস, অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ঈপ্সিতা হালদার, অধ্যাপিকা দেবশ্রী দত্তরায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সোমা মুখোপাধ্যায় সহ আমার অন্যান্য শিক্ষকরাও এই কাজে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারের সহায়তা না পেলে এই অভিসন্দর্ভের কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থাগার হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, সন্দীপ দত্ত পরিচালিত লিটিল ম্যাগাজিন গবেষণা কেন্দ্র কলকাতা, পূর্বাশা গ্রন্থাগার, বালি, জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া, বালি সাধারণ পাঠাগার, বেলুড় সাধারণ পাঠাগার, ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং সমস্ত কর্মীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত পিনাকী মন্ডল মুদ্রণের কাজে আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা যেত না। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেছে আমার অনুজ শ্রীমান শান্তিরঞ্জন। তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আর সবশেষে আমার সহধর্মিনী পৌষালীকে জানাই ধন্যবাদ। তার সাহায্য এবং মূল্যবান পরামর্শ ছাড়া অন্যান্য কাজের মতো এই কাজটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত না। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়াস অতিশয় দুঃসাধ্য।

শুরুর কথা

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ"। এখান থেকে প্রাথমিক ভাবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে গবেষণাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হল কবিতা। আরও একটু স্পষ্টভাবে বললে বাংলা কবিতা কিংবা স্পষ্টতর অর্থে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের বাংলা কবিতা। চৈনিক বাক্সের মতো যদি এইভাবে একের পর এক পরত উন্মুক্ত করতে করতে এগোই তাহলে পেতে থাকব নিম্নলিখিত শব্দগুলি- দশক, পাঁচের দশক, পাঁচের দশকের কবি, তাঁদের কবিতা এবং সেইসব কবিতায় জীবনানন্দ দাশের প্রতিগ্রহণ।

সাহিত্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি মেনে যদি বিষয়টিকে সমস্যায়িত করার চেষ্টা করি, তাহলে গবেষণার বিষয়টি থেকে কিছু প্রশ্নের জন্ম হয়-

বিষয় নির্বাচনের পিছনে কী যুক্তি ?

বাংলা কবিতায় দশক বিভাজনের ভিত্তি কী ?

পাঁচের দশকের কবিদের চিহ্নিতকরণ কীভাবে করা হচ্ছে ?

পাঁচের দশকের কবিদের কবিতার সামান্য লক্ষণ কী ?

প্রতিগ্রহণের তাত্ত্বিক স্বরূপ কী?

এর মধ্যে শেষ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলিকে ধাপে ধাপে সমাধানের প্রচেষ্টা রইল।

বিষয় নির্বাচন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এম ফিল পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভ নির্মাণের সময়ে আমার নির্বাচিত বিষয় ছিল- "একটি শালিখ ও একটি প্রকৃত সারস: বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের পরিগ্রহণ"। এই কাজটি করার সময়ে আমার মনে হয় শুধু বিনয় মজুমদারই একা নন, তাঁর পাশাপাশি পাঁচের দশকের অন্যান্য অনেক কবির কবিতাতেই জীবনানন্দের প্রভাব রয়েছে। সেই ভাবনা থেকে শুরু হয় অনুসন্ধান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পি এইচ ডি র মতো এম ফিল স্তরের গবেষণা সন্দর্ভ রচনার সময়েও আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক অভীক মজুমদার। ফলে ইতিবাচক সাড়া পেতে সময় লাগেনি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শকে পাথেয় করে এম ফিলের পরেই এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনো শুরু করি নিবিড়ভাবে। সুতরাং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ব স্তরের গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টির সাদৃশ্য যে পক্ষপাতিত্ব করেছে, সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

এতো গেল ব্যক্তিগত পূর্ব অভিজ্ঞতার সালতামামি। এরপর আসা যাক নির্বাচিত বিষয়টির সাহিত্যিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে।

সেই চর্যাপদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার ইতিহাস মোটেও অর্বাচীন নয়। প্রায় হাজার বছরের ব্যাপ্তি জুড়ে আছে তার অস্তিত্ব। লুইপাদ থেকে মুকুন্দ চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র হয়ে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-সুনীল-শক্তি-জয়-শ্রীজাত ছুঁয়ে রাকা দাশগুপ্ত তে এসেও ক্রমশ এগিয়ে চলেছে তার যাত্রা। বলাই বাহুল্য, আসা যাওয়ার পথের চেহারা ছিল না সোজা-সমান্তরাল। বারেবারেই তা নিয়েছে বাঁক- কখনো সংরূপের

দিক থেকে আবার কখনো সেই বক্রতা বিষয়গত। আমার এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা কবিতার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে এইরকম দুটি বাঁক চিহ্নিত করে তাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বৃহত্তর অর্থে আমার আলোচনায় এই বাঁকদুটি হল তিনের দশকের কবিদের বাংলা কবিতা আর পাঁচের দশকের কবিদের বাংলা কবিতা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার সূচনা পর্বকে চিহ্নিত করতে গেলে বিশ শতকের তিনের দশকের কবিদের কাছে যেতে হয়। সেই দলের প্রধান কবিদের অন্যতম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে। এদের প্রধান সমস্যা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে কবিতা লেখা সেই সময়ের নিরিখে ছিল অতি দুঃসাধ্য এক কাজ। অথচ বাংলা কবিতার স্বার্থে সেই অতিক্রম অত্যন্ত জরুরী ছিল। রবীন্দ্রনাথ *শেষের কবিতা*-এ অমিত রায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন-

> " ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম; বলব, নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।" [১]

সাহিত্যের চলার পথে নতুনত্বের বাঁক থাকাটা তার টিকে থাকার জন্যই জরুরী। নয়তো সেই সাহিত্য মৃত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার নতুন পথে চলার প্রয়োজন ছিল। তিনের দশকের এই কবিরা ছিলেন সেই বক্রতার দিশারী। ফলে তিনের দশক এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার নতুন পথ চলার শুরুকে চিহ্নিত করা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বলাই বাহুল্য, অনেক আগেই এই বাঁকটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই নিয়ে একাধিক গুণীজন সবিশেষ গবেষণা করেছেন। রচিত হয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এর মধ্যে অন্যতম হল বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়া এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু রচিত *কালের পুতুল* এবং *An Acre of Green Grass* বইদুটিও উল্লেখযোগ্য। দীপ্তি ত্রিপাঠী রচিত *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থটিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থটির পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* -গ্রন্থটি। এই বইটিও আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস জানার জন্য একটি অনবদ্য হাতিয়ার। এছাড়া এই প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার শিকদার রচিত *আধুনিক কবিতার দিগবলয়* এবং *কবির কথা কবিতার কথা* গ্রন্থদুটির নামও উল্লেখ করা যায়। তিনের দশকের কবিতার এই ধারাকে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্রথম বাঁক বলা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাত্রাপথে তার দ্বিতীয় বাঁকটি নিল চারের দশকে এসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার আনুসঙ্গিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতে এই সময়ের বাংলা কবিতা বিষয়গত দিক থেকে হয়ে উঠল অন্যরকম- আগের দশকের থেকে আলাদা। ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠার পরিবর্তে কবিতায় উঠে আসতে লাগল সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত শোষণ,পীড়ন, যন্ত্রণার কথা।সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী একদল নতুন কবি-নক্ষত্র ব্যোমকেশরূপে আবির্ভূত হলেন বাংলা কবিতার ব্যোমপথে। কবিতায় ঠাঁই পেল রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতা। এই নতুন কবিদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সমর সেন (১৯১৬), সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬) প্রমুখ। এই কবিদের মধ্যে শুধুমাত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর প্রধানত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখাতেই পরবর্তী সময়ে ভাবগত বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন এসেছে। বাকিরা হয় কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন (সমর সেন) কিংবা স্বল্পায়ু হওয়ায় রচনায় বৈচিত্র্য আনতে পারেন নি (সুকান্ত ভট্টাচার্য) অথবা স্বভাবতই একমাত্রিক হওয়ায় হাতে গোনা কয়েকজন বাদ দিলে এই দশকের অধিকাংশ কবিরা পরবর্তীকালের কবিতায় তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আধুনিক বাংলা কবিতা তৃতীয় বাঁকটি নিল পাঁচের দশকে এসে। এই সময় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত *কৃত্তিবাস* পত্রিকার হাত ধরে উঠে এলেন একঝাঁক তরুণ কবি যারা দীর্ঘদিন বাংলা কাব্যজগতে বিচরণ করবে। এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যেমন- আলোক সরকার(১৯৩১) , শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১), শঙ্খ ঘোষ(১৯৩২) , শক্তি চট্টোপাধ্যায়(১৯৩৩) , অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪) ,তারাপদ রায়(১৯৩৬) , উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭) প্রমুখ। শুধু কৃত্তিবাস নয় তারও আগে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত দীপঙ্কর দাশগুপ্ত এবং আলোক সরকার সম্পাদিত *শতভিষা,* নারায়ণ চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায় এবং অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *উত্তরসূরী* (১৯৫২), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র রায় সম্পাদিত *সীমান্ত* (১৯৫৩) কিংবা জগদিন্দ্র মন্ডল ও সমর চক্রবর্তী সম্পাদিত *ময়ুখ* (১৯৫৩) কিংবা তখনো স্বমহিমায় বর্তমান বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* (১৯৩৫) পত্রিকা, এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের *পূর্বাশা* (১৯৩২)-র নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই পাঁচের দশকের কবিদের সঙ্গে পূর্বের তিনের দশকের কবিদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন-

তিনের দশকের কবিদের উত্থান ছিল মূলত কয়েকটি পত্রিকাকে ঘিরে যেমন *কল্লোল, পরিচয়, প্রগতি, কবিতা*। তেমনি পাঁচের প্রধানতম কবিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত *কৃত্তিবাস* পত্রিকার নাম। এর পাশাপাশি *শতভিষা* (১৯৫১) এবং *কবিতা*(১৯৩৫) পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য।

তিনের কবিদের কাছে প্রধান সমস্যা যেমন ছিল রবীন্দ্র-প্রভাব এড়ানো, পাঁচের কবিদের কাছে তেমনি বাধাস্বরূপ ছিলেন জীবনানন্দ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে জীবনানন্দের প্রভাব সেই সময় তরুণ কবিদের কাছে কেমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল-

> "প্রথম দিকে জীবনানন্দকে অনুসরণ করে অনেক লিখেছি। প্রথম দিকে সবার ক্ষেত্রেই তো এরকম ঘটে। পরে নিজের স্বতন্ত্র উচ্চারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি এবং পেয়েছি"[২]

তৃতীয়ত কবিতার মেজাজ ও বিষয়ভাবনাতেও তিন ও পাঁচের দশক যেন অগ্রজ আর অনুজ। উভয় সময়ের কবিতাতেই ধরা পড়েছে ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির নিবিড় উচ্চারণ। চারের দশক এক্ষেত্রে যেন অনেকটাই আলাদা। রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতা ওই দশকের কবিতার প্রধান বিষয়ভাবনা। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই পাঁচের দশকের কবিরা তাঁদের কবিজীবনের প্রথম পর্বে প্রভাবিত হয়েছেন তিনের দশকের কবিদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে তিনের দশকের মূলত দুজন কবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন

বুদ্ধদেব বসু এবং জীবনানন্দ দাশ। এই দুই কবিই পাঁচের দশকে সৃষ্টিশীল। যদিও জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর প্রয়াত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে চলেছে অসংখ্য অপ্রকাশিত কবিতা। আর বুদ্ধদেব গোটা পাঁচের দশকেই শুধু নিজে সৃষ্টিশীলই নন, বরং তাঁর *কবিতা* পত্রিকার হাত ধরে উঠে আসছে অনেক নবীন প্রতিভা। স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরই প্রথম রচিত কবিতা 'যম' প্রকাশিত হয়েছিল ওই *কবিতা* পত্রিকাতেই। ফলে নতুন কবিদের সাথে তিনের দশকের কবিদের সম্পর্ক তখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনের দশকের কবিদের সঙ্গে পাঁচের দশকের কবিদের সমীকরণ তাই বহুমাত্রিক। ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েও *বনলতা সেন* বইটি জনমানসে ততটা পরিচিতি লাভ করতে পারেনি যতটা পেরেছিল তার দশ বছর পরে ১৯৫২ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়ে। কবির মৃত্যুর পরে ১৯৫৭ সালে ওই সিগনেট প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয় কবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *রূপসী বাংলা* । এই দুই গ্রন্থের জন্য জীবনানন্দের কবিখ্যাতি সমালোচক মহল থেকে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণের দরবারে। ফলে পাঁচের দশক যেন জীবনানন্দের নব পরিচয় লাভ। তাই তিনের দশকের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী কবির কাব্যপ্রতিভার প্রতিগ্রহণ ঘটেছে পাঁচের দশকে এসে। এই প্রতিগ্রহণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস তাই বাংলা কবিতার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। তাই তিনের দশকের কবিদের মধ্যে থেকে জীবনানন্দ দাশকে নির্বাচন করে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করছি কীভাবে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় তাঁর প্রতিগ্রহণ ঘটেছে।

বাংলা কবিতায় দশক বিভাজনের ভিত্তি

এরপর আসা যাক একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয়ে- বাংলা কবিতায় দশক বিভাজন। প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত সাহিত্য সৃষ্টি হয় আগে আর তার বিশ্লেষণ হয় পরে। সুতরাং দশ বছর পর পর বাংলা কবিতা তার স্বরূপ পরিবর্তন করবে এটা বাস্তবসম্মত নয়। কালের নিয়মেই বাংলা কবিতা তার গতিপ্রকৃতি পাল্টেছে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যই এই দশক বিভাজনের আয়োজন। দশক বিভাজন না করলে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো কেননা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় কোনো রবীন্দ্রনাথ নেই। ফলত কোনো বিশেষ কবিপ্রতিভার নামে কালসীমা চিহ্নিতকরণ এই সময়ে সম্ভবপর হয়নি। ইতিপূর্বে বাংলা কবিতার কালানুক্রমিক বিভাজনের ক্ষেত্রে আদি যুগ থেকে মধ্যযুগ অবধি সাহিত্যবর্গ এবং সাহিত্যকর্মের ভিত্তিতে যুগবিভাজন করা হয়েছে যেমন- চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য- প্রভৃতি। যেহেতু তখন সমগ্র বাংলা সাহিত্যই কবিতায় রচিত ছিল, তখন এই সমস্যা ঘটেনি। কখনো এই বিভাজন ব্যক্তির নামেও করা হয়েছে যেমন- চৈতন্য যুগ, প্রাক্-চৈতন্য যুগ, চৈতন্যোত্তর যুগ। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংলা সাহিত্যের কোনো কবি ছিলেন না। সেই সময়ের রচিত সাহিত্যকর্মের ওপর তাঁর জীবন ও কর্মের প্রভাবকে মনে রেখেই এই যুগ বিভাজন। আধুনিক যুগেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কোনো সর্বসম্মত কাল বিভাজনের রূপরেখা দেখা যায় না। কখনো তা সাহিত্যবর্গ বা উপবর্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেমন কবিগানের যুগ কিংবা মহাকাব্যের যুগ আবার কখনো কোনো স্পষ্ট যুগ বিভাজনের ভিত্তির অভাবে তা আশ্রয় গ্রহণ করেছে ব্যক্তিনামের, যেমন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বা

ঈশ্বর গুপ্তের নামে। কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ আর কিছুটা মধুসূদন ছাড়া স্বনামে বাংলা কবিতায় যুগ বিভাজন হবার মতো কবিপ্রতিভা এ বঙ্গে জন্ম নেয়নি। চৈতন্যদেবের বিষয়টি আগেই বলেছি স্বতন্ত্র। কবিপ্রতিভা নয় বরং মানবিক প্রতিভাবলেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ যুগনায়কের প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যে পড়বে, সে কথা অনস্বীকার্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় যুগ বিভাজনের কোনো সুস্পষ্ট ভিত্তি তৈরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সময়কালকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্র-যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। সেই সময়ে অন্য কোনো সুবৃহৎ কবিপ্রতিভাও জন্ম নেননি, ফলে কোনো সমস্যা হয়নি।

সমস্যা দেখা দিল ১৯২৩ সালে প্রকাশিত *কল্লোল* পত্রিকা এবং তার পরে পরে *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *পরিচয়* (১৯৩১), *কবিতা* (১৯৩৫) প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর সেইসব কবিদের কবিতায় ভিন্ন, নতুন সুরের আভাস পেয়ে।

আগেই বলেছি কবিতা লেখা হয় আগে, আর তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে পরে। তাই ‘কল্লোল গোষ্ঠী’র কবিদের স্থান নিয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনায় সমস্যা ১৯২৩ সালেই শুরু হয়নি বরং হয়েছে অনেক পরে, যখন তার পরের বেশ কয়েকটি বাঁক বাংলা কবিতায় এসে চলে গেছে। ফলে কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের থেকে সমর সেন(১৯১৬), সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৯২০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী(১৯২৪), সুকান্ত ভট্টাচার্য(১৯২৬) হয়ে বাংলা কবিতা যখন আলোক সরকার (১৯৩১), শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১) , শঙ্খ ঘোষ(১৯৩২) , শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩), অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত(১৯৩৩) , সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪) ,তারাপদ রায়

(১৯৩৬),উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭)-এঁদের দরজায় কড়া নেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ভাস্কর চক্রবর্তী(১৯৪৫)-মণিভূষণ ভট্টাচার্য(১৯৩৮), দেবারতি মিত্র (১৯৪৬)র দরবারে, তখন পিছন ফিরে দেখা গেল রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা কী, সে প্রশ্নের কোনো আবছা উত্তর খোঁজার আগে বলা ভাল রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা অনেক রকমের। এইবার প্রয়োজন পড়ল সেই কবিতাপুঞ্জের যুগবিভাজনের। শেষ থেকে শুরু করাই যায়। এক্ষেত্রেও হয় নি তার অন্যথা। সেই সময়ে বাংলায় ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব জীবন ও সাহিত্যে ছিল ব্যাপক। সেই নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ইতিহাস এবং সাহিত্যে উঠে এল একটি সুদূরপ্রসারী কালসীমা- সাতের দশক। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম। যদিও নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা ছয়ের দশকের শেষ দিকে থেকেই, তবু এই দশককে নয় বরং সাতের দশককেই সংযুক্ত করা হয় নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে। কারণ আন্দোলনের প্রভাব সাতের দশক জুড়েই ছিল সবচেয়ে বেশি। এইভাবে যখন একটি আন্দোলনের সঙ্গে একটি দশক সম্পর্কিত হয়ে পড়ল, তখনই হয়ত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার সময় বিভাজনের একটি অন্যতম আয়ুধ হতে চলেছে দশক। কথাটি হয়তো নেহাতই অত্যুক্তি নয়। সাতের দশকে রচিত বাংলা কবিতার মধ্যেও নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব স্বল্প নয়। সুতরাং এক দিক থেকে দেখলে দশ বছরের সময়সীমার ব্যবধানে বাংলার পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কবিতার ভাষ্যও বদলে বদলে গেছে। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৩৯ সাল থেকে শুরু হলেও তার প্রভাব ও ব্যাপকতা এবং বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে

তার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি অনুভব করা গেছে চারের দশকেই। আর এই অস্থির সময়ে এই চারের দশকেই উঠে এসেছেন একদল রাজনৈতিক সচেতন কবি যাদের লেখায় ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির চেয়ে সমষ্টি চেতনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সুতরাং একে সময়ের দাবি ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। পাঁচের দশকের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের অর্থনীতি যখন নতুন করে সাবালক হবার চেষ্টা করছে, কারুর কাছেই নেই সুস্পষ্ট নিয়ম নীতি, রাস্তা, সেই সময় একদল নবীন কবি আশ্রয় খুঁজেছেন আদি কবির নামাঙ্কিত পত্রিকার মধ্যে। বাইরে আলো না পেয়ে ডুব দিয়েছেন আত্ম-অবগাহনে। এই সময়ের কবিতাগুলি তাই প্রধানত আত্মনিমগ্নতায় ভরা। ছয়ের দশকে এসে আবার সেই আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার অস্বস্তিকর দীর্ঘ উপস্থিতিতে ক্লান্ত হয়ে কবিরা ভাগ হয়ে গেছেন দুটি দলে। একদল রাজনৈতিক পথে খুঁজেছেন এর প্রতিকার, কারণ এ দশকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডও নেহাত কম নেই। লেগেছে চিন-ভারত যুদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টি হয়েছে একাধিকবার বিভক্ত। খাদ্যের দাবিতে কলকাতার পথে নেমেছে মানুষ, হয়েছে খাদ্য আন্দোলন। আর অন্যদল হতাশায় পেতে চেয়েছেন যৌনতার পরশ। ফলে পাঁচের থেকে ছয়ের দশকের কবিতার প্রকৃতি গিয়েছে বদলে।এইভাবে বলা যেতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতার যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট কবিকে ভিত্তি না ধরে এক একটি দশককে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনামটির দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করি-

“ পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ”

এখানে উল্লেখের বিষয় ‘কবিদের কবিতা’- এই অংশটি। কবিতা তো একমাত্র কবিরাই লেখেন। নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিক তো আর কবিতা লিখবেন না। তাহলে শিরোনাম থেকে তো ‘কবিদের’ শব্দটি বাদ দেওয়াই যায়। সেক্ষেত্রে শিরোনামটি দাঁড়াবে এইরকম-

“পাঁচের দশকের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ”

যদি প্রশ্ন করা হয়- আগের আর এই এখনকার শিরোনামের অর্থ একই কিনা, তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী উত্তর হল -না। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে যেসব কবিতা পাঁচের দশকে লেখা হয়েছিল, শুধুমাত্র সেইসব কবিতার মধ্যেই জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের স্বরূপ অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে মনে হচ্ছে আর প্রথম শিরোনামটির ক্ষেত্রে পাঁচের দশকের কবিদের রচিত যেকোনো কবিতার মধ্যেই কবির জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের মাত্রা নিরুপণ করা হবে- তার জন্য কবিতাটিকে পাঁচের দশকেই রচিত হতে হবে এমন কোনো দাবি নেই-কবিতাটি পরবর্তী সময়ের লেখাও হতে পারে। শুধু কবিকে হতে হবে পাঁচের দশকের।

এখানে একটি নতুন প্রশ্নের উৎপত্তি হল- ‘পাঁচের দশকের কবি’ হিসেবে কাদের চিহ্নিত করা হবে। একটি কবিতা পাঁচের দশকে রচিত হলে তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁচের দশকের কবিতা বলে স্বীকার করা যায়, কিন্তু কবিদের ক্ষেত্রে দশক বিভাজনের ভিত্তি কী হতে পারে, সেই ব্যাপারে আলোকপাত করতে হলে প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে, একজন কবিকে পাঁচের দশকের কবি হিসেবে চিহ্নিতকরণের জন্য কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ কাদের পাঁচের দশকের কবি বলা যাবে।

পাঁচের দশকের কবি

খুব সাধারণ অর্থে ধরতে গেলে, একজন কবির কবিতা যে দশকে রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তা সে গ্রন্থাকারেই হোক কিংবা পত্র-পত্রিকায়, তাকে সেই দশকের কবি হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়। যেমন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা *কৃত্তিবাস* -এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে, শঙ্খ ঘোষের ও তাই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও একই দশকে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫৮ সালে। সুতরাং বই অথবা পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের নিরিখে এরা সবাই পাঁচের দশকের কবি।

এই হিসেবে পিছন দিকে হেঁটে গেলে দেখা যাবে, ১৯২৩ সালে *কল্লোল* প্রকাশিত হলেও *পরিচয়* প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৩১ সালে এবং *প্রগতি* ১৯২৭ সালে। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হলেও তা মোটেও পরবর্তী সময়ের পরিণত জীবনানন্দের পরিচয় বাহক হতে পারেনি, বরং ১৯৩৬ সালের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থেই প্রকৃত পরিণত কবির আত্মপ্রকাশ। একই কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের তন্বী (১৯৩০) কিংবা বুদ্ধদেব বসুর *মর্মবাণী* (১৯২৪) কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও খাটে। সুতরাং দুই এর দশকে যাত্রা শুরু করলেও এঁদের কবিপ্রতিভার প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল তিনের দশকে এসে। সুতরাং এঁদের তিনের দশকের কবি হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়।

এইভাবে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে পাঁচের দশকের কবিদের চিহ্নিত করে এদের কবিতায় জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভার প্রতিগ্রহণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হবে।

অধ্যায় বিভাজন

এবার আসা যাক অধ্যায় বিভাজন প্রসঙ্গে। সমগ্র গবেষণাটিকে ভূমিকা ও উপসংহার বাদে চারটি মূল অধ্যায়ে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হবে। অধ্যায়গুলির শিরোনাম নিম্নরূপ-

শুরুর কথা

প্রথম অধ্যায়- প্রতিগ্রহণ: হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না

দ্বিতীয় অধ্যায়- প্রাক্-পঞ্চাশ আধুনিক বাংলা কবিতা

তৃতীয় অধ্যায়- জীবনানন্দ দাশ ও পাঁচের দশকের কবি ও কবিতা

চতুর্থ অধ্যায়- পঞ্চাশের কবিদের জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ

অবশেষে

ভূমিকা অংশে অর্থাৎ এই 'শুরুর কথা' তে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রামাণ্য অংশের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণার বিষয় নির্বাচনের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার ইতিহাসের ধারায় এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা রয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে মূল অভিসন্দর্ভে পৌঁছানোর আগে সামগ্রিক ভাবে গবেষণা-প্রশ্নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। গবেষণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা এখানে রয়েছে। এই অংশ থেকে আমার গবেষণার মূল প্রশ্নকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু গবেষণা-প্রশ্নকে চিহ্নিতকরণই নয়, এর

পাশাপাশি গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এই অংশটিতে। সুতরাং এটি যেন সমগ্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছে। এই অংশ থেকে গবেষণা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথম অধ্যায়টি গবেষণার পদ্ধতিগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই গবেষণার নিবন্ধীকরণ ঘটেছে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে যায় যে এখানে কোন্ তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট যে এই গবেষণা প্রতিগ্রহণ চর্চার অন্তর্গত। এখন এই প্রতিগ্রহণ চর্চা তুলনামূলক সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই আয়ুধের একটি তত্ত্বগত ভিত্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হবে। প্রভাব, অভিঘাত, প্রতিগ্রহণ- এই শব্দগুলি কাছাকাছি অর্থবহ হলেও যে তুলনামূলক সাহিত্যে এদের প্রত্যেকটির তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কেই আলোকপাত করার প্রচেষ্টা থাকবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সুতরাং তাত্ত্বিক দিক থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক সাহিত্যের পরিভাষা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস থাকবে এখানে। যেহেতু বাংলা ভাষায় রচিত কবিতাই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল সাহিত্যকর্ম, তাই প্রতিগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষার উদাহরণ স্বরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও কবিতাকেই তুলে ধরার চেষ্টা থাকবে এই অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি গবেষণাটিকে তুলনামূলক সাহিত্য চর্চা-পদ্ধতির ফসল হিসাবে প্রমাণিত করবে। প্রকৃপক্ষে "তুলনামূলক সাহিত্য" কোনো একমাত্রিক দ্যোতনা বহন করে না। কেউ একে সাহিত্য পাঠের পদ্ধতি বলে মনে মনে করেন তো কেউ ভাবেন বিষয়টির অচিরেই মৃত্যু ঘটে গিয়েছে- এখন প্রয়োজন সংস্কৃতি চর্চা। দেশ-কাল ভেদে 'তুলনামূলক সাহিত্য' এর তাৎপর্য গিয়েছে বদলে। একদা ফরাসি

দেশে যা শুরু হয়েছিল ফরাসি আর ‘অ-ফরাসি’ সাহিত্যের তুলনার আয়ুধ হিসেবে, পরবর্তীকালে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মার্কিন দেশে তা বদলে গেল সাহিত্যের সাথে বিভিন্ন ‘অ-সাহিত্য’ শিল্পমাধ্যমের সম্পর্ক নিরুপণের মাধ্যম হিসেবে। আবার ভারতের মতো বহুভাষাভিত্তিক দেশে যে তুলনামূলক সাহিত্যের একটি ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে সে কথা প্রমাণ করেছেন শিশির কুমার দাশ থেকে অমিয় দেব বা স্বপন মজুমদারের মতো সমালোচক। ভারতের প্রথম তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ চালু হয়েছে সেই ১৯৫৬ সালেই। তবু, আজো দুর্ভাগ্যজনক ভাবেই, কিছু কিছু পন্ডিতপ্রবরের কাছে তুলনামূলক সাহিত্যের অর্থ কেবলমাত্র দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভাষাতন্ত্রে রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে তুলনা। তাই তুলনামূলক সাহিত্যের কোনো গবেষক যখন একটি নির্দিষ্ট ভাষাতন্ত্রের দুই বা ততোধিক সাহিত্যকর্ম নিয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অভিসন্দর্ভ রচনা করতে আগ্রহী হন, তখন অবধারিত ভাবেই সেই মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে একটি কাজটি কোন দিক থেকে ‘কম্প্যারেটিভ’ অথবা অন্য কথায় কাজটিতে তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে এই কাজটিও একটি নির্দিষ্ট ভাষাতন্ত্রে অর্থাৎ বাংলায় রচিত সাহিত্যকর্ম নিয়ে । তাই এই গবেষকেরও সেই আশু প্রশ্নের জবাবদিহির দায় বর্তায়। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে তারই অবতারণা করা হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে এই গবেষণা প্রতিগ্রহণ চর্চার অন্তর্গত। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে এটি একদিক থেকে একটি অন্তর্ভাষিক প্রতিগ্রহণ চর্চার গবেষণা আবার অন্যদিক থেকে একে কালানুক্রমিক ইতিহাস লেখন চর্চার কাজও বলা যেতে পারে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট ভাষাতন্ত্র অর্থাৎ বাংলা ভাষার একটি বিশেষ সময়ের অর্থাৎ বিশ শতকের

পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় কীভাবে বাংলা ভাষারই তিনের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার বৈশিষ্টের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে, তার স্বরূপ নির্ণয় করা। সুতরাং একাধারে এটি প্রতিগ্রহণ এবং ইতিহাস লেখন চর্চা- উভয় পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে। প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা থাকছে।

এরপর আসা যাক দ্বিতীয় অধ্যায় প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়টিতে পাঁচের দশক পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা থাকছে। এই অধ্যায়টিকে দুটি উপ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হবে। অধ্যায়টির সেই বিভাগগুলি নিম্মরূপ-

ক) তিনের দশকের কবি ও কবিতা

খ) চারের দশকের কবি ও কবিতা

বাংলা কবিতার সঙ্গে 'আধুনিক' শব্দবন্ধটির যুক্ত হওয়া বেশ সমস্যা ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। 'আধুনিক' শব্দটির বহুমাত্রিকতা এবং বাংলা কবিতার জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুমহান অবস্থান এই মতান্তরের উৎস। একাধিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে 'আধুনিক' শব্দবন্ধটির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ব্যক্ত করেছেন। কখনো তা বুঝিয়েছে সময়ে থেকে এগিয়ে থাকাকে আবার কখনো ইওরোপীয় সাহিত্য আন্দোলনকে। আবার কোনো কোনো সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় আধুনিক কবি বাংলা কবিতায় কোনোদিন আসেনি না আর ভবিষ্যতেও আসবেও না। তাই বাংলা কবিতায় প্রথম ও শেষ আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ।

উপরের কোনো মন্তব্যকেই অস্বীকার না করে এটা বলা যায় যে আমাদের আলোচনায় 'আধুনিক' কবি ও কবিতার সূচনা হিসেবে একটি বিশেষ সময়ের কয়েকজন

কবির লেখা কিছু কবিতাকেই বোঝানো হয়েছে। সেই বিশেষ সময়টি বিশ শতকের তিনের দশক। দীপ্তি ত্রিপাঠী থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত- একাধিক বিদগ্ধ সমালোচকের যুক্তির অবতারণা করে সেই সময় কালকে প্রাথমিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই এই অধ্যায়ের প্রথম উপ অধ্যায়টির প্রাথমিক কর্তব্য। এইভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব নির্ণয় করার পরবর্তী ধাপে পাঁচের দশক পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা থাকছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে পূর্বের বাক্যে ' অতি সংক্ষিপ্ত' পদবাচ্যটির প্রয়োগের উদ্দেশ্য বিনয় প্রদর্শন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবেই এই ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এর কারণ মূলত দুটি- প্রথমত, আমাদের গবেষণার বিষয় পাঁচের দশকের বাংলা কবিতা। তাই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা ছাড়া তিনের দশকের বাংলা কবিতার এই নিবন্ধে একটিমাত্র ক্ষেত্রেই গুরুত্ব রয়েছে- তা হল জীবনানন্দের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য- যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা থাকছে। আর দ্বিতীয়ত, বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূচনা এবং স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে এ যাবৎকালে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। সেগুলির অধিকাংশই যথোপযুক্ত এবং সমর্থনযোগ্য। সুতরাং, তিনের ও চারের দশকের কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করে এই অভিসন্দর্ভটিকে অকারণে পৃথুলা করে তোলার কোনো বাসনে এই গবেষকের নেই। তাই মূল আলোচনার প্রেক্ষিত নির্মাণের তাগিদেই যত সংক্ষিপ্ত রূপে সম্ভব এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছে।

সামগ্রিক ভাবে পাঁচ-পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার প্রধান ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে তিন এবং চারের দশকের বাংলা কবিতার মূল সুরের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তিনের দশকে যেখানে কবিদের প্রধান সম্পদ আত্মনিমগ্নতা, চারের দশকে

সেখানে উঠে আসছে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। তাই মূল আলোচনাকে দুটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রথম অংশে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্বকে বিবৃত করে তিনের দশকের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে আর দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে চারের দশকের বাংলা কবিতার বিষয়গত পরিবর্তনের ধারাটিকে চিহ্নিত করে পরিচয় দেবার চেষ্টা থাকছে চারের দশকের কবি ও কবিতার। এইভাবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঁচ-পূর্ববর্তী বাংলা আধুনিক কবিতার বর্ণনা দিয়ে মূল আলোচনার প্রবেশকের ভূমিকা পালনের চেষ্টা থাকছে।

এরপর আসা যাক অভিসন্দর্ভটির তৃতীয় অধ্যায় প্রসঙ্গে। সমগ্র গবেষণার দিক থেকে দেখলে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-পঞ্চাশের কবিতা আলোচিত হচ্ছে আর এই অধ্যায়ে চেষ্টা থাকছে পাঁচের দশকের কবিদের বিবরণ দেবার আর সেই সঙ্গে অবশ্যই জীবনানন্দ দাশের কাব্যশৈলীর আলোচনা। সমগ্র অধ্যায়টিকে পূর্বের ন্যায় দুটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হচ্ছে। প্রথম অংশে আলোচিত হবে জীবনানন্দ দাশের কবিকৃতি আর দ্বিতীয় অংশে পাঁচের দশকের কবিরা। বিভিন্ন দিক থেকে এই অধ্যায়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, এই অধ্যায়টি যুক্ত করছে গবেষণার দুটি মূল অংশকে- জীবনানন্দ দাশ এবং পাঁচের দশকের কবিগোষ্ঠী। অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য পাঁচের দশকের কবিরা তাঁদের কবিতায় কীভাবে জীবনানন্দের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে প্রতিগ্রহণ করেছেন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এই কাজের জন্য প্রথমে প্রয়োজন জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করে তাঁর কাব্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। এই অধ্যায়ের শুরুতেই সেই

কাজটি করার প্রচেষ্টা থাকছে। জীবনানন্দীয় জগতের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে এই অধ্যায়ের শুরুতে। এই ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র গবেষণাটি কারণ জীবনানন্দ কী এ প্রশ্নের কোনো আবছা উত্তর দেবার আগে বলা উচিত জীবনানন্দ অনেক রকমের। আলোচ্য গবেষণায় সেই অনেক রকম জীবনানন্দের কিছু সামান্য লক্ষণের প্রাক্-নির্ধারণ করা হবে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় যার প্রভাব, অভিঘাত কিংবা প্রতিগ্রহণ বিচার্য হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। সুতরাং এদিক থেকে এই প্রথম উপ-অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, পাঁচের দশকের কবিদের আলোচনা শুধু কবি ও কবিতার তালিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নয়।পূর্বের অধ্যায়ে তিন ও চারের দশকের কবিদের আলোচনা সম্পন্ন করে যে প্রেক্ষিত রচনা করা হয়েছিল, এখন সেই প্রস্তুত জমিতে প্রধান আলোচ্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হবার উপযুক্ত মহেন্দ্রক্ষণ আগত প্রায়। সুতরাং, একদিকে জীবনানন্দ দাশের কাব্যপ্রতিভার সাথে পরিচয়ের পরে পরেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে অপর দিকে সারিবদ্ধ পাঁচের দশকের কবিদের সাথে পরিচিতিকরণের। প্রতিগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রধান দুই দিক- গ্রাহক আর উৎস। বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রে উৎসের ভূমিকায় জীবনানন্দ দাশের কবিতা আর গ্রাহকের ভূমিকা পালন করছে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতা। এই অধ্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘটিত একমুখি প্রতিগ্রহণের প্রক্রিয়াটির বিশ্লেষণ উহ্য রাখলেও উৎস এবং গ্রাহক- এই দুই পক্ষের সাথে পরিচিত হবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিতব্য প্রতিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে অনুধাবন করার জন্য তাই এই পরিচিতিকরণ অত্যন্ত জরুরী।

তৃতীয়ত, পাঁচের দশকের সমস্ত কবিদের রচনায় যেমন জীবনানন্দের প্রভাব সুগভীর নয়, তেমনি আবার পাঁচের দশকের সমস্ত কবিকেই প্রধান কবি বলা যায় না। যদিও এই প্রধান-অপ্রধানের মতো শব্দ ইতিহাস-লেখনের রাজনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তবু বিতর্ককে দূরে সরিয়ে রেখেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচের দশকের একজন প্রধান কবি কিন্তু ফণীভূষণ আচার্য নয়। প্রকৃত পক্ষে কবিজীবনের শুরুতে অনেক কবি-সাহিত্যিকই প্রচুর লিখতে শুরু করেন কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এঁদের মধ্যে অনেকের লেখনী থেকে যায় আর অনেক কবি-লেখক শুরুতে কম লিখলেও সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যান না। বরং পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও এঁদের লেখার প্রভাব রয়ে যায়। এঁরা নিজেদের রচনার সাহায্যে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন বাংলা সাহিত্যে। তাই এঁরা হয়ে যান কালোত্তীর্ণ। পরবর্তীকালের সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের কাছে এঁরাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রধান কবি সাহিত্যিক হয়ে যান। আর প্রথম ধারার লেখক কবিরা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ হয়ে পড়েন বিস্মৃত। তারা ওই সময়ের অপ্রধান কবি। এই অধ্যায়ে পাঁচের দশকের প্রধান-অপ্রধান মিলিয়ে অধিকাংশ কবিরই কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা থাকছে। মূলত এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকেই চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন পাঁচের দশকের কয়েকজন প্রধান কবি যাঁদের লেখায় জীবনানন্দের প্রভাব সর্বাধিক। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সব কবিদের কবিতায় জীবনানন্দীয় ভাব ও শৈলীর প্রতিগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা থাকবে।

এরপর চলে আসি অভিসন্দর্ভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায় প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়ে গবেষণার মূল প্রশ্নটি উত্থাপিত এবং আলোচিত হচ্ছে। বিশদে

বললে এই অধ্যায়েই পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতিগ্রহণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা থাকছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্বের অধ্যায়ে প্রতিগ্রহণ প্রক্রিয়ার দুই প্রান্ত অর্থাৎ উৎস এবং গ্রাহক সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা থাকবে এই উৎস এবং গ্রাহকের মধ্যে সংঘটিত প্রতিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকেই। এক্ষেত্রে উৎস হল জীবনানন্দের কাব্যজগত-যার সামান্য লক্ষণ চতুর্থ অধ্যায়ে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। এখন আসা যাক গ্রাহক প্রসঙ্গে। সামগ্রিকভাবে গ্রাহক পাঁচের দশকের কবিদের রচিত কবিতা। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে পাঁচের দশকের সমস্ত কবিদের কবিতায় যেমন জীবনানন্দের প্রভাব পড়েনি তেমনি পাঁচের দশকের সমস্ত কবিদের নিয়ে এক সারিতে এই আলোচনাও অনভিপ্রেত কারণ জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রা যেমন সব কবির কবিতায় সমান নয় তেমনি পাঁচের দশকের সমস্ত কবিই সমান গুরুত্বপূর্ণ নন। সুতরাং প্রধান আলোচ্য কবিদের নির্বাচিত করার শর্ত মূলত দুটি-

প্রথমত কবি হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব ,

আর দ্বিতীয়ত তাঁর কবিতায় জীবনানন্দের কাব্যজগতের প্রভাবের মাত্রা আদৌ গভীর কিনা।

এই দুই শর্ত একত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাচ্ছে এমন দুজন কবি রয়েছেন যাঁরা উপরের দুটি শর্তের মধ্যে দুটিই পূরণ করছেন অর্থাৎ, যাঁদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের মাত্রা সুগভীর এবং বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়(১৯৩৩) এবং বিনয় মজুমদার(১৯৩৪)। এই দুজন কবিকে বাদ দিয়ে এমন বেশ কয়েকজন কবিকে পাচ্ছি যাঁরা উপরের দুটি শর্তের যেকোনো একটি

শর্ত পূরণ করছেন, অর্থাৎ হয় তাঁদের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যজগতের প্রতিগ্রহণ গুণগত এবং পরিমাণগত ভাবে খুবই কম , নতুবা বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁদের অবদান নেহাতই স্বল্প। সুতরাং বিনয় মজুমদার কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে সম গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের বিশ্লেষণ করা অনুচিত। এইসব দিক মাথায় রেখে এই পঞ্চম অধ্যায়টিকে তিনটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করার প্রয়াস রয়েছে। এইগুলি নিম্মরূপ-

ক) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

খ) বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

গ) আরো তিনজন কবির কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

প্রথম উপ-অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের স্বরূপ নির্ণয় করা। শুধু পাঁচের দশকেরই নয়, সমগ্র বাংলা কবিতার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাঁচের দশকে লেখা শুরু করলেও তাঁর কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের অভিঘাত সাত, আট এমনকি নয়ের দশক অবধিও দেখতে পাওয়া যায়। এই উপ-অধ্যায়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সংরূপগত এবং ভাবগত দিক থেকে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণের মাত্রার পরিবর্তনকে অনুধাবন করার চেষ্টা থাকবে। কবির কবিতার ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প প্রভৃতির পাশাপাশি শক্তির মৃত্যুচেতনার মধ্যেও কতখানি জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের প্রভাব রয়েছে তাও নির্ণয় করার প্রয়াস করা হবে। শক্তির প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার মধ্যেও কোনো জীবনানন্দ-

প্রতিগ্রহণের স্তর রয়েছে কিনা, তাও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে এই উপ-অধ্যায়ে। প্রয়োজনমাফিক এই উপ-অধ্যায়কে আরো ক্ষুদ্র কোনো বিভাগে বিভাজিত করা হতে পারে আলোচনার সুবিধার্থে।

দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। পাঁচের দশকের অন্যতম শক্তিশালী কবি বিনয় মজুমদার। পাঁচের দশকে লেখা শুরু করলেও তাঁর কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের অভিঘাত সাতের দশক অবধি দেখতে পাওয়া যায়। এই উপ-অধ্যায়ে বিনয় মজুমদারের কবি জীবনের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণের মাত্রার পরিবর্তনকে অনুধাবন করার চেষ্টা যেমন থাকবে তেমনি বিনয়ের কবিতার ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প প্রভৃতির মধ্যেও কতখানি জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের প্রভাব রয়েছে তাও নির্ণয় করার প্রয়াস করা হবে। বিনয়ের প্রকৃতি-প্রেম ও ঈশ্বর চেতনার মধ্যেও কোনো জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের স্তর রয়েছে কিনা, তাও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে এই উপ-অধ্যায়ে। সব মিলিয়ে বিনয়ের কাব্যজগতের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের কাব্যের প্রভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা থাকবে এই উপ-অধ্যায়ে। প্রয়োজনমাফিক এই উপ-অধ্যায়কে আরো ক্ষুদ্র কোনো বিভাগে বিভাজিত করাও হতে পারে আলোচনার সুবিধার্থে।

তৃতীয় উপ-অধ্যায়টিতে থাকছেন তিনজন কবি যাঁরা হয় অ-প্রধান নয়তো তাঁদের কবিতায় জীবনানন্দের কাব্যজগতের প্রভাব খুবই স্বল্প। এই অংশে আলোচনার জন্য মোট তিনজন কবিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এঁরা হলেন- আলোক সরকার(১৯৩১),

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬) এবং উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭)। অতি সংক্ষিপ্ত রূপে এঁদের কাব্যজগতের উপর জীবনানন্দের প্রভাব আলোচিত হবে এই উপ-অধ্যায়ে।

এরপর গবেষণার শেষ অংশ উপসংহার অর্থাৎ 'অবশেষে' I এই অধ্যায়ে সমগ্র অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সমূহের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণার মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে। বিষয়গত দিক থেকে দেখতে গেলে এই অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকার ঠিক বিপ্রতীপ। শুরুর কথা অংশে সমগ্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভটির মূল প্রশ্ন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের আশু আলোচ্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার পেশ করে অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক গঠন নির্ধারণ করা হয়। আর উপসংহার অংশে এসে শুরু হয় সুতো গোটানোর কাজ। সমগ্র অভিসন্দর্ভ জুড়ে যে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজ চলছিল, উপসংহার অংশে এসে সেই সব গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর এক সূত্রে গাঁথার কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। এখানেও উপসংহার অংশে পৌঁছে আমরা এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা-প্রশ্ন অর্থাৎ বিশ শতকের বাংলার পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের স্তর ও মাত্রা নির্ণয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারবো বলে আশা করা যায়।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা,* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), ১৮।

[২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, "গ্রন্থপরিচয়", *পদ্যসমগ্র-৭,* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১২), ৩৭৯।

প্রতিগ্রহণঃ হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না

যদি স্বীকার করে নিই যে তুলনামূলক সাহিত্য আসলে একটি সাহিত্য পাঠ-পদ্ধতি, তাহলে সেই পদ্ধতিতে কোনো সাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখা গেছে একটি সাহিত্যকর্মকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমস্থান (Chronotope)[১] এর অপেক্ষক[২] হিসেবে অভিহিত করা যায় এখানে। তাই তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ-পদ্ধতিতে স্থান-কালের অবিচ্ছেদ্য নাড়ীবন্ধন ছিন্ন করে কোনো সাহিত্যকে একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্যকর্ম হিসেবে পড়া যায় না। ওই সাহিত্য পড়তে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একজন তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রের মনে পড়বে অন্য কোনো সাহিত্যের কথা- সেই সাহিত্য যে সব সময় ওই একই ভাষায় রচিত হতে হবে তা নয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি সাহিত্য পড়ে অন্য কোনো ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের কথা মনে পড়ল। এমনকি এই দুই সাহিত্যের বর্গও ভিন্ন হতে পারে, যেমন- কোনো নাটক পড়ে পাঠকের মনে পড়তে পারে কোনো কবিতা, উপন্যাস বা ছোটগল্পের কথা। সুতরাং দুটি সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনোই ভাষা বা সাহিত্য বর্গ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এখন, কোনো সাহিত্যিকের একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম পাঠ করে যদি কেউ অন্য কোনো সাহিত্যিকের ওই একই ভাষাতন্ত্র বা ভিন্ন কোনো ভাষাতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো সাহিত্যকর্মের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পান, তাহলে কী কী ভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-

প্রথমত বলা যায়, প্রথম সাহিত্যিক দ্বারা দ্বিতীয় জন প্রভাবিত হয়েছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় জনের সাহিত্যকর্মের উপর প্রথম জনের প্রভাব পড়েছে।

দ্বিতীয়ত বলা যায়, দ্বিতীয় জন প্রথম জনের রচনার অনুকরণ করেছেন।

তৃতীয়ত বলা যায়, দ্বিতীয় জনের ওপর প্রথম সাহিত্যিকের অভিঘাত পড়েছে।

চতুর্থত বলা যায়, প্রথম জনের রচনা দ্বিতীয় জন প্রতিগ্রহণ করেছেন।

পঞ্চমত বলা যায়, দ্বিতীয় সাহিত্যিকের লেখার উপরে প্রথম জনের ছায়া পড়েছে।

আর ষষ্ঠত, দ্বিতীয় সাহিত্যিক যদি হন উপনিবেশিত দেশ বা সেই উপমহাদেশের লোক আর প্রথম জন ঔপনিবেশিক দেশের, তখন দ্বিতীয় জনকে ওই উপনিবেশিত দেশের প্রথম সাহিত্যিক হিসেবে অভিহিত করার প্রবণতাও দেখা যায়। বাংলায় এই ধরনের অভিধা প্রদানের দৃষ্টান্ত মোটেও বিরল নয়। একটা সময় এমন ছিল যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার স্কট কিংবা *পলাশির-যুদ্ধ* কিংবা *কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাস* খ্যাত নবীনচন্দ্র সেনকে বাংলার বায়রন আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের শিরোপা লাভ থেকে বঞ্চিত হন নি। তাঁকে বলা হয়েছে বাংলার শেলী। নবীনচন্দ্র সেন প্রসঙ্গে সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে লিখছেন-

> “ বায়রনের পরোক্ষ প্রভাব পলাশির-যুদ্ধের স্থানে স্থানে আছে, সেই সময়ে লেখা অন্য কবিতায়ও আছে। পলাশির-যুদ্ধ ইংরেজী স্পেনসরীয় স্তবকের অনুকরণে দশ পয়ার-ছত্র বিশিষ্ট স্তবকে রচিত।”[৩]

সুতরাং সুকুমার সেনের উক্তি থেকে স্পষ্ট যে নবীন সেনের রচনার মধ্যে বায়রনের পাশাপাশি স্পেনসারের প্রভাবও বিদ্যমান। তাই শুধু বায়রনের নামে নবীন সেনকে

অভিহিত করা অনুচিত কাজ। যেমন অনুচিত বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিককে কোনো একজন বিদেশি সাহিত্যিকের অভিধায় ভূষিত করার সীমাবদ্ধতা দেখানো।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার অভিধা প্রদানের মধ্যে উপনিবেশিত দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক হীনমন্যতা লুক্কায়িত থাকে। স্কটের *আইভানহো*-র সাথে দুর্গেশনন্দিনীর কাহিনি ও রচনাশৈলীর কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেল বলেই উপনিবেশিত দেশের সাহিত্যিকটিকে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে শিরোপা দেওয়া হল 'বাংলার স্কট'-এর। এর মধ্যে যেন সুপ্ত রয়েছে ঔপনিবেশিকের সাহিত্য রচনার মুন্সিয়ানা-শিক্ষার 'আলোয়' উপনিবেশিত দেশের সাহিত্যিকের 'শিক্ষিত' হবার ফলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার করুণ মনোবাসনা তেমনি এর মধ্যে যেন স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে উপনিবেশিত দেশের সাহিত্যিকটির কোনো স্বকীয়তা নেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে। সে যেন শুধু ঔপনিবেশিক সাহিত্যের কুম্ভীলক বৃত্তিতেই ব্যস্ত। সুতরাং একথা বলাই যায় যে এই ধরনের অভিধা খুব একটা অভিপ্রেত নয়। বরং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বঙ্কিমের লেখায় স্কটের প্রভাব পড়েছিল কিংবা বঙ্কিম স্কটকে প্রতিগ্রহণ করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে চারটি প্রধান পরিভাষা উঠে এসেছে- প্রভাব (Influence), অভিঘাত (Impact), অনুকরণ (Imitation) এবং প্রতিগ্রহণ (Reception)। ধাপে ধাপে এই পরিভাষা সহ বেশ কিছু সম্পর্কিত অন্য পরিভাষাও বিশ্লেষণ করা হবে এই আলোচনায়।

প্রথমেই আসা যাক 'প্রভাব' এর প্রসঙ্গে। একথা সকলেরই জানা যে, তুলনামূলক সাহিত্যের সূচনাপর্বে ইওরোপের যে দুটি দেশেরনিজস্বচিন্তাধারা সমৃদ্ধ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল ফ্রান্স। সেই ফরাসি ভাবধারার তুলনামূলক সাহিত্য সর্বদাই একটা দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের জন্ম দিত। অর্থাৎ, অন্য কথায় বললে- ফরাসি ভাবধারার তুলনামূলক সাহিত্যের ভিত্তি ছিল দুটি সাহিত্যকর্মের মধ্যে তুলনা- যার একটি ফরাসি সাহিত্য আর অন্যটি 'অ-ফরাসি' সাহিত্যকর্ম। আর এই তুলনার মধ্য দিয়ে ফরাসি সাহিত্যটির উৎকর্ষ প্রমাণ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে, উনিশ শতকের প্রথম দিকের বিশ্বরাজনীতির আঙিনায় ছড়ি ঘোরানো ফরাসি সভ্যতা সাহিত্যের মধ্য দিয়েও ধরে রাখতে চেয়েছিল সেই উচ্চমন্যতা। তাই তুলনার পাশাপাশি সেখানে শুরু হয়েছিল 'প্রভাব চর্চা'। যদিও বলাই বাহুল্য সেই চর্চা ছিল একান্তই একমুখী, অর্থাৎ ফরাসি সাহিত্য সমসাময়িক 'অ-ফরাসি' সাহিত্যের ওপর কী কী সদর্থক প্রভাব ফেলেছে, কেবলমাত্র তার চর্চা করেই ফরাসি সভ্যতা অনুভব করতো আত্মশ্লাঘা। এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ ফরাসি সাহিত্যের ওপর 'অ-ফরাসি' সাহিত্যের কোনো প্রভাবের কথা স্বীকার করা হতো না।

উপরের ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 'প্রভাব' এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটি ক্ষমতা পিরামিড। যদি ক সাহিত্যিকের রচনায় খ সাহিত্যিকের 'প্রভাব' নিয়ে চর্চা করা হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে খ ক এর চেয়ে অনেক উচ্চ মানের সাহিত্যিক। উভয়ের সম্পর্ক একটি সরলরেখায় দাঁড়িয়ে নেই, বরং রয়েছে এক উচ্চ-নীচ ভেদ। ক তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির আকর সংগ্রহ করেছেন খ এর রচনা থেকে- এর তাৎপর্য হল ক এর মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা খ এর তুলনায় অনেক কম। তাই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে

ক হল গ্রহীতা আর খ দাতা। দাতা আর গ্রহীতাকে আর যাই হোক- এক সারিতে বসানো যায় না। উচ্চমর্ণ সর্বদাই অধমর্ণের থেকে উচ্চ আসনের দাবিদার।

তাছাড়া, ‘প্রভাব’ চর্চার আরো একটি সমস্যা রয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে সমালোচকের দৃষ্টি নিবিষ্ট থাকে গ্রহীতার বদলে দাতার দিকে। ফলে গুরুত্ব পায় দাতা। কিন্তু দাতা তো পূর্বসূরী। ফলে সাহিত্য সমালোচনায় যে গুরুত্বটুকু পাওয়ার কথা অনুজ গ্রহীতার, ‘প্রভাব চর্চা’ র ক্ষেত্রে ঘটে তার ব্যত্যয়। সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Comparative Literature Terms and Concepts* গ্রন্থে আমরা পাই-

> “ For a study of influence two distinct and comparable entities are required: the work from which influence proceeds, and the work at which influence is directed. These are known as the emitter and the receiver. The emitter is the entity from which the influence proceeds and the receiver is that entity towards which the influence is directed. These two entities are distinct and therefore comparable...Influence as a concept assumes that the emitter is active (giving) and the recipient is passive (receiving).”[8]

গ্রাহক এবং প্রেরকের মধ্যে এই নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় বিশেষণের অভিধার তারতম্যের তাৎপর্য এই যে গ্রাহক যেন এখানে কিছুটা ম্রিয়মান, কম গুরুত্বপূর্ণ এবং সৃষ্টিশীলতার

মানের দিক থেকেও যেন প্রেরকের তুলনায় অনেকটাই নিচে। যদিও ওই গ্রন্থেই দাবি করা হয়েছে-

> "Weisstein emphasizes that no qualitative distinction should be made between the active and passive aspects of influence because there is nothing shameful or derogatory in receiving influence."[৫]

যতই দাবি করা হোক যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বিশেষণের মধ্যে দিয়ে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কোনো গুণমানগত তারতম্যের ইঙ্গিত করা হচ্ছে না এবং 'প্রভাব' গ্রহণের মধ্যে কোনো হীনমন্যতা নেই, কিন্তু বাস্তবে যে প্রেরক সর্বদাই গ্রাহকের তুলনায় উচ্চাসন এবং অধিক গুরুত্ব লাভ করেন সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ সমালোচক গ্রাহকের সাহিত্যকর্মের মধ্যেও প্রেরককেই খোঁজেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাব চর্চায় গ্রাহকের স্বকীয়তা হ্রাস পায়।

এই গবেষণার শিরোনাম "পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ"। সুতরাং এরপর আলোচনার ক্ষেত্রে 'প্রতিগ্রহণ' সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া আবশ্যক। সাহিত্যে প্রতিগ্রহণ অর্থাৎ 'reception' শব্দটি পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত। সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র যেমন হোটেল ব্যবসা কিংবা বৌভাতের অনুষ্ঠান-প্রভৃতি ক্ষেত্রে শব্দটির জনপ্রিয় ব্যবহার অধিক পরিচিত। গত শতকের ছয়ের দশকের আগে পর্যন্ত সাহিত্যেও এর ব্যবহার ছিল সীমিত। Robert C. Holub লিখছেন-

> " Reception theory" is a term that is likely to sound strange to speakers of english who have notencountered it previously. as Hans Robert Jauss, one of the major proponents of this theory, noted humorously in 1979, to the foreign ear questions of "reception" may seem more appropriate to hotel managment than to literature. For followers of the German critical scene, compound forms, hasbeen the key to theoretical concerns for the past decade and half. No area of literary endeavor has been untouched by reception theory ; indeed, traces of this method have affected adjacent disciplines like sociology and art history as well."[৬]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এই 'reception' শব্দটি জার্মান সাহিত্য সমালোচনা থেকেই পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু একথা বললে নেহাতই অত্যুক্তি হবে না যে সরাসরি এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত না হলেও অন্য শব্দ ব্যবহার করেও দুটি সাহিত্যকর্ম বা দুই সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে সংযোগ সাধনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার নিরিখে আলোচনা যদি কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলেও দেখব দুই বা ততোধিক ভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরুপণের কাজের উদাহরণ এখানেও মোটেও অপ্রতুল নয়। শুধু অনুপস্থিত সেখানে 'reception' শব্দবন্ধটি। তার পরিবর্তে যে শব্দটির সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ব্যবহার ঘটেছে, তা হল 'প্রভাব'। দুজন সাহিত্যিক কিংবা দুটি সাহিত্যকর্মের মধ্যে সাদৃশ্য

বোঝাবার জন্য এই শব্দবন্ধটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আর বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা কাব্য-কবিতায় এই ধরনের কাজ শুরু হয়েছে প্রধানত উনিশ শতকের সাহিত্যকর্ম থেকে কারণ বাংলায় প্রধান যে দুটি ভিন্ন ভাষার সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল তার একটি সংস্কৃত আর অন্যটি অবশ্যই ইংরাজি। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রাচীন। আর বাংলা কাব্য-কবিতায় ইংরাজি সাহিত্যের এই প্রভাবের প্রধান পর্যায় দুটি- উনিশ শতক এবং বিশ শতক। এ প্রসঙ্গে উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর *বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব* গ্রন্থে বলেছেন-

> " ইংরিজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই তখনকার কবিখ্যাতিলিপ্সু বাঙালী কবিদের মধ্যে বিদেশী কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তৃতীয় দশকের প্রথম দিক থেকেই বাঙালী কবিরা ইংরিজি কবিতার প্রভাবে পড়েন। প্রভাব না বলে প্রকোপ বলাই উচিত। কারণ ইংরিজি সাহিত্যের আস্বাদ পেয়ে ইয়ং বেঙ্গল বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। কাজেই বিদেশী সাহিত্যের রসে ডুবে প্রতিভাবানের দল ইংরিজিতে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে সে ভাষায় কবিতা লিখে বিদেশীদের সত্যিকার প্রশংসা পাওয়া যে নেহাৎই অসম্ভব ব্যাপার, সে কান্ডজ্ঞান তখন কারো হয় নি।"[৭]

এখানে একটি অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য বা আরো স্পষ্টভাবে বললে ইংরেজি প্রভাবের শুরুর ইতিহাসে হয়তো বাঙালির নিজের মাতৃভাষার প্রতি কোনো হীনমন্যতা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ

করেছে। তাই বাংলার বদলে প্রথমে সাহিত্য চর্চা শুরু হচ্ছে ইংরাজিতে। তারপর অবশ্য প্রাথমিক ব্যর্থতার পর তারা মাধ্যম করেন সেই মাতৃভাষাকেই কিন্তু বিষয় বা লেখনশৈলী হিসেবে বেছে নেন ইংরাজি সাহিত্যকেই। এইভাবেই বাংলা কাব্যে যাত্রা শুরু পাশ্চাত্য প্রভাবের।

পরবর্তীকালে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের 'আধুনিক কবি'দের কবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কেও উঠেছিল একই অভিযোগ। অশ্রুকুমার শিকদার লিখছেন-

> " আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যপ্রভাব অভিযোগ আসলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার অভিযোগ, প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক আধিপত্য মেনে নেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছিল ইঙ্গ-মার্কিন, কতকটা ফরাসি আধুনিক কাব্যের অনুকরণের। তিরিশের প্রধানসব কবিই যে ইংরেজির ছাত্র ছিলেন সেটা যেন অবধারিত ছিল। বিষ্ণু দে-র কবিতা আলোচনা করতে গেলেই এলিয়ট এলুয়ার আরাগঁ-র কথা ওঠে, বুদ্ধদেব বসু-র কবিতার আলোচনায় প্রি-র‍্যাফেলাইটদের, অন্তিম-রোমান্টিকদের, বোদলেয়ার রিলকে হ্যেল্ডারলিনের কথা না আনলে চলে না।"[৮]

প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে 'প্রভাব' ও 'প্রতিগ্রহণ'-এই শব্দজোড়ের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হলেও বাংলা সাহিত্যের একাধিক সমালোচকের রচনায় দুটি সাহিত্যকর্ম কিংবা একজন সাহিত্যিকের লেখায় আরেকজন সাহিত্যিকের ছায়া দেখতে পেলে তাকে সামগ্রিক ভাবে 'প্রভাব' বলেই অভিহিত করা হয়েছে। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই সমালোচকদের

সমালোচনার ক্ষেত্রে ‘প্রভাব’ শব্দের এই ব্যবহার একাধারে ‘প্রভাব’ (Influence), ‘অভিঘাত’ (Impact) এবং ‘প্রতিগ্রহণ’ (Reception) কে সূচিত করেছে। এদের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণের কোনো রকম প্রচেষ্টা সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু, তুলনামূলক সাহিত্যের গবেষণা অভিসন্দর্ভের দাবি মেনে এখানে এই শব্দবন্ধ বা পরিভাষাগুলির পৃথক পরিচয় জ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ। ‘প্রভাব’ এর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে অনতিবিলম্বে আলোচনা করা হবে। তবে তার আগে দুটি অন্য পরিভাষা সম্পর্কে আলোকপাত ঘটানো আবশ্যক। সেগুলি হল- অনুকরণ এবং অভিঘাত। তবে এই আলোকপাতেরও পূর্বে অন্য একটি বিষয়ে এখানে স্পষ্টতা প্রদান জরুরী বলে মনে করছি। তা হল প্রভাব, অনুকরণ, অভিঘাত, প্রতিগ্রহণ- তাদের একাধিক শ্রেণি- সব মিলিয়ে একটি সাহিত্যকর্মের সঙ্গে অপর একটি সাহিত্যকর্মের সাদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চর্চার বিষয়কে সামগ্রিক ভাবে প্রতিগ্রহণ চর্চা বলে এখানে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য এই প্রচেষ্টা এখানেই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও ‘প্রতিগ্রহণ’ শব্দবন্ধটিকে একাধিক পরিভাষার একটি মিশ্রপদ (Umbrella term)হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে Robert C. Holub লিখছেন-

> “ Reception theory,by contrast, must be understood as a more cohesive, conscious, and collective undertaking. In the largest sense it is a reaction to social, intellectual and literary developments in West Germany during the late 1960s... it emerged as a group effort on both the institutional and

critical levels, involving a productive exchange of ideas among its advocates."[৯]

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে যে 'প্রতিগ্রহণ' কোনো একটি সমসত্ত্ব ধারণা নয় বরং অনেকগুলি তত্ত্বের একটি সংঘবদ্ধ তত্ত্বভান্ডার। পূর্বের প্রভাব চর্চার সাথে এর কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। যেমন ওয়াইস্টাইন প্রমুখ সমালোচক 'প্রভাব' কে মনস্তাত্বিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন।[১০] তাছাড়া প্রভাব চর্চা যেখানে কেবলমাত্র দুটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্মের মধ্যেই করা সম্ভব, প্রতিগ্রহণ চর্চার ব্যাপ্তি সেখানে অনেক বড়। সাহিত্যকর্মের সাথে তার পাঠক, সমাজ, অর্থনীতি, অন্যান্য শিল্পমাধ্যম এবং সর্বোপরি সাহিত্যটির সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকাকেও আলোচনার বিষয় করা যায় প্রতিগ্রহণ চর্চায়। Holub, Robert C. লিখছেন-

" Reception theory refers through out a general shift in concern from the author and the work to the text and the reader. It is used, therefore, as an umbrella term and encompasses both Jauss's and Iser's projects as well as empirical research and the traditional occupation with influences. The "aesthetics of reception", in contrast, is used only in connection with Jauss's early theoretical work."[১১]

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিগ্রহণ চর্চার ব্যাপ্তি প্রভাব চর্চার থেকে অনেক বেশি এবং প্রতিগ্রহণ কখনোই একটি একক সমসত্ত্ব ধারণা নয় বরং একাধিক সাহিত্য

তত্ত্বের এক মিলনস্থল। এবার এর উপাদান পরিভাষাগুলির পরিচিতিকরণ ঘটানো যাক।

প্রথমেই আসা যাক 'অনুকরণ' প্রসঙ্গে। নাম থেকেই স্পষ্ট যে এই ধরনের প্রতিগ্রহণে প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে মিলের ভাগটাই বেশি। অমিল সেখানে খুবই সামান্য। বস্তুত, একটি সাহিত্যকর্মের সাথে যখন অন্য কোনো লেখকের অন্য একটি রচনার প্রভেদ যখন খুবই স্বল্প হয়, তখন পরবর্তী সাহিত্য কর্মটিকে প্রথমটির অনুকরণ বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে মূলত তিনটি ভাবে এই অনুকরণ ঘটতে পারে-

প্রথমত, যখন অনুজ লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা অতি নিকৃষ্ট হওয়ায় তিনি পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোনো বিখ্যাত লেখকের রচনাশৈলী কিংবা কোনো বিশেষ রচনার আংশিক অনুকরণ করছেন।

দ্বিতীয়ত, যখন অনুজ লেখক কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে এতটাই মুগ্ধ যে নিজের অজান্তেই লেখায় অনুকরণ করে ফেলছেন বিখ্যাতজনের লেখন বৈশিষ্ট্য।

আর তৃতীয়ত, যখন পূর্বজ এবং অনুজ উভয়েই অপর কোনো তৃতীয় লেখকের রচনাশৈলী থেকে অনুকরণ করছেন।

সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Comparative Literature Terms and Concepts* গ্রন্থে আমরা পাই-

"The word imitation is the noun form of the verb 'to imitate' derived from the Latin 'imitari' meaning 'image'. It has been coined in English since 1534. It means 'to follow example of' or 'make copy of'. Imitation, as we know today, is following an author or his/ her work blindly without any trace of creative innovation. The statement 'art imitates life' is generally used quite casually. But this imitation or representation of nature and natural objects in art has been theorized since the days of Plato (c. 427-347 BCE) and Aristotle (384-322 BCE)."[১২]

অনুকরণের এই ধারণাকে উপরের উদ্ধৃতিতে ঐতিহাসিক করে তোলার প্রচেষ্টা করা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে অনুকরণের মধ্যে একটা সৃষ্টিশীলতার অভাববোধ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের নিরিখে এই অনুকরণের উদাহরণ মোটেও বিরল নয়। সেই মধ্যযুগে চন্ডীদাসের সময় থেকেই কোনো জনপ্রিয় কবির লেখনশৈলী এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত অনুকরণ করার প্রয়াস দেখা যায়- যার কারণে জন্ম নেয় বাংলা সাহিত্য চন্ডীদাস সমস্যা। পরবর্তী সময়ে এই অনুকরণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ যে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কাব্যজগতকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হবার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে কথা বোধ হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও অজানা ছিল না। তাই ১৯২৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস *শেষের কবিতা*- এ অমিতর মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন-

"যেসব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে বূহ্য বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়।"[১৩]

কিংবা ওই একই উপন্যাসে অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে-

"অমিত বলে, ফ্যাশনটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী...বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা "বিষবৃক্ষে", বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশন নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে", নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।"[১৪]

প্রকৃতপক্ষে নামী এবং জনপ্রিয় লেখকের লেখনশৈলীর যে অনুকরণ হবে তা অতিশয় সাধারণ ঘটনা। এই ঘটনা পূর্বসূরী ওই জনপ্রিয় কবি-লেখকের সৃষ্টিশীলতা এবং লেখার উৎকর্ষের যেমন পরিচায়ক, ঠিক তেমনি এর পাশাপাশি যে লেখক অনুকরণ করছেন, তাঁর সীমাবদ্ধতাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক জনসংযোগ ওয়েবসাইট যেমন ফেসবুকে বেশ কিছু তরুণ কবির দেখা মিলছে, যারা বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় কবি শ্রীজাতর কবিতার রচনাশৈলীকে অনুকরণ করে একটি কবিতাকে পরিণত করছে কিছু দুই পঙ্‌ক্তির স্তবকের সমষ্টি রূপে। তাদের এই জাতীয় কবিতায়, বলাই বাহুল্য, শ্রীজাতর কুশলতা একান্তই অনুপস্থিত হওয়ায় এই অন্ধ অনুকরণ এই কবিদের সৃষ্টিশীলতায় স্বকীয়তার অভাববোধকেই স্পষ্ট করে।

এরপর আসা যাক 'অভিঘাত' (Impact) প্রসঙ্গে। সাধারণ অর্থে 'প্রভাব' এবং 'অভিঘাত' সমার্থক হলেও সাহিত্য সমালোচনার পরিভাষা হিসেবে উভয়ের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট দূরত্ব। 'প্রভাব' যেখানে দুটি সম্পূর্ণ হওয়া সাহিত্যকর্মের মধ্যে তুলনা ও সাদৃশ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, অভিঘাতের প্রয়োগ সেখানে সীমাবদ্ধ থাকে কোনো সাহিত্যিকের ওপরে একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব আলোচনায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতার উপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের অভিঘাত ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Comparative Literature Terms and Concepts* গ্রন্থে অভিঘাত প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

> "The word impact derived from the Latin 'impactus' meaning 'to push against' and used in English since 1781. In ordinary usage, the terms impact and influence are often confused. In fact, they are often substituted for each other. Literary impact means 'strong effect', akin to influence. But as literary terms impact and influence differ. Influence is more personal, that is to say, one particular author, literary works, movement/s and other factors that determine the literary production. The interaction is limited to two entities- the one who influences and the one who is influenced. But impact has a greater range. It is more general, in the sense that it

takes into consideration the socio-historical-political circumstances that regulate a literary work. For example, it was the impact of the French Revolution and not the mere influence, which led to the creation of Dicken's *A Tale of Two Cities* (1859). Similarly, we find the impact of the Indian freedom movement in literatures across Indian languages."[১৫]

উপরের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত পরিসরের বাইরে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের এক বা একাধিক সাহিত্যকর্মের ওপর বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের ভূমিকা বোঝানোর জন্যই সাহিত্য সমালোচনায় 'প্রভাব' এর বদলে 'অভিঘাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রভাবের ক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ই সাহিত্যকর্ম হলেও অভিঘাতের একদিকে অর্থাৎ প্রেরক অংশে উপস্থিত থাকে সাহিত্যকর্মের বদলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমি যার প্রভাব পড়ে গ্রাহক সাহিত্যকর্মের ওপর।

এরপর আসা যাক 'প্রভাব' এর একাধিক শ্রেণিবিভাগের প্রসঙ্গে। একটি সাহিত্যকর্মের ওপর আরেকটি সাহিত্যকর্মের কিংবা একজন সাহিত্যিকের ওপর আরেক জন সাহিত্যিকের প্রভাব পড়েছে- একথা শোনার সাথে সাথে মনে হয় দ্বিতীয় সাহিত্যের মধ্যে যেন প্রথম সাহিত্যেরই ছায়া দেখা যাবে। কিন্তু একথা সবসময়ের জন্য সত্য নয়। একটি সাহিত্যের ওপর অন্যটির প্রভাব যে সবসময় ধনাত্মকই হবে তার কোনো মানে নেই। কখনো কখনো তা ঋণাত্মক ও হতে পারে।অর্থাৎ, কোনো

সাহিত্যকর্ম কিংবা সাহিত্য আন্দোলনের বিপ্রতীপে গিয়ে যদি প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো সাহিত্যকর্ম, কিংবা কোনো সাহিত্য আন্দোলন জন্ম নেয় অথবা সেই সময়ের সাহিত্যে ঘটে যায় কোনো বিশেষ সংরূপগত বা বিষয়গত পরিবর্তন- যার সূচনা পূর্বের সংরূপ বা বিষয়ের বিপরীত স্রোতে গিয়ে, তখন অগ্রজ সাহিত্যের পরবর্তী সাহিত্যের ওপর এই ধরনের ঋণাত্মক প্রভাবকে 'নেতিবাচক প্রভাব' (Negative Influence)[১৬] বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজি সাহিত্যে ক্লাসিসিজমের পরে রোমান্টিসিজমের আবির্ভাবের কথা বলা যেতে পারে। ক্লাসিসিজমের যান্ত্রিকতা ও যন্ত্রসভ্যতার নিয়ম শৃঙ্খলার দমবন্ধ পরিবেশে একঘেয়েমিতে ভোগা পাঠক শান্তি খুঁজে পেয়েছিল রোমান্টিসিজমের মধ্যে। আবার, বাংলা কবিতাকে পয়ার ছন্দোবন্ধের ৮+৬ মাত্রার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে মধু-কবি আনলেন অমিত্রাক্ষরের খোলা জানালা। তাই বলা যেতে পারে পয়ারের নেতিবাচক প্রভাবেই বাংলায় জন্ম অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের।

এরপর আসা যাক পরোক্ষ প্রভাবের বিষয়ে। ধরা যাক ক এবং খ দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক। খ পূর্বজ সাহিত্যিক। ক এর রচনায় খ এর প্রভাব পাওয়া গেল। কিন্তু ক কোনোদিনই খ এর লেখার সংস্পর্শে আসেন নি। এমনকি হয়তো তিনি খ এর নামও শোনেন নি। অথচ ক এর লেখার সাথে খ এর লেখার সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল আর এক সাহিত্যিক গ এর খবর- যিনি ক যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন সেই একই ভাষার সাহিত্যিক এবং তিনি খ এর লেখার সংস্পর্শে এসেছেন। আবার ক পরিচিত গ এর লেখার সাথে। সুতরাং স্পষ্টতই সেই কারণেই ক এর সাথে খ এর লেখার মিল পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এখানে ক এর লেখায় প্রকৃতপক্ষে যার লেখার প্রভাব পড়েছে তিনি গ।

আবার গ প্রভাবিত হয়েছে খ এর লেখা থেকে। সুতরাং বলা যায় যে ক এর লেখায় প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে গ এর এবং পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে খ এর লেখার। ভারতের মতো বহুভাষিক দেশ, যা আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বহুকাল থেকেই পরিচিত, সেখানে এইরকম পরোক্ষ প্রভাবের উদাহরণ মোটেও বিরল নয়। ঈপ্সিতা চন্দ তাঁর *Reception of the Received* গ্রন্থে দেখিয়েছেন হিন্দী ভাষার কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালার কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব প্রকৃতপক্ষে নিরালার কবিতায় ইংরেজি কবি পার্সি বিসি শেলির পরোক্ষ প্রভাবেরই উদাহরণ।

প্রভাবচর্চার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে এখানে গ্রাহক নয় বরং বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকে প্রেরক। প্রেরকের থেকে কী কী উপাদান আত্মস্থ করে গ্রাহকনির্মাণ করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মটি সেই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের বদলে প্রভাব চর্চায় দেখা হয় প্রেরকের কী কী বৈশিষ্ট্য গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে। প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের সাদৃশ্য অনুসন্ধানই যেন প্রভাব চর্চার একমাত্র লক্ষ্য। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রয়েছে সীমাবদ্ধতা। প্রেরক ও গ্রাহকের সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধু সাদৃশ্যের অনুসন্ধানই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এর পাশাপাশি দেখতে হবে কীভাবে প্রেরকের থেকে আকর সংগ্রহ করেও গ্রাহক শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর নিজস্ব সাহিত্য। প্রেরকের সাথে সকল সাদৃশ্যকে সঙ্গী করেও কীভাবে গ্রাহক হয়ে উঠতে পেরেছেন একজন আলাদা সাহিত্যিক। প্রেরক ও গ্রাহকের সংযোগবিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পাশাপাশি উভয়ের ক্রমবর্ধমান দূরত্বের অধিবৃত্তীয় উৎকেন্দ্রিকতার মান নির্ণয় করাও একজন সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত- যাতে গ্রাহক সেই সমালোচনায় প্রয়োজনীয়

গুরুত্ব লাভ করতে পারেন। কিন্তু প্রভাব চর্চায় এই গুরুত্ব পায়নি গ্রাহক ও তার সাহিত্যকর্ম।

প্রভাব চর্চার মাধ্যমে গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত গুরুত্ব না পেলেও সেই অভাব মিটিয়েছে প্রতিগ্রহণ চর্চা। এখানে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকেন প্রেরক নয়, বরং গ্রাহক। অনেক সময় এই প্রেরক-গ্রাহক দ্বৈততার সীমাবদ্ধতারও ঘটে অবসান। প্রবেশ করে তৃতীয় বা চতুর্থ কোনো উপাদান। কারণ প্রতিগ্রহণ চর্চা সীমাবদ্ধ নয় শুধুমাত্র দুটি সমাপ্ত হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্মের মধ্যেই। সেখানে একটি সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পাঠক, প্রকাশক এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সম্পর্কও দেখা হয়। ওয়াইস্টাইন তো এই প্রতিগ্রহণের সাথে যুক্ত করেছেন সাহিত্যকর্মটির 'টিকে থাকা' (survival) কেও। *Comparative Literature and Literary Theory* গ্রন্থের "Reception and Survival" প্রবন্ধে তিনি বলছেন-

> "A satisfactory solution of the problem would seem to be possible, however, only after the borders separating "influence" from "reception"- a term for which Horst Rudiger, raising the matter to a more strictly aesthetic plane, would like to substitute survival (Wirkung) or "appropriation" (Aneignung)-have been clearly demarcated. "Influence" should preferably be used to denote the relations existing between finished literary products, while "reception" might serve to

designate a wider range of subjects, namely, the relations between these works and their ambience, including authors, readers, reviewers, publishers and the surrounding milieu. The study of literary reception, accordingly, points in the direction of literary sociology or psychology”[১৭]

সময়ের সাথে সাথে একটি সাহিত্যের ‘টিকেথাকা’ নির্ভর করে পাঠক, প্রকাশক এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সেই সাহিত্যকর্মটির সম্পর্কের ওপর। যেহেতু প্রতিগ্রহণচর্চা শুধুমাত্র দুটি সমাপ্ত হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ফলে একটি সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলাকালীন তার সঙ্গে পাঠক, প্রকাশক এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সেই সাহিত্যকর্মটির সম্পর্কের বিশ্লেষণ ধরা পড়ে এই চর্চায়। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো সাহিত্যের ওপর তার পাঠক কিংবা প্রকাশকের প্রভাব অনুসন্ধানের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাসের কথা। উপন্যাস শুরু হবার পর পাঠক-প্রতিক্রিয়া একদিকে যেমন চিঠির মাধ্যমে পত্রিকা দপ্তরে এসে পৌঁছায় তেমনি আবার পরোক্ষভাবে পত্রিকার বিক্রি কমা বাড়া থেকেও অনুমান করা যায় পাঠক কীভাবে প্রতিগ্রহণ করছেন ওই উপন্যাসটিকে। আর নেতিবাচক পাঠক-প্রতিক্রিয়ার কারণে যে গল্পের কাহিনিরও বদল হয়ে যায়, তার উদাহরণ তো আমরা পেয়েছি অনেক আগেই যখন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল একটি গল্পে শার্লক হোমসকে মেরে ফেলার পরে পাঠকদের দাবি মেনে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন পরের গল্পে। অধুনা টেলিভিশনে চলা মেগাসিরিয়াল নামক বস্তুটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেখানে নাকি কোনো নির্দিষ্ট গল্প থাকে না।

অভিনেতাদের কাকে কবে কতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে, দর্শক কোন অভিনেতাকে গ্রহণ করেছেন, কাকেই বা করেছেন বর্জন- সেইসমস্ত দিক হিসেব নিকেশ করে বানানো হয় একটি দিনের চিত্রনাট্য। নির্ণীত হয় কাহিনির ভবিষ্যৎ গতিমুখ। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি সাহিত্য বা শিল্পকর্মের টিকে থাকা নির্ভর করে পাঠক বা দর্শকের প্রতিগ্রহণের ওপর।

প্রতিগ্রহণের পরিধি প্রকৃত প্রস্তাবেই বৃহৎ। একাধিক তত্ত্বকে ঠাঁই দিয়ে প্রতিগ্রহণ হয়ে উঠেছে একাধিক পরিভাষার ধারক। আইসারের 'পাঠক প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব' (Reader Response theory) থেকে শুরু করে ইয়াযুসের 'প্রত্যাশার দিগ্‌বলয়' (Horizon of Expectation) অবধি একাধিক সাহিত্যতত্ত্বকেই প্রতিগ্রহণ চর্চার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। সাহিত্যের টিকে থাকা নিয়ে উপরের অনুচ্ছেদে যে আলোচনা হয়েছে তাকে রেমন্ড উইলিয়মসের ত্রয়ী পরিভাষা 'ডমিনেন্ট-রেসিডিউয়াল-ইমারজেন্ট'[১৮] এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। রেমন্ড উইলিয়মসের মতকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কোনো সাহিত্যই একেবারে 'নতুন' নয়। তা সব সময়েই পূর্বের কোনো না কোনো সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লেষণের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে এবং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট বর্গের মধ্যে যে সাহিত্যের আধিপত্য থাকে, তাকে ডমিনেন্ট বলা হয়। এটি যেমন কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম হতে পারে, তেমনি আবার হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্য শৈলী কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্য গোষ্ঠীর সাহিত্য। যেমন ধরা যাক বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে বাংলায় গদ্যের দুটি প্রধান ধারা প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে একটি হল বঙ্কিমি গদ্য আর অপরটি হুতোমীয়। বঙ্কিমি গদ্যের প্রধান সূচক ছিল

যেখানে সাধুরীতির ভাষা এবং তৎসম শব্দের অধিক ব্যবহার হুতোমীয় গদ্যে সেখানে দেখা গিয়েছিল চলিত ভাষা এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ছিল কথ্যরীতির প্রাধান্য। মানুষের মুখের ভাষাকেই লেখনীর মুখে তুলে আনার যে প্রচেষ্টা হুতোমীয় গদ্যের সম্পদ ছিল, তা সেইসময়ের পাঠক কিংবা পরবর্তীকালের অনুজ লেখকদের আনুকুল্য পায়নি বঙ্কিমের গদ্যের মতো। শুধু শৈলী নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও পাঠক এবং পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের অনুকুল্য লাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক অর্থে বলা যায় তিনি পাঠক এবং পরবর্তী সময়ের লেখকদের দ্বারা প্রতিগৃহীত হয়েছিলেন। তাই সেইসময়ের 'ডমিনেন্ট' সাহিত্যিক বঙ্কিম। আবার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য লেখকরা যখন উপন্যাস লিখছেন, তখন পূর্বপ্রজন্মের অগ্রজ লেখক হিসেবে তাঁরা আদর্শ মানছেন বঙ্কিমচন্দ্রকেই। লেখা হচ্ছে রোমান্স। ফলে রবীন্দ্রনাথের বাংলা উপন্যাস জগতে আবির্ভাবের প্রাক্কালে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন রেসিডিউয়্যাল। রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করছেন, তাঁর সামনে তখন আদর্শ স্বরূপ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমকে প্রতিগ্রহণ করে তার মধ্যে নিজস্বতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করছেন তাঁর স্বকীয় লেখনশৈলী- যা হয়ে যাচ্ছে বঙ্কিমের থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথের এই নতুন লেখা হল 'ইমারজেন্ট'। সুতরাং বলা যায় ইমারজেন্টের জন্ম ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের মিলিত প্রয়াসে। আবার রবীন্দ্র-পরবর্তী লেখকদের কাছে একসময়ের ইমারজেন্ট রবীন্দ্রনাথ পরিণত হচ্ছেন রেসিডিউয়্যালে। অর্থাৎ, এই 'ডমিনেন্ট-রেসিডিউয়াল-ইমারজেন্ট' -এগুলি স্থায়ীভাবে কোনো সাহিত্যিক বা তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটিই সাহিত্য ইমারজেন্ট থেকে পরিণত হতে পারে রেসিডিউয়্যালে। আবার একসময়ে ডমিনেন্ট হবার লড়াই থেকে

পিছিয়ে পড়া কোনো সাহিত্যকর্ম বা শৈলী বহু বছর পর ফিরে আসতে পারেন রেসিডিউয়্যাল রূপে। যেমন, একটা সময়ে যে হুতোমীয় গদ্য কেন্দ্র থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, নবারুণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতাড়ু সিরিজের গদ্যে কিংবা চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের লেখায় রেসিডিউয়্যাল রূপে তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। সেখানেও দেখা যাচ্ছে হুতোমীয় স্টাইলে কথ্য ভাষার ব্যবহার।

সুতরাং বলা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের ডমিনেন্ট সাহিত্য সমসাময়িক কোনো নতুন লেখকের লেখায় প্রভাব ফেলতেই পারে কিন্তু তার পাশাপাশি সেখানে থাকতে পারে পূর্ববর্তী যুগের কোনো অ-প্রধান লেখক বা তাঁর লেখনশৈলীর প্রভাবও। আর তখন, পূর্ববর্তী যুগের হারিয়ে যাওয়া সেই লেখক বা তাঁর লেখনশৈলীই গ্রহণ করে রেসিডিউয়্যালের ভূমিকা। ইমারজেন্ট অর্থাৎ নতুন কোনো রচনা ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের মিথস্ক্রিয়াতেই সৃষ্ট হয়। তাই একদিকে যেমন নতুন কোনো সাহিত্য বা সাহিত্যের ধারাকে যেমন পুরোপুরি 'নতুন' বলা যায় না, তেমনি আবার অন্যদিকে এটাও বলা যাবে না যে ওই নতুন সাহিত্য ধারাটি আসলে কোনো পুরোনো ধারারই অন্যরূপ। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রাখতে হবে ওই নতুন ইমারেজেন্ট সাহিত্যটিকে। তারপর দেখতে হবে ঠিক কীভাবে ওই ইমারজেন্টের মধ্যে ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে। দেখতে হবে কেন এবং কীভাবে ইমারজেন্টের মধ্যে ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের ঘটেছে আত্তীকরণ আর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য হয়েছে বর্জিত। আর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কীভাবে ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের এক বা একাধিক উপাদান ইমারজেন্টের মধ্যে প্রতিগৃহীত হয়েও ইমারজেন্ট সাহিত্যটি লাভ করেছে স্বকীয়তা-

হয়ে উঠতে পেরেছে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য। বেরিয়ে আসতে পেরেছে ডমিনেন্ট এবং রেসিডিউয়্যালের ছায়া থেকে।

সুতরাং বলা যেতে পারে এই 'ডমিনেন্ট-রেসিডিউয়াল-ইমারজেন্ট' কোনো স্থাণু ধারণা নয়। আজ যে সাহিত্য ডমিনেন্ট কাল তা গ্রহণ করতে পারে রেসিডিউয়্যালের রূপ। তবে সব সময় যে পূর্ববর্তী যুগের ডমিনেন্ট সাহিত্যই পরিবর্তিত হয় পরবর্তীকালের রেসিডিউয়্যালে- সে কথা সব সময় সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী যুগের পরিধিতে থাকা সাহিত্য ধারাটি বহুযুগ পরে পরিণত হয় রেসিডিউয়্যালে। নবারুণ বা চন্দ্রিলের লেখার মধ্যে হুতোমীয় রীতির প্রতিগ্রহণ যে তারই প্রমাণ- সে বিষয়ে পূর্বের অনুচ্ছেদে বিশদে আলোচনা হয়েছে। এখানে বিষয়টিকে ইটামার ইভান জোহারের 'বহুতন্ত্র' (polysystem)[১৯] তত্ত্বের গতিময়তার আলোকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় কীভাবে একটা সাহিত্যের 'টিকে থাকা' এবং বিস্মৃতির মধ্যে স্থবিরতা নয় বরং জঙ্গমতাই মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে। জোহার তাঁর তত্ত্বে দেখিয়েছেন সাহিত্যকে একটি বিচ্ছিন্ন কলাবিদ্যা হিসেবে না দেখে কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক তন্ত্রের মধ্যে একটি উপাদান হিসেবে সাহিত্যকে দেখা যায়। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, অপরাপর শিল্প মাধ্যম এই সবগুলিই কোনো না কোনো ভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এর কোনটিকেই বিচ্ছিন্ন উপকরণ হিসেবে দেখা যায় না। এই রকমই একটি তন্ত্র বা সিস্টেম হল সাহিত্য যার সঙ্গে অবশিষ্ট তন্ত্রগুলির সম্পর্ক জটিল এবং সদাপরিবর্তনশীল। প্রতিগ্রহণ চর্চার দিক থেকে এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ প্রতিগ্রহণের ক্ষেত্রেও সাহিত্যের সঙ্গে পাঠক, প্রকাশক থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

আর এক্ষেত্রেও সম্পর্কের প্রকৃতি স্থবির নয়, পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে সমর্থন করে বহুতন্ত্র তত্ত্বও। সুতরাং এই 'ডমিনেন্ট-রেসিডিউয়াল-ইমারজেন্ট' র পরিবর্তনশীলতা আসলে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সাহিত্যের ওপর অভিঘাত। কীভাবে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সাহিত্য দ্বারা প্রতিগৃহীত হয়েছে, তা অনুধাবন করতে গেলে সাহিত্যকে অবশিষ্ট সমাজবিদ্যাচর্চাগুলির সাথে মিলিয়ে একটি তন্ত্র হিসেবে দেখতে হবে। আর এই সব তন্ত্রগুলির নিজেদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে সবগুলিকে এক বৃহৎ বহুতন্ত্রের অংশ হিসেবেই স্বীকার করে নিতে হবে। প্রতিগ্রহণ চর্চাও একে সমর্থন করে।

এরপর আসা যাক আন্তর্পাঠ (Intertextuality) প্রসঙ্গে। এটিও এক বিশেষ ধরনের প্রতিগ্রহণ। কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্ট কোনো সাহিত্যকর্মের অংশকে যখন অন্য কোনো সাহিত্যিক ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করেন, তখন তাকে আন্তর্পাঠ বলা হয়। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই পরিভাষা প্রথম ব্যবহার করেন জুলিয়া ক্রিস্তোভা। সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Comparative Literature Terms and Concepts* গ্রন্থে আন্তর্পাঠ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

> "The primary object of Intertextuality as a tool of literary study is to analyse sign systems that are in dialogue within the text. Intertextuality is founded on the idea that meaning is not transferred directly from writer to reader. Rather, it is

mediated through, or filtered by, "codes" imparted to the writer and reader by the other existing texts in operation in the milieu that they inhabit. Kristeva was highly influenced by Bakhtin's account of 'Dialogic' in language and her idea of Intertextuality in literature conceptualizes the text as a space where the writing subject, the addressee or the ideal reader and already existing corpus of writing (other 'texts') enter into a dialogue. Bakhtin's concept of 'heteroglossia' and Barthes' analysis of codes and structures of the narrative, as well as his notion of 'readerly' and 'writerly' texts are applied in Kristeva's concept of Intertextuality."[২০]

কবিতার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ব্যাপক। রবীন্দ্র-কবিতার পঙ্‌ক্তির অংশবিশেষকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করার ব্যাপারে সবার আগে যাঁর নাম উঠে আসে, তিনি হলেন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্র-কবিতার 'পঙ্‌ক্তি' শুধুমাত্র ভিন্ন প্রেক্ষিতে নিজের কবিতায় পুনর্ব্যবহারই তিনি করেন নি, নিজের কাব্যগ্রন্থ *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার* -এর নামটিও রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেই। তাঁর রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিগ্রহণের মধ্যে আন্তর্পাঠের বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে।

শুধু বিষ্ণু দে-ই নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও রবীন্দ্র-কবিতার পুনর্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের "বধূ" কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক প্রতিগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ" কবিতাটি প্রকাশিত হয় *মানসী* (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থে। আর এর অর্ধশতাব্দী পর, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* -এ পাচ্ছি আরেক 'বধূ' র কথা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে আবার ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কবিতার পুনর্ব্যবহার। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের কবিতার আন্তর্পাঠ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

এবার আসা যাক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা অর্থাৎ প্যারডির প্রসঙ্গে। কোনো বিশেষ কবিতার শব্দবন্ধ বা শৈলীর ইচ্ছাকৃত অনুকরণ করে তাকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করে হাস্যরস উৎপাদন করাই প্যারডি রচনার মূল লক্ষ্য। যেহেতু এখানে মূল কবিতাটির কিছু শব্দ বা শৈলীর অনুকরণ করা হয় কিন্তু তার প্রেক্ষিত থাকে ভিন্ন, তাই একে মূল কবিতার নেতিবাচক প্রভাব যেমন বলা যায়, তেমনি আবার আন্তর্পাঠ বললেও ভুল হয় না। প্যারডির মুখ্য উদ্দেশ্য মূল কবিতা এবং তার কবিকে ব্যঙ্গ করা। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্যারডিই উৎপন্ন করে হাস্যরস। মূল কবিতার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য বজায় রেখে মূলের সম্পূর্ণ রসাবিষ্ট অনুভূতিকে বিনষ্ট করাই তার লক্ষ্য। সুতরাং বলাই যায় যে এই ধরনের কবিতায় রচয়িতা মূলকে প্রতিগ্রহণ অবশ্যই করেন কিন্তু সেই প্রতিগ্রহণ ঘটে পুরোপুরি নেতিবাচক দিকে। বাংলা সাহিত্যে প্যারডি কবিতার উদাহরণের অপ্রতুলতা নেই। *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় সজনীকান্ত দাস প্রকাশ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসালামের বীররসে সাদ্র কবিতা 'বিদ্রোহী'-র প্যারডি। যার নাম ছিল 'ব্যাঙ'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করার জন্য তাঁর

অনেক কবিতারই ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। নিচে তেমনি একটি রবীন্দ্র-কবিতা ও তার দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক প্যারডির উল্লেখ করা হল।

মূল রবীন্দ্র-কবিতাটি ছিল এইরকম-

“তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুল কল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।”[২১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত প্যারডি কবিতায় তা হল-

“ আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই-
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি-
আর তোমরা নিদ্রা যাও।

বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি,

তোমরা গহনাপত্র ও টাকাকড়ি

অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি-

দ্রুত চম্পট দাও।"[২২]

এর পর আসা যাক অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে। অনুবাদকর্মকে প্রতিগ্রহণ বলা যায় কিনা, তা নিয়ে সমালোচক মহলে দ্বিমত রয়েছে। একদল অনুবাদের প্রকৃতত্ব রক্ষায় সদা বিশ্বাসী। তাঁদের মতে অনুবাদ এমনই হবে, যা মূল পাঠের অনুরূপ-অর্থাৎ মূলানুসারী। মূল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করা ছাড়া অনুবাদ কর্মের আর কোনো কাজ নেই। এই শ্রেণির সমালোচকরা মনে করেন যেসব পাঠক ভাষাগত কারণে মূল রচনাটির আস্বাদ পেতে অপারগ, কেবলমাত্র তাদের জন্যই অনুবাদ প্রয়োজনীয়। তাই অনুবাদকর্মে নতুন কোনো সৃষ্টিশীলতার আমদানী করা সেইসব পাঠকদের বঞ্চিত করা হবে। সুতরাং অনুবাদকর্মে কোনোরূপ সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ না ঘটিয়ে কেবলমাত্র মূল রচনাটির ভাষান্তরই কাঙ্ক্ষিত। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভাষাগত পদবিন্যাস বদলের জন্য যেটুকু পরিবর্তন না করলেই নয়, সেটুকু মাত্র পরিবর্তনই করা উচিত।

প্রভাব চর্চার কথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যেখানে প্রতিগৃহিত সাহিত্যকর্মকে উৎস বা প্রেরকের তুলনায় নিম্ম মানের বলে মনে করা হয়। সুতরাং সেই পথ অনুসরণ করে যদি এখানেও অনুবাদকর্মটিকে মূল সাহিত্যকর্মটির গ্রাহক বলে মনে করে নিই, তাহলে খুব একটা ভুল হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুবাদকর্মটিকে প্রতিগ্রহণ নয় বরং

প্রভাবের উদাহরণ বলে মনে করাই শ্রেয় হবে। কারণ এখানে উভয় সাহিত্যকর্মের গুণগত মানের পার্থক্য দাবি করা হয়েছে এবং অনুবাদ সাহিত্যকর্মটির স্বকীয়তাকে স্বীকার করা বা উৎসাহ দেওয়া হয় নি। বরং তাকে মূলানুগ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর লেখা *Theory of Literary Comparatistics* গ্রন্থে ডিউরিসিং কিন্তু অনুবাদকে একটি বিশেষ ধারার প্রতিগ্রহণ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ওই গ্রন্থে তিনি লিখছেন-

> " Translation represents a highly characteristic and significant form of interliterary reception. In evaluating translation, we cannot make a global approach, as is often done, since the evaluation of a translation must inevitably arise from the relationship of the translator to the original, and yet must also take into account other facts. The relationship to the original is very various and its variability indicates a wide scale of possibilities. It follows from the history of translation that it is conditioned not only by the peculiar poetics of the time, but also by the poetics of the translator himself."[২৩]

ভারতীয় প্রেক্ষিতে কিন্তু অনুবাদকর্মকে একটি স্বতন্ত্র, পৃথক সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিতে একটি অনুবাদকর্মকে মূলের প্রতিগ্রহণ হিসেবে দেখাই শ্রেয়। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতিগ্রহণে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকে প্রেরক নয়, গ্রাহক। সুজিত মুখার্জি তাঁর প্রবন্ধ "Translation as New Writing" এ দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয় সাহিত্যের নিরিখে অনুবাদ সাহিত্য মূল সাহিত্যকর্মটির প্রতিগ্রহণ করেও ক্রমশ মূলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে পরিণত হয় একটি 'নতুন' সাহিত্যে।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে যে অনুবাদ সাহিত্য একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যের মর্যাদা পায়, তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ রামায়ণ এবং মহাভারতের একাধিক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদকর্ম। সংস্কৃতে রচিত মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের ভারতবর্ষের একাধিক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু সেই অনুবাদগুলি যতনা মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদকর্ম হিসেবে পরিচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রসিদ্ধ অনুবাদকর্তাদের নামাঙ্কিত সাহিত্যকর্ম হিসাবে। উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। বাল্মীকি রামায়ণের বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস। সেই অনুবাদের নাম *শ্রীরাম পাঁচালী* বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ। মূল বাল্মীকি রামায়ণের প্রধান কাহিনি কাঠামো অবিকৃত রাখলেও একাধিক উপকাহিনি এখানে সংযোজিত এবং বিয়োজিত হয়েছে। তার পাশাপাশি কাহিনির বেশ কিছু জায়গা এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন কৃত্তিবাস যে কাহিনিকে একটুও ভাষান্তরজাত বলে মনে হয় না। নতুন সৃষ্ট কোনো সাহিত্য বলেই মনে হয়। আরো ভালভাবে বললে কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্রীরামচন্দ্র হয়ে উঠেছেন বাঙালী। তাই বাংলায় এই রামায়ণ যেন অনুদিত নয় বরং রচিত হয়েছে

কৃত্তিবাসের হাতে। তাই রচয়িতার নাম থেকে মহাকবি বাল্মীকি গেছেন মুছে, তাঁর স্থানে এসেছেন কবি কৃত্তিবাস- অনুবাদক কৃত্তিবাস নন।

শুধু কৃত্তিবাস নন, এই একই কথা রামায়ণের তুলসীদাসকৃত হিন্দি অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই অনুবাদ অর্থাৎ *রামচরিতমানস* পরিচিত তুলসীদাসী রামায়ণ হিসেবে। কৃত্তিবাসের হাতে শ্রীরামচন্দ্র যেমন হয়ে উঠেছেন বাঙালী, তেমনি তুলসীদাসী রামায়ণ সাদ্র ভক্তিরসে। আবার পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণে সীতার প্রতি অন্যায় আচরণকারী রামচন্দ্র কবির কর্তৃক হয়েছেন ভর্ৎসিত সীতার প্রতি অবমাননাকর রামায়ণের উত্তরকান্ড সেখানে বর্জিত। এই রামায়ণের নারীবাদী নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই রকম অনুবাদকে প্রতিগ্রহণ বলাই কোনো ভুল নেই।

আবার রামায়ণের অংশবিশেষের গল্প নিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬১ সালে যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আলংকরিক মহাকাব্য *মেঘনাদবধকাব্য* রচনা করেন, তখন দেখা গেল সেখানে শ্রীরামচন্দ্র নন বরং রাবণ এবং তাঁর পুত্র মেঘনাদই ট্রাজিক নায়ক। জন্মভূমি লঙ্কাপুরীকে রক্ষা করার জন্য মেঘনাদের শহীদত্ব বরণকে গরিমান্বিত করলেন মধুকবি। একটা পরাধীন দেশের কবিমানসের যন্ত্রণার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ এখানে সুস্পষ্ট। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, দুটি বিষয় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একটি হল স্থান ও কালের চাহিদা আর দ্বিতীয়টি গ্রহীতা লেখকের বা কবির নিজস্ব ভাবমন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। উভয়ের মেলবন্ধনে একই কাহিনি সামান্য কিছু পরিবর্তনকে সঙ্গী করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কবির হাতে পড়ে পরিবর্তিত এবং

প্রতিগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। শুধু ভাষান্তরেই নয়, সংস্কৃততেও বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনির অংশবিশেষ প্রতিগৃহীত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সাহিত্য, যেমন- ভবভূতির *উত্তররামচরিত*- যার মধ্যে প্রতিগৃহীত হয়েছে মূল বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকান্ড। আবার বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সীতার বনবাস*- এ প্রতিগৃহীত হয়েছে ভবভূতির *উত্তররামচরিত*। যদিও এক্ষেত্রে সাহিত্যবর্গগত সমতা রক্ষিত হয় নি।

মধুকবির *মেঘনাদবধকাব্য*-তে আবার একই সাথে ভারতীয় মহাকাব্য এবং প্রাচীন গ্রীক এপিকের নির্মাণশৈলীর বিক্রিয়া ঘটেছে। মহাকাব্য এবং এপিকের বৈশিষ্ট্য এখানে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে নির্মিত হয়েছে নতুন বিক্রিয়াজাত সাহিত্য। মহাকাব্যটিতে ব্যবহৃত ছন্দোবন্ধটিও পয়ারের সঙ্গে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের বিক্রিয়াজাত অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধ- যেখানে পয়ারের অন্ত্যমিল অনুপস্থিত কিন্তু প্রতিটি পঙ্‌ক্তি চোদ্দ মাত্রার। আবার অর্থযতি এবং ছন্দযতি পয়ারের মতো সমাপতিত হয়নি- পেয়েছে ভিন্ন স্থান। এইভাবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ- উভয় দিক থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার প্রাচীন সাহিত্যবর্গ অর্থাৎ মহাকাব্য ও এপিকের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে এই রচনায়।

কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো জটিল। কবিতা এমন একটা সাহিত্যবর্গ যেখানে শব্দের প্রয়োগটাই মূল অস্ত্র। শব্দচয়নে কবিরা স্বাতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এখানে সংকেত, রূপক, উপমার ছড়াছড়ি। শব্দের নিজস্ব ঘ্রাণ তৈরি হয় কবিতায় এবং অন্যসব সাহিত্যবর্গের থেকে কবিতায় ভাবমন্ময়তা বহুগুণ বেশি। এহেন সাহিত্যবর্গের যখন অনুবাদ হয়, তখন তার প্রাণ যে শব্দসমূহ- সেগুলিরই তো ভাষান্তরিত হয়ে যায়। ফলে অনুবাদক নিজের মতো করে ধরে রাখতে চান মূল

কবিতার আবেশ। কিন্তু মুল কবিতার আবেশ তো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। তাই, প্রকৃতপক্ষে মূল কবিতা অনুবাদকের দ্বারাই প্রতিগৃহীত হয়ে সৃষ্টি হয় অনুবাদ-কবিতা। তাই, শার্ল বোদলিঁয়রের কবিতার বুদ্ধদেব বসু কৃত অনুবাদে যেমন বুদ্ধদেবের বোদলিঁয়র-প্রতিগ্রহণের চিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাব্‌লো নেরুদা-প্রতিগ্রহণ দেখা যাবে নেরুদার শক্তিকৃত অনুবাদে। রোমান জ্যাকবসন প্রমুখ মস্কো লিঙ্গুইসটিকস চক্রের রাশিয়ান প্রকরণবাদীদের অনুসরণ করে যদি কবিতাকে শব্দের বিপরিচিতিকরণ[২৪] বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে একথা অস্বীকার করার কোনও জায়গাই থাকে না যে প্রতিটি অনুবাদ-কবিতাই এক একটি স্বতন্ত্র কবিতা। কারণ, কবিতা যদি শব্দের বিন্যাস-কৌশল বলে স্বীকার করে মেনে নিই, আর শব্দ যদি হয় ভাষাতন্ত্র ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত, তাহলে সেই শব্দকে অন্য একটি ভাষাতন্ত্র আর সংস্কৃতিতে রূপান্তর করলে মূল কবিতার ঘ্রাণ ও আঘ্রাণ আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অথবা একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে একটি অনুবাদ কবিতার মধ্যে মূল কবিতার আঘ্রাণের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা কি নিছকই অপপ্রচেষ্টা নয়, কারণ শব্দের বিপরিচিতিকরণের প্রক্রিয়ার যে তাৎপর্য সেটা তো ভাষাতন্ত্র আর সংস্কৃতিভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করবে। একজন অনুবাদক-কবির কাছে এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রতিস্পর্ধা যে তাকে মূল কবিতাটিকে ব্যবহার করে আরএকটি গোটা কবিতা লিখতে হবে। মূল কবিতা তখন তার কাছে শুধুই উৎস নয় বরং সাহিত্য রচনার কাঁচামাল বা রোস্টফ[২৫]। সেই রোস্টফ থেকে সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ উপকরণ অর্থাৎ স্টফ[২৬] এর নির্মাণের প্রধান দায়িত্ব সেই অনুবাদক-কবিরই। এইভাবে মূল

কবিতার নিবিড় প্রতিগ্রহণের ফলে একটি ভিন্ন ভাষায় এবং সংস্কৃতিতে জন্ম নেবে একটি নতুন কবিতা।

এরপর আসা যাক আরেক ধরনের প্রতিগ্রহণ বিষয়ে। ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যবর্গের কোনো সাহিত্যকর্ম অন্য কোনো বর্গের সাহিত্য মাধ্যমে প্রতিগৃহীত হল। এই ধরনের প্রতিগ্রহণকে বলা হয় অ্যাডাপটেশন। সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Comparative Literature Terms and Concepts* গ্রন্থে অ্যাডাপটেশন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে-

> "Adaptations have conveniently transcended genres. Most Shakespearean plays are taught in junior school levels in India as prose pieces. Lamb's *Tales from Shakespeare (1807),* probably the best known adaptation of Shakespearean works, has provided this method to make Shakespeare popular among readers who will otherwise be unable to read the original work. Thus, while translations remove the barrier of language, adaptations make the works more palatable to the readers by bringing them by in a genre more convenient for them."[২৭]

এরপর আসা যাক একটু ভিন্ন ধরনের প্রতিগ্রহণ বিষয়ে। ধরা যাক কোনো সাহিত্যকর্ম অন্য কোনো অ-সাহিত্য শিল্প মাধ্যমে প্রতিগৃহীত হল। সেই প্রতিগ্রহণের আবার

দ্বিতীয়বার প্রতিগ্রহণ ঘটলো অন্য এক তৃতীয় ক্ষেত্রে। তখন দ্বিতীয় মাধ্যমটিকেই উৎস বলে ধরে নেওয়া মোটেই যথোপযুক্ত হবে না। কারণ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে কোনও সাহিত্যের প্রবেশ ঘটলে তার মাধ্যমগত বিচ্যুতি ঘটবেই। প্রতিগ্রহণের অন্যান্য সব দিকের মতো এটাও একটা দিক। যেমন ধরা যাক, সত্যজিৎ রায় নির্দেশিত ‘পথের পাঁচালী’ চলচিত্রটি দেখে কেউ সেটির একটি সাহিত্যিক প্রতিগ্রহণ রচনা করলেন, সেই প্রতিগ্রহণের আলোচনা করার সময়ে চলচিত্রটির পাশাপাশি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উপন্যাস *পথের পাঁচালী* সম্বন্ধে আলোচনাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ এখানে প্রতিগ্রহণের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হল সত্যজিৎ কৃত বিভূতিভূষণ-প্রতিগ্রহণ আর অন্যটি দ্বিতীয় লেখকের সত্যজিৎ-প্রতিগ্রহণ। ফলে উভয় স্তরের আলোচনা না হলে প্রতিগ্রহণ চর্চা এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

এরপর আসা যাক প্রতিগ্রহণ বিষয়ক কিছু বিদেশি তত্ত্বের। আগেই বলেছি প্রতিগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে কোন একটি তত্ত্ব নয়। বরং এই একটি পরিভাষার মধ্যে একাধিক তত্ত্বকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। পূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে যে প্রতিগ্রহণ চর্চার জন্ম বিশ শতকের ছয়ের দশকে জার্মানীতে। তারপর তার যাত্রা পশ্চিমের একাধিক দেশে। প্রতিগ্রহণ চর্চার মধ্যে যে জনপ্রিয় তত্ত্বগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তার মধ্যে ইটামার ইভান জোহারের পলিসিস্টেম বা বহুতন্ত্র তত্ত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন আরো দুটি তত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে- একটি হল পাঠক প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব (Reader Response criticism)[২৮] আর অন্যটি প্রত্যাশার দিগবলয় (Horizon of expectation)[২৯]।

প্রথমেই আসা যাক 'প্রত্যাশার দিগবলয়' (The horizon of expectations) তত্ত্বের আলোচনায়। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হান্স রবার্ট ইয়ায়ুস। তবে তিনিই প্রথম এই 'প্রত্যাশা' (expectation) এবং দিগ্‌বলয় (horizon) প্রয়োগ করার কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। তাঁর পূর্বে জার্মান দর্শনচর্চায় এই শব্দের ব্যবহার চালু ছিল। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই তত্ত্বের সূচনা হান্স রবার্ট ইয়ায়ুসের হাতে হলেও তাঁর বহু আগে থেকেই 'প্রত্যাশা' এবং 'দিগ্‌বলয়'- এই দুটি পরিভাষাই পরিচিত ছিল জার্মান বুদ্ধিজীবী মহলে। ইয়ায়ুসের আগে 'দিগবলয়' শব্দটি প্রয়োগ করেন গাদামার। যদিও তাঁর এই প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল দর্শনশাস্ত্রের কিছু বিশেষ উপশাখার মধ্যেই। ইয়ায়ুসের ক্ষেত্রেও অবশ্য এই শব্দগুলির প্রয়োগ খুব একটা সুনির্দিষ্ট ছিল না। Holub লিখছেন-

> "The trouble with Jauss's use of the term "horizon" is that it is so vaguely defined that it could include or exclude any previous sense of the word. In fact, nowhere does he delineate precisely what he means by it."[৩০]

ওই একই প্রবন্ধে হলুব আরো বলছেন-

> " When he discusses its origins late in his "Provocation" essay, he cites his earlier references to the term in 1959 and 1961; but turning to these writings we find a similar lack of specificity. Furthermore, the term is found in a variety of

compound words or phrases. Jauss refers to a "horizon of experience," a "horizon of experience of life", a "horizon of structure," a "horizon of change," and a "material horizon of conditions." The relationship of these various uses is left just as nebulous as the category "horizon" itself. Jauss seems to bank on the reader's common sense in understanding at least his main term."[৩১]

উপরের উক্তির শেষ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তত্ত্বে 'দিগবলয়' শব্দটির অর্থকে সংজ্ঞায়িত করে সীমাবদ্ধ করার পথে না হেঁটে, তার অর্থ নিরুপণকে পাঠকের সাধারণ বোধগম্যতার উপরে ছেড়ে দিয়ে ইয়াযুস প্রকৃতপক্ষে শব্দটির দ্যোতনাকে মুক্ত এবং আরো প্রসারিত করে দিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণের নিরিখে এই তত্ত্বের সূচনা করেন ইয়াযুস। তাঁর মতে একটি সাহিত্যকর্ম কোনো স্থির বস্তু নয় যা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পাঠকের কাছে একই অর্থ নিয়ে হাজির হবে। কোনো স্মৃতিসৌধের মতো একটি সাহিত্যকর্ম কখনোই কালোত্তীর্ণ আবেদন নিয়ে হাজির হয় না তার পাঠকের কাছে। ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানের পাঠকের কাছে একই সাহিত্যকর্ম ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়।

ইয়াযুস প্রবর্তিত 'প্রত্যাশার দিগ্‌বলয়' তত্ত্বের মধ্যে 'দিগ্‌বলয়' শব্দের অনির্দিষ্টতাকে স্বীকার করে নিয়েও তত্ত্বটি সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে দিগ্‌বলয়ের পরিধি কিছুটা হলেও নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে,

প্রতিগ্রহণের প্রথম দিকের তত্ত্ব হিসেবে ‘প্রভাব’ এর বদলে এই তত্ত্বের অভিমুখ ছিল পাঠকের দিকে। সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, এখানে ‘প্রত্যাশা’ বলতে পাঠকের প্রত্যাশার কথাই প্রধানত ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল পাঠকের প্রত্যাশা কী এবং কার প্রতি। এর উত্তরে বলা যায়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের প্রত্যাশা একাধারে কোনো একটি সাহিত্যকর্ম এবং কোনো একজন নির্দিষ্ট সাহিত্যিকের প্রতি। একটি নির্দিষ্ট যুগে একটি নির্দিষ্ট স্থানের একটি নির্দিষ্ট বর্গের সাহিত্যকর্ম কিংবা একজন নির্দিষ্ট সাহিত্যিকের ওপর সেই সময়ের পাঠকদের কিছু নির্দিষ্ট প্রত্যাশা থাকে। এই প্রত্যাশা তৈরি হয় পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পাঠের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, সোজা কথায় বললে হয়, একটি নির্দিষ্ট বর্গের সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে একজন পাঠকের মনোজগতে সেই সাহিত্যবর্গ সম্বন্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের স্থান পাকা হয়। তারপর সেই পাঠক যখন ওই একই সাহিত্যবর্গের অন্য সাহিত্য পাঠ করতে উদ্যত হন, তখন তাঁর মনোজগতে ওই সাহিত্যবর্গের সাহিত্যকর্ম হিসেবে ওই সাহিত্যকর্মটি সম্পর্কে কিছু প্রাক্-নির্দিষ্ট ধারণার প্রত্যাশা তৈরি হয়। অর্থাৎ পাঠক মনে করে নেন যে লেখাটি ওই বর্গের সাহিত্য বলে তার কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন, যেসব পাঠক সনেট পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে এই নির্দিষ্ট কবিতাবর্গটিতে পঙ্‌ক্তি সংখ্যা চোদ্দ। ফলে নতুন কোনো সনেট পড়ার সময় সেই পাঠকের প্রত্যাশার মধ্যে থাকবে যে সেই পঠিতব্য কবিতাটির ক্ষেত্রেও মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে চোদ্দই থাকবে। এই প্রত্যাশার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা দিগ্‌বলয় থাকে। অর্থাৎ পাঠক লেখাটির সব বৈশিষ্ট্যই তার প্রত্যাশার মধ্যে নির্দিষ্ট করে রাখেন না। যেমন, উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে সনেটের মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি

প্রাক্-নির্দিষ্ট ধারণা জাত সংখ্যা অর্থাৎ চোদ্দ থাকলেও প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রাসংখ্যা সম্পর্কে অতটাও সুনির্দিষ্টতা নেই। মধু কবির সনেটের ক্ষেত্রে প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে সে যেমন চোদ্দ মাত্রার উপস্থিতিতে স্বীকার করে নেয়, তেমনি আবার জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-র সনেটগুলির ক্ষেত্রে সে বাইশ মাত্রাকেও গ্রহণ করতে পারে সনেটের পঙ্‌ক্তি হিসেবে। আবার অনেক সময় একজন কবি বা সাহিত্যিক প্রথম পাঠকের মধ্যে কোনো নতুন বর্গের সাহিত্য সম্পর্কে প্রত্যাশার জন্ম দেন। সেই সাহিত্যবর্গটি নতুন বলে পাঠকের মনে তার সম্পর্কে কোনো প্রাক-নির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলায় নভেল লিখতে শুরু করলেন তখন নভেল- এই সাহিত্যবর্গটির বাংলায় কোনো অস্তিত্বই ছিল না, ফলে পাঠকের মনে নভেল সম্পর্কে প্রত্যাশা-র জন্ম দিচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে মধ্যে রচয়িতার পাঠকের উদ্দেশ্যে করা মন্তব্যগুলির সাহায্যে পাঠকের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।আবার বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠকের কাছে মহাকাব্যের প্রতি যে যে প্রত্যাশা ছিল, মাইকেল সেগুলি পরিবর্তিত করেছেন। ধীরোদাত্ত মহাকাব্যিক নায়ক এখানে শ্রীরামচন্দ্রের বদলে প্রতিষ্ঠিত খল চরিত্র 'রাক্ষস' রাজ রাবণ ও তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিৎ। তাছাড়া, নিয়ম ভেঙে বীর, শৃঙ্গার এইসব রসের পরিবর্তে *মেঘনাদবধ কাব্য* তে প্রধান রস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে করুণ রস। সুতরাং এইভাবে কোনো শক্তিশালী সাহিত্যিক পাঠকের মনোজগতের প্রত্যাশার দিগবলয়ের পরিধিকে পরিবর্তিত করতেই পারে।

এরপর আসা যাক অপর তত্ত্ব অর্থাৎ Reader Response criticism বা পাঠক প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে। পাঠক প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক সমালোচনা প্রকৃতপক্ষে কোনো একজন তাত্ত্বিকের নির্মাণ নয়। প্রত্যাশার দিগবলয়ের মতো বিশ শতকের ছয়ের দশকের জার্মানিতেই এর সূচনা হলেও আমেরিকার নব্য সমালোচক গোষ্ঠী বা New Critic দের সাথেও একে সম্পর্কিত করা যায়। তত্ত্বটির নাম থেকেই স্পষ্ট যে পূর্বের তত্ত্বের মতো এখানেও সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে পাঠকের উপর। একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লেখক নন বরং পাঠকের সাহিত্যটি পড়ার পরে যে অনুভব বা প্রতিক্রিয়া- তাকেই গুরুত্ব প্রদানের কথা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে এই তত্ত্বের একাধিক প্রবক্তা এবং আলোচকের লেখায়। এই তত্ত্বের কথা উঠলে প্রথমেই আসে জার্মান তাত্ত্বিক উলফ্‌গ্যাঙ্গ আইসারের কথা। ১৯৭০ সালে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার মুদ্রিত রূপের মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে আইসার বুদ্ধিজীবী-মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এই তত্ত্ব ইয়াযুসের “Provocation” তত্ত্বের মতো সাড়া ফেলেনি বা বিতর্কেরও সৃষ্টি করেনি। এ প্রসঙ্গে হোলুব লিখছেন-

> “ His most successful early piece, “ Die Appellstruktur der Texte” (1970) which appeared in English as “Indeterminacy and the Reader’s Response in Prose Fiction”, was originally a lecture delivered at the University of Constance, where Iser also teaches. The impact of this talk and its printed version, although perhaps not as intense or protracted as the reaction

> to Jauss's "Provocation", established Iser as one of the foremost theorists of the "Constance School."[৩২]

উপরের উক্তি থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইয়ায়ুস এবং আইসারের তত্ত্বের একটা তুলনা চলে আসে। দুটি তত্ত্বের মধ্যে প্রধান মিল এই যে, প্রতিগ্রহণ চর্চার এই দুই তত্ত্বই লেখক বা রচয়িতার বদলে গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তিত করেছেন পাঠকের ওপর এবং তাই লেখকের সৃষ্টিকর্মের বদলে সাহিত্যকর্মটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাঠকের সেই সাহিত্যটি পাঠের মাধ্যমেই। কিন্তু এই মিলটুকু বাদ দিলে উভয় তত্ত্বের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ইয়ায়ুসের তত্ত্ব যেখানে সাহিত্যের ইতিহাস ও তার গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধানের ধারার মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরেছে, আইসারের তত্ত্ব সেখানে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের ওপর পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই। হোলুব লিখছেন-

> "What has interested Iser from the outset is the question of how and under what conditions a text has meaning for a reader. In contrast to traditional interpretation, which has sought to elucidate a hidden meaning in the text, he wants to see meaning as the result of an interaction between text and reader as "an effect to be experience" not an "object to be defined". Ingarden's conception of the literary work of art thus provides a useful framework for his investigations."[৩৩]

সুতরাং আইসার অনেক বেশি স্থানিক এবং নির্দিষ্ট। ইয়ায়ুস সেখানে তাঁর তত্ত্বের পরিভাষাগুলির অনির্দিষ্টতার মতোই অনেক বেশি পরিমাণে অনির্দিষ্ট। আবার ইয়ায়ুসের মতো আইসারকেও তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীকে অনুসরণ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই পূর্বসূরী হলেন রোমান ইনগার্ডেন। এ প্রসঙ্গে হোলুব লিখছেন-

> "Particularly important in this regard has been the work of Roman Ingarden, from whom Iser adopts his basic model as well as a number of key concepts."[৩৪]

যদিও ইনগার্ডেনের কাছ থেকে মূল কাঠামোটি গ্রহণ করলেও আইসার তাঁর তত্ত্বকে নিজের মতো করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে যে সমর্থ হয়েছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর তত্ত্বের প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একটি সাহিত্যকর্মের পাঠক দ্বারা প্রতিগৃহীত তাৎপর্যকে। রচয়িতার দ্বারা নামাঙ্কিত কোনো রচনাকে আসলে পাঠকের পাঠের মাধ্যমেই অর্থবহ হয়ে ওঠে, নিজের তত্ত্বে সে কথাই বারংবার বোঝাতে চেয়েছেন আইসার। এইভাবে আইসারের এই তত্ত্বটি প্রতিগ্রহণ চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ হয়ে উঠেছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে তুলনামূলক সাহিত্যে পাঠ নিরীক্ষণ পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রতিগ্রহণ চর্চা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একদিকে যেমন একটি সাহিত্যকর্মকে পূর্বের কোনো সাহিত্যের ছায়ার আড়ালেও পড়তে চায় না, তেমনি আবার প্রতিটি সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার পরেও এটা প্রমাণ করে যে কোনো সাহিত্যকর্মই ভুঁইফোড় নয়। সাহিত্য নদীর মতো সততই প্রবাহিত হতে

থাকে। জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ধার করে একথা বলাই যায় যে সাহিত্য আলোকশক্তির মতো বিচ্ছিন্ন শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টার আকারে পাঠক সমাজে আবির্ভূত হয় না। সাহিত্যের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ ও বিষয়গত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের প্রকৃতি স্থাণু নয়, বরং জঙ্গম। আর এর পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে একজন সাহিত্যিকের রচনা পড়ে আরেকজন সাহিত্যিকের অন্য কোনো রচনার কথা স্মরণে আসা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বিষয়টির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত রয়েছে, তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রভাব চর্চায়। তারপর প্রতিগ্রহণ চর্চায় সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু সরে গেল গ্রহীতা এবং পাঠকের দিকে। এইভাবে পূর্ববর্তী প্রভাব চর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে প্রতিগ্রহণ চর্চার মাধ্যমে একটি সাহিত্যের নিবিড় পাঠ সম্ভব- স্থানিক ও চিরায়ত- উভয় দিক থেকেই। এখানেই প্রতিগ্রহণ চর্চার তাৎপর্য।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

[১] M M Bakhtin, *The Dialogic Imagination* Four essays by M.M. Bakhtin. trans. C. Emerson and M Holquist. (USA: University of Texas Press 1981), 23.

[২] যদি x ও y এমন দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চলরাশি হয় যে x এর মানের পরিবর্তন ঘটালে y এর মানও বদলে যায়, তাহলে y কে x এর অপেক্ষক বলা হয় এবং কলনবিদ্যার ভাষায় একে y=f(x) এই সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[৩] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খন্ড (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১ বঙ্গাব্দ), ২৭৮।

[৪] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 46.

[৫] তদেব।

[৬] Robert C. Holub, *Reception Theory A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), xi

[৭] উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, *বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৯), ২৯২।

[৮] অশ্রুকুমার শিকদার, *কবির কথা কবিতার কথা* (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), ১০৭-০৮।

[৯] Robert C. Holub, *Reception Theory A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), xiii.

[১০] Ulrich Weisstein, *Comparative Literature and Literary Theory* (Bloomington: Indiana University Press, 1973), 48.

[১১] Robert C. Holub, *Reception Theory A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), xii.

[১২] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 43.

[১৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ **১৩৮৯** বঙ্গাব্দ), ২১।

[১৪] তদেব, ৮।

[১৫] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 44.

[১৬] Ulrich Weisstein, *Comparative Literature and Literary Theory* (Bloomington: Indiana University Press 1973), 35।

[১৭] তদেব, 48।

[১৮] Raymond Williams, *Marxism and Literature* (New York: Oxford University Press, 1985), 121.

[১৯] Susan Basnett, *Introduction to Comparative Literature: A Critical Introduction* (Oxford, Blackwell, 1993), 10.

[২০] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 49-50.

[২১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "তোমরা ও আমরা", *সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী,* তৃতীয় খন্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), ২৪।

[২২] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'আমরা ও তোমরা', *হাসির গান, দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড,* সম্পাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ও গোপাল হালদার (কলকাতাঃ সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩), ১৮০।

[২৩] Diony'z Durisin, *Theory of Literary Comparatistics,* trans. Kocnanova, Jesse (Batislava: Batislava Veda Publishing House of Slovak Academy of Sciences, 1984), 178.

[২৪] Roman Jakobson, ' Linguistics and Poetics', *Modern Criticism and Theory : A Reader ed. Lodge,* David (UK: Longman, 1989), 32.

[২৫] Sibaji Bandyopadhyay (ed). *Thematology, Literary Studies in India,* (Kolkata: DSA, Jadavpur University 2004), 12.

[২৬] তদেব।

[২৭] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 8.

[২৮] Robert C. Holub, *Reception Theory A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), 78.

[২৯] তদেব, ৫৮।

[৩০] তদেব, ৫৯।

[৩১] তদেব, ৫৯।

[৩২] তদেব, ৮২।

[৩৩] তদেব, ৮৩।

[৩৪] তদেব, ৮৩।

২. প্রাক্‌-পঞ্চাশ আধুনিক বাংলা কবিতা

২.১ তিনের দশকের কবি ও কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রধানত দুটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সেগুলি হল-

এক) আধুনিক বাংলা কবিতার কালসীমা ।

দুই) আধুনিক বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমস্ত কালসীমারই সূচনা এবং অন্ত এই দুটি বিন্দু থাকে। এক্ষেত্রে এই ধারাটি এখনো বিদ্যমান বলেই মনে করা হয়। সুতরাং এর অন্তিম কাল নিরূপণের সময় এখনও আসেনি এবং এর সূচনাকালকে ঘিরেই যাবতীয় মতপার্থক্য। আধুনিকতা কোনো দেশ কাল নিরপেক্ষ শব্দ নয়। সুতরাং বাংলা কবিতার হাজার বছরেরও বেশি দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে ঠিক কোন সময় থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হল,সে বিষয়ে মতভেদ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক । 'আধুনিকতা' শব্দটির দ্বারা সময়ের থেকে এগিয়ে থেকে বোঝালে বলা যায় যে প্রত্যেক বড় কবিই তার সময়ে আধুনিক। ভারতচন্দ্রের সময়ে ভারতচন্দ্র আধুনিক, রঙ্গলালের সময়ে রঙ্গলাল আধুনিক, মধুসূদনের সময়ে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ।এইভাবে ভাবলে বাংলা কবিতার ইতিহাসের প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ- বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কবিকে আধুনিক কবির শিরোপা দিতে হয়। আবার বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগকে মাথায় রেখে আধুনিক বাংলা কবিতার

সূচনা পর্বকে চিহ্নিত করতে চাইলে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের কবি অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এদের আধুনিক কবি না বলে আধুনিক যুগের কবি বলাই শ্রেয়। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

> "কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্ণয় করবে কে? ...নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে।সাহিত্য তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ণ।বাংলায় বলা যাক আধুনিক।এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়,মর্জ্জি নিয়ে।"[১]

যদিও একথা সত্য যে, আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মপাঁজি মিলিয়ে তিথি নক্ষত্র দেখে ঠিক করা হয়নি। কিন্তু তবুও বাংলা কবিতার অধিকাংশ সমালোচকই আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা পর্ব হিসেবে তিনের দশককেই চিহ্নিত করেছেন।আর এই সিদ্ধান্তের পিছনের কারণ হিসেবে দায়ী রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির ভাষায় কাব্যের 'মর্জ্জি'।প্রধানত তিনের দশক থেকে বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া কবিতার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যই কবিতাগুলিকে আধুনিক বাংলা কবিতার শিরোপা প্রদান করেছে।

একটি নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে রচিত সমস্ত বাংলা কবিতাই কি 'আধুনিক'? যদি তা না হয়,তাহলে ওই কালসীমার মধ্যে রচিত কবিতাগুলি থেকে আধুনিক বাংলা কবিতাকে বেছে নিতে হলে কী কী বিশিষ্টতার সন্ধান করব?এপ্রসঙ্গেও সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য স্পষ্ট। দীপ্তি ত্রিপাঠী তার *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বাদশ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন-

“ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার সাধারণ লক্ষণ এই :

১। নগর কেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।

২। বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।

৩। আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless)মনোভাব।

৪। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হ’তে সচেতন গ্রহণ।

৫। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব।অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।

৬। ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর,আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব।

৭। মার্ক্সীয় দর্শনের বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার ,প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮। মননধর্মিতা-অনেক সময়ে জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম,সুন্দর,কল্যাণ,ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।

১০। দেহজ কামনা,বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১। ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।”[২]

শুধু ভাবগত দিক থেকেই নয়, প্রকরণ এবং আঙ্গিকগত ক্ষেত্রেও তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বাদশ লক্ষণ বর্ণনা করেছেন-

“ ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী ও প্রকরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব'লে আধুনিক কাব্যের প্রকরণেও বহু পরিবর্তন দেখা দিল। এজন্য আধুনিক কাব্যের লক্ষণ আলোচনায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যও সমমর্যাদা দাবি করে। বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি এই:

১। বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ।গদ্যের ভাষা,প্রবাদ,চলতি শব্দ,গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

৩।প্রচলিত কবি প্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার।প্রচলিত কাব্যক শব্দ, যথা – ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

৪। প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫। শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬। এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি,আপাত-দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বদ্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক।

৭। নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বিশেষণ , অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৮। প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি।

৯। গদ্যছন্দের ব্যবহার।

১০। ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার।

১১।শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার।

১২। বিষয়বৈচিত্র্য।

বলা বাহুল্য , লক্ষণগুলি কোনো –একটি বিশেষ কবির মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তবে উল্লিখিত লক্ষণগুলির অধিকাংশ যে সব আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীই প্রধান ।”[৩]

এই দ্বাদ লক্ষণ আধুনিক বাংলা কবিতার স্বরূপ অনুধাবনের একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এই সবকটি লক্ষণই যেমন একসাথে কোনও একজন কবির কবিতার মধ্যে সন্ধান করার প্রচেষ্টা নেহাতই বাতুলতা, তেমনি এর মধ্যে অনেক লক্ষণই পূর্ববর্তী কবিদের কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলিকেই বাংলা আধুনিক কবিতার সামান্য লক্ষণ বলে স্বীকার করলে খুব একটা ভুল হয়না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অধ্যাপিকা ত্রিপাঠী এই লক্ষণগুলির অধিকাংশ যে যে কবির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন, তাঁরা সবাই তিনের দশকের কবি। সুতরাং এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনিও তিনের দশককেই আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা পর্ব হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছেন। আবার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখাতেও পরোক্ষভাবে এরই সমর্থন মেলে। তিনি লিখছেন-

“‘কল্লোল’ও সদ্য –কল্লোলোত্তর যুগ প্রত্যেক কবিকে স্বীয় স্বরগ্রামে উপনীত হতে উদবুদ্ধ করেছিল।কেননা, ‘if style is the man it is also the age.’ এই যুগ,নানায়তনিক যুদ্ধ যার একাধারে কবচ ও আয়ুধ, বিঁধেছিল এই কবিদেরও, একাধিক নতুন শর্তে।”[৪]

ঐ একই প্রবন্ধে তিনি আরও লিখছেন –

> " রবীন্দ্রনাথকে একই সঙ্গে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করে নিজস্ব মননমুদ্রা প্রতিষ্ঠা করবার দুরূহ চাহিদায় এই কবিরা চতুর্দিকে যাত্রা করেছেন এবং অবশেষে নিজেদের কাছেই ফিরে এসেছেন।"[৫]

উপরের উক্তিগুলি থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়-

এক) ভাবগতভাবে এর ওপর একাধারে পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শন তথা বিজ্ঞানের পাশাপাশি দেশ বিদেশের পুরাণ,দর্শন,মিথ এবং বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের হতাশার ও শূন্যতার অভিঘাত পড়েছে। এই অভিঘাতের প্রকৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। অর্থাৎ, এইসব ঘটনা এবং বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বাংলা আধুনিক কবিরা এইসব বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্যের কবিদের রচিত কবিতার সংস্পর্শে এসেও প্রভাবিত হচ্ছেন।

দুই) রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা।

আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি তুমুলভাবে দেখা যায় সেইসব কবিদের রচনায় যারা দুই এর দশক থেকে লিখতে শুরু করলেও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন তিনের দশকে এসে।তাই বলা যেতে পারে তিনের দশক থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার যাত্রা প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছিল। আবু সৈয়দ আইয়ুব লিখছেন-

> "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী,কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করছি।"[৬]

এই উক্তি প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন-

" মন্তব্যটি অতৃপ্তিজনকভাবে খণ্ডিত। এতে আধুনিকতার কোনো লক্ষণ নির্দেশিত নেই। 'রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' কবিতা তিরিশের দশক তো নয়ই,হয়তো কোনোদিনই বাংলা কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু তা কিছুটা 'মুক্ত' হয়েছে একেবারে ষাটের দশকের শেষে।"[৭]

সুমিতা চক্রবর্তীর এই মন্তব্য পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কোনোদিনের কথা বাদই দেওয়া যাক, এমনকি 'রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' কবিতা খুঁজতে গেলে ছয়ের দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, সেটাও ঠিক নয়। তিনের দশকের শেষ দিকে প্রকাশিত জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) গ্রন্থের অনেক কবিতাকেই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' বলা যেতে পারে।এই উক্তির পিছনে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখিকার গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ। যদিও এই নিয়ে আলোচনার জন্য এই স্থান উপযুক্ত নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উক্তির পরবর্তী অংশে আগের মন্তব্যের সঙ্গে কিছুটা স্ববিরোধী হয়েই তিনি আইয়ুবের উক্তির একটা সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এইভাবে-

"কিন্তু আবু সৈয়দ আইয়ুবের উক্তিধৃত 'রবীন্দ্র' শব্দটিকে আমরা যদি ব্যক্তি অর্থে না নিয়ে ভাবার্থে নিই-যদি অনুভব করি- 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দের অর্থ-ঐশীবোধে সমুজ্জ্বল, মানবমহত্বে আস্থাশীল, শুভ প্রত্যয়ী ও সুন্দরাভিমুখী এক অনন্ত সৃষ্টিশীলতা-তাহলে এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যটি তার প্রকৃত রূপ পেতে পারে হয়তো। উত্তরাধিকার-বাহিত এই প্রশ্নহীন প্রত্যয় থেকেই তো সরে আসতে চেষ্টা করেছে আধুনিক কবিতা-পৃথিবীর সর্বত্রই। দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে বিবর্ণ বাস্তবের সত্য অভিজ্ঞতার মাটিতে। মনন দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে অস্তিত্বের সংকট। সেই

চেষ্টা কমবেশি অক্লান্ত ছিল তিরিশের দশকের নব প্রতিষ্ঠা পাওয়া কবিদের রচনায়। এই অভিপ্রায় ও প্রয়াসের নিরিখেই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়টি চিনে নেওয়া যায়।"[৮]

সুতরাং 'রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের প্রতি অনাস্থা দেখালেও ভাবার্থে তিনি তাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব হিসেবে তিনিও তিনের দশককেই চিহ্নিত করছেন।

আরেকজন বিশিষ্ট গবেষক ও সমালোচক অধ্যাপক মঞ্জুভাস মিত্র আধুনিক বাংলা কবিতার কালসীমা নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন-

" প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ ১৯১৪ খৃঃ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উদ্ভবকাল বলে চিহ্নিত হতে পারে। বিংশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার মূলে আছে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত।"[৯]

এক্ষেত্রে অধ্যাপক মিত্র পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতোই আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর মহাযুদ্ধের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন এবং সেইসঙ্গে এর সূচনাপর্ব হিসেবে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই কালসীমা কিছুটা ব্যাপক- প্রায় তিনটি দশককে জুড়ে আছে। আরও সুনির্দিষ্ট সূচনাপর্বের সন্ধানও অবশ্য তার লেখায় পাওয়া যায়-

" ১৯৩০ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর *বন্দীর বন্দনা*, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, ১৯৩২ সালে প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র *উর্বশী ও*

আর্টেমিস, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *অর্কেস্ট্রা*, ১৯৩৮-এ প্রকাশিত অমিয় চক্রবর্তীর *খসড়া* : এই কাব্যগুলিকে কেন্দ্র করেই আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব বাংলা কাব্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরীতিকে তার আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রকট করে তোলে।আধুনিকতার মৌলিক লক্ষণগুলি প্রথম এইসব কাব্যেই তীব্রভাবে প্রতিফলিত হ'ল; বিশেষভাবে বুদ্ধদেব বসুর '*বন্দীর বন্দনা*' গ্রন্থটিকে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম উৎস ও উদাহরণ বলা যাবে।"[১০]

এইভাবে অধ্যাপক মিত্রও তিনের দশককেই আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা পর্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

২

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার কালসীমাকে মোটামুটি সূচিত করা গেছে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে আধুনিক বাংলা কবিতার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও মহাযুদ্ধের অভিঘাত এবং 'রবীন্দ্র-প্রভাব' মুক্তির প্রয়াস। এখন আধুনিক বাংলা কবিতার শুরুরও শুরুর দিকের কিছু বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা যাক।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে বাংলা ভাষার প্রধানতম কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাব্যে স্থান পাচ্ছে শাশ্বত সময়ের মানবাত্মার অনুভব, বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপকতার মধ্যে ঠাঁই পাওয়া ক্ষুদ্র মানবের বিস্ময়াভূত আনন্দবোধ, সুন্দরের জয়গান, পরম শক্তিমানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনার আকুলতাজনিত অধ্যাত্মচেতনা, প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি অপার আকর্ষণ প্রভৃতি চিরায়ত বিশ্বপ্রাণের অনুভবের কথা। ইতিমধ্যে বিশ্ব জুড়ে শুরু হচ্ছে মহাযুদ্ধ। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। মানুষে মানুষে বাড়ছে ঘৃণা, হানাহানি। এই অবস্থাতেও

মানুষের প্রতি আস্থা হারাননি কবি। অক্লান্ত ভাবে গেয়ে গেছেন জীবনের জয়গান। সুন্দরের উপাসনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তার। থামিয়ে দেননি পরম করুণাময়ের কাছে ক্রমাগত করে যাওয়া আত্মজিজ্ঞাসা। তিনি সুন্দরের প্রকৃত সাধক। পারিপার্শ্বিক ধ্বংসলীলার তাণ্ডব তাঁকে টলাতে পারেনি স্বীয় বিশ্বাসের সাধনা থেকে। কিন্তু তিনি একক। তাঁর আর্ষদৃষ্টি বাকীদের কাছে প্রত্যাশা করা নেহাতই বাতুলতা।কবির মানসভূমিতে সময়ের শ্বাশ্বত সৌন্দর্য অবিচল থাকলেও গোটা বিশ্ব তখন জ্বলছে। খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে ক্রমস্থানিকতা।

অপরদিকে কবির প্রজ্জ্বল প্রতিভার আলোয় তখন ফিকে হয়ে যাচ্ছে বাকীদের কবিযশঃপ্রার্থনা। এমতাবস্থায় কবিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে টিকে থাকতে চাইছেন কিছু মাঝারি মাপের কবিরা।কবিকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে একশ্রেণীর কবিদের বলয়। এরা পরিচিত রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে। দু একটি কবিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও সামগ্রিক ভাবে বাংলা কবিতায় এরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে যেতে পারেননি। এদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন-কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, প্রমুখ। আধুনিক বাংলা কবিতার কোনো বৈশিষ্ট্যই এদের কবিতায় দেখা যায় না।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির যুগ লক্ষণকে প্রকাশ করা এবং কবি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করা-এই দুটি কারণে তখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে একাজে কিছুটা হলেও সফল হতে লেগেছিল সেই তিনের দশক। কিন্তু তার আগে প্রধানত চারজন কবির কবিতায় প্রথম শোনা গেল কিছুটা ভিন্ন সুর। এরা হলেন- মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত , সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এবং কাজী নজরুল ইসলাম। এরা দাঁড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তিনের দশকের আধুনিক কবিদের মাঝখানে। অনেক সমালোচক এই তালিকায় আরও একটি নাম যোগ করতে চান-প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রথম চারজন কবিকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১১] দীপ্তি ত্রিপাঠী, সুমিতা চক্রবর্তীরা তাদের রচনায় এই মতকেই স্বীকার করে নিলেও ঐ তালিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সংযুক্ত করেছেন অধ্যাপিকা ত্রিপাঠী। তিনি লিখছেন-

> "এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র (জন্ম ১৯০৪, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' প্রকাশ ১৯৩২) বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক।কিন্তু তাঁকে আধুনিক কবি অপেক্ষা রবীন্দ্র-যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলাই শ্রেয়।"[১২]

তিনের দশকের আধুনিক কবিদের ওপর প্রথম চারজন কবি বিশেষত মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন-

> " আমাদের তরুণ বয়সে ,যখন রবিদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপটি আমরা পার হচ্ছিলাম, তখন যে দু-জন কবিতে আমরা তখনকার মতো গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, তাঁদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আর অন্যজন বিস্মরণীর মোহিতলাল" ।[১৩]

কিন্তু এই কবিরা কেউই সমালোচকদের কাছে আধুনিক কবির মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তারা বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিলগ্নের কবি হয়েই রয়ে গেলেন। কারণ নিজেদের কাব্যে নতুন সুর শোনাতে সক্ষম হলেও আধুনিক কবিতার যুগ বৈশিষ্ট্যকে তারা তাদের কাব্যে ধরতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন-

" এসব সত্ত্বেও এই চারজন কবি সম্পর্কে 'আধুনিক' বিশেষণটি ব্যাপক অর্থে যে গৃহীত হল না তার মূলেও নিহিত আছে এঁদেরই সমগ্র সৃষ্টির ধারাবাহিকতা। বৃহৎ অর্থে বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর মানসিকতা এঁরা সর্বাংশে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেননি। উনিশ শতকীয় ভারতের মানসিক আদর্শ-সমূহ অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি সচেতনভাবে। আধুনিক মানুষের সামাজিক সংকটবোধ,ব্যক্তিক নৈরাশ্যবোধ,নতুন ও পুরাতন মূল্যবোধের সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তা – এসব দিক প্রধান হয়ে ওঠেনি তাঁদের কবিতায়। বিশ্বাসের বাণী তাঁদের কবিতায় সংশয়ের স্বগতোক্তি হয়ে ওঠেনি। ইউরোপীয় কবিতায় তখন নানা দিক দিয়ে যে রীতিগত স্বাতন্ত্র্য প্রবল হয়ে উঠেছিল-ভাষায়,ছন্দে,চিত্রকল্প প্রয়োগে- তা-ও অনুসরণ করবার তেমন চেষ্টা করেননি তাঁরা। বিশেষত নতুন ছন্দ ও ছন্দঃস্পন্দ প্রায় বর্জনই করেছিলেন বলা যায়; সেজন্যই তাঁদের 'আধুনিক' বলতে দ্বিধা রইল আমাদের, আমরা তাদের বললাম 'স্বতন্ত্র'।"[১৪]

কল্লোলে কোলাহলে

বিশ শতকের দুইয়ের দশকে প্রকাশিত তিনটি সাহিত্য পত্রিকা প্রথম বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য পালাবদল ঘটালো। পত্রিকাগুলি হল-*কল্লোল* (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৬) এবং *প্রগতি* (১৯২৭)। এই পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলো বেশ কিছু তরুণ কবি ও লেখক যাদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের বিশেষত বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-পরবর্তী অধ্যায় শুরুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা হল। এই তিনটি পত্রিকার বাংলা কবিতায় প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে পরবর্তীকালে এই সময়কে তিনটির মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ *কল্লোল*

পত্রিকার নামে 'কল্লোল-যুগ' হিসেবেও অনেক সমালোচক অভিহিত করেছেন। *কল্লোল* ও *কালিকলম* কলকাতা থেকে এবং *প্রগতি* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। *কল্লোল* ভেঙেই জন্ম হয়েছিল *কালিকলম*-এর।পত্রিকা তিনটির সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে- দীনেশ রঞ্জন দাশ ও গোকুল চন্দ্র নাগ (*কল্লোল*), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (*কালিকলম*) এবং বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্ত (*প্রগতি*)। প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় এদের মধ্যে *কল্লোল* এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্বাধিক। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা এই পত্রিকাতে লিখে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলা আধুনিক কবিতায় আধুনিকতার পথপ্রদর্শক হিসেবে *কল্লোল* এর ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তবে *কল্লোল* কে পুরোপুরি আধুনিকতার পূজারি বললে অত্যুক্তি করা হবে। নতুন কবিদের পাশাপাশি এখানে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। আর *কালিকলম*-এ নতুন কবিদের চেয়ে প্রতিষ্ঠিতদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে অনেক বেশি। এপ্রসঙ্গে সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

> "তবে , 'কল্লোল'-এর জোরটা ছিল নতুন কবিদের প্রতি, 'কালিকলম' সেদিক থেকে অপরিচিত লেখকদের লেখা প্রকাশ করেনি বললেই চলে।"[১৫]

আধুনিকতার জয়গান গাইলেও *কল্লোল* আর *কালিকলম* এর যেটুকু পিছুটান ছিল, *প্রগতি* তে এসে তার মাত্রা অনেকটাই হ্রাস পেল।অজিত কুমার দত্ত ও বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় আগের দুই পত্রিকার চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় আধুনিকতার দ্যোতক হয়ে উঠল *প্রগতি* । এ প্রসঙ্গে সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

" ১৯২৩-এর 'কল্লোল' আর ১৯২৬ -এর 'কালিকলম'–এর কবিতাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু আধুনিক কবিতা থাকলেও কবিতার মূল ধারাটি ছিল পুরনো কবিতারীতির।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' (১৯২৭) সেদিক থেকে অনেক বেশি মাত্রায় আধুনিক।"[১৬]

অর্থাৎ বলা যায়, বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনয়নের ক্ষেত্রে *কল্লোল* ও *কালিকলম* – এর থেকে *প্রগতি* আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। তারপর একে একে এই তালিকায় যুক্ত হল- সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *পরিচয়* (১৯৩১), সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পূর্বাশা* (বৈশাখ, ১৩৩৯ বং) এবং অবশ্যই বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* (১৯৩৫)।

এইভাবে বলা যায়, বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রথম পর্যায়ের কবিদের উত্থানের পিছনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব ও প্রকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন নি, এমন সমালোচক বিরলের মধ্যে বিরলতম। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক বাংলা কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবেই সমালোচকরা বিদেশী প্রভাবের কথা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য-

"ত্রিশের দশকের কবিরা গূঢ়ার্থে সবাই ভারতীয় হলেও, আপাতত মাত্র ভারতীয় নন। তাঁরা সমগ্র আন্তর্জাতিক বিশ্বের কেন্দ্রে বর্তমান, অন্তত তাঁরা যে দেশীয়

দিগন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না একথা স্বীকার করতেই হবে। তারই বহিরঙ্গ প্রমাণ, এই কবিদের কবিতায় প্রসারিত ভূগোলের বিবরণে, আন্তর্জাতিক জগতের চিত্রমালায়। ... 'রূপসী বাংলা'য় যে জীবনানন্দ হেমন্ত প্রকৃতি, ধানসিঁড়ি নদী ও লক্ষ্মীপেঁচার সংসর্গে ছিলেন, তাঁকেও দাঙ্গাযুদ্ধবিধ্বস্ত মহাপৃথিবীর কথা বলতে হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক নানা জটিলতা তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় ছায়াপাত করেছে। "[১৭]

আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মের পশ্চাতে বিদেশী অনুপ্রেরণার উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক সমালোচকই জোরালো সওয়াল করেছেন। সেইসব যুক্তিকে অস্বীকার না করে এটুকু বলা যায় যে এইসব কবিদের রচনায় রোমান্টিসিজমকে অতিক্রম করার প্রয়াস ছিল এবং তার জন্য এরা মডার্নিজমের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন একথা যেমন সত্যি, তেমনই এর পাশাপাশি একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে রবীন্দ্রনাথ সহ এদের পূর্বসূরীদের কবিতায় রোমান্টিসিজমের অভিঘাতও সুস্পষ্ট। তাই মডার্নিজমের আশ্রয় নেবার জন্য আধুনিক কবিদের গায়ে যদি বিদেশি সৌরভের ঘ্রাণ লেগে থাকে, তাহলে সেই একই যুক্তি এদের পূর্বসূরীদের ক্ষেত্রেও খাটে। যদিও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই উক্তি করলে প্রাজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচকরা রবীন্দ্রকাব্যে উপনিষদ সহ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবেন। সেক্ষেত্রে বলতেই হয় যে সুবিশাল রবীন্দ্রকাব্যে দেশজ উপাদানের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার কোনো প্রকার সাধ বা সাধ্য এই অর্বাচীন সমালোচকের নেই। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে বিদেশি প্রভাব নিয়ে সমালোচকরা কলরব মুখর, সেই রকম বিদেশি প্রভাবের অস্তিত্ব এর আগের যুগের কবিতাতেও ছিল এবং সেই প্রভাব শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ সে যুগেও ছিল না

যেমন ছিল না আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে। বরং বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগের বাংলা কবিতায় (তা সে আধুনিক বাংলা কবিতাই হোক কিংবা রবীন্দ্রযুগের বা প্রাক্- রবীন্দ্র যুগের) বিদেশি অভিঘাত প্রথম থেকেই ছিল। তাই এই অভিঘাতকে শুধুমাত্র আধুনিক বাংলা কবিতার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলাটা নিছকই অতিশয়োক্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে একথা বলা যেতে পারে যে এই আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হবার যে প্রচেষ্টা করেছিল, তা আসলে রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। তার জন্য আধুনিক কবিদের সচেতনভাবেই ধরতে হয়েছিল মর্ডানিজমের হাত- ঠিক যেভাবে একদিন বিহারীলালরা রোমান্টিকদের হাত ধরেছিলেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে একে একটি প্যারাডাইম সিফ্‌ট বলা যেতে পারে।

এই প্যারাডাইম পরিবর্তনের পশ্চাতের কারণ হিসেবে সমালোচকরা যেগুলির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রধানতম কারণ দুটি-

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা
- পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার।

এর মধ্যে প্রথম কারণটির যথার্থতা সম্পর্কে আমাদের কোনও দ্বিমত নেই। নিঃসন্দেহে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুর মিছিল সমগ্র বিশ্ববাসীর মতো ভারতবাসীকেও যে শুধু চমকিত ও ব্যথিত করেছিল তা-ই নয়, এর পাশাপাশি টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে যে মানব সভ্যতার ধ্রুবীয়তা কি সত্যিই যাত্রা শুরু করেছে অন্তিম ক্ষণের দিকে। ব্রিটিশ উপনিবেশ হবার কারণে এই যুদ্ধে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনও জড়িয়ে গিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। আর বলাই বাহুল্য যে

সেই জড়ানোর প্রভাব মোটেই সুখকর ছিল না। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘ বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে’ –এই আপ্তবাক্যকে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না।ফলত, রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত সৌন্দর্য, আনন্দ ও শান্তির বক্তব্যকে সরিয়ে রেখে অন্য জগতের অনুসন্ধান করতে আধুনিক কবিরা বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু এই যুক্তিকে মেনে নেবার পরেও কিছু প্রশ্ন রয়ে যায়। যেমন-

তাহলে কি আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনালগ্নের কবিরা সবাই অত্যন্ত সমাজ সচেতন কবি ছিলেন? তিনের দশকের প্রধান প্রধান কবিরা সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এ অপবাদ অতি বড় নিন্দুকেও দেবে না। বরং সমসাময়িক গদ্যের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।আবার আধুনিক কবিদের ঠিক পূর্ববর্তী দুজন কবি অর্থাৎ নজরুল ও যতীন্দ্রনাথের কবিতাতে এই সমাজ ও সমকাল উঠে এসেছে। তিনের দশকের কবিদের মধ্যে একমাত্র চারের দশকের বিষ্ণু দে আর *মহাপৃথিবী- সাতটি তারার তিমির* পর্যায়ের জীবনানন্দের কবিতাতে এই ধারা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিতার মধ্যে আর্থ-সামাজিক চিত্র অনুসন্ধান করতে গেলে তিন পেরিয়ে চারের দশকেই পা রাখতে হবে। সুতরাং একথা বলতেই হয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার অভিঘাত তিনের দশকের কবিদের কবিতার বহিরঙ্গে যত না পরেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পড়েছিল কবিতার অন্তরঙ্গে।

দ্বিতীয় যুক্তির ক্ষেত্রে বলা যায় তিনের দশকের কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত এবং বিদেশি সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন, আর এদের মধ্যে

কয়েকজন পেশাগত দিক থেকেও ইওরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন- যেমন জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ফলে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে সমকালিন পাশ্চাত্যের সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচিত হবার সম্ভাবনা, সুযোগ ও অভিপ্রায় অনেক বেশি ছিল।তাছাড়া, তিনের দশকের কবিদের রচনায় এই বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো প্রত্যক্ষ অভিঘাত পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রতি তিনের দশকের কবিদের কী মনোভাব ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে যায় জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬-৪৭ কবিতার এই পঙ্ক্তিগুলি থেকে-

> "আমাদের এই শতকের
>
> বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভীড় শুধু- বেড়ে যায় শুধু;
>
> তবু কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
>
> জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।"[১৮]

বরং এক্ষেত্রে যেটা বলা যুক্তিসঙ্গত তা হল- তিনের দশকের কবিদের রচনায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শনের কোনো প্রত্যক্ষ অভিঘাত পড়েনি। এই অভিঘাত একান্তই পরোক্ষ। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই সময়ের বিজ্ঞান-দর্শনের যে অভিঘাত পড়েছিল, তারই প্রতিগ্রহণ ঘটেছে তিনের দশকের আধুনিক বাংলা কবিদের লেখায়।

তিনের দশকের কবিদের মধ্য থেকে পাঁচটি নামের উল্লেখ করতে হলে সেই তালিকায় অবধারিতভাবে যারা আসবেন তারা হলেন- জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,

অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং বিষ্ণু দে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও সমালোচিত নাম অবশ্যই জীবনানন্দ দাশ।

২.২ চারের দশকের কবি ও কবিতা

বাংলা কবিতার ইতিহাসে চারের দশকের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তিনের দশককে যদি আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে চারের দশককে সেই আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্ব বলে মনে করা যেতেই পারে। কারণ, ভাব এবং প্রকরণের দিক থেকে এই দশকের কবিতা তিনের দশক থেকে অনেকটাই আলাদা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী তার *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* গ্রন্থে বলেছেন-

> " কিন্তু সময় থেমে থাকে না কোনো বিন্দুতে। আধুনিকতার অপর একটা মাত্রাই হল গতিশীলতা। রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের কবিদের রচনার বৈচিত্র্যও চেনা হয়ে গেল আমাদের। তারপর একসময়ে আমরা দেখলাম সে-ধারা বদলে যাচ্ছে। নতুন সময়ের ছাপ পড়ছে কবিতায় ; পরিবর্তিত হচ্ছে তার আকার ও প্রকার। শুরু হবার পর বেশ দ্রুতই তা বদলে গেল, দেখা দিল আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়। "[১৯]

প্রকৃতপক্ষে তিনের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া জটিলতার সূচনা হয় যার চূড়ান্ত ফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। বলাই বাহুল্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী শুরু হওয়া এই মহাযুদ্ধের আঁচ অবধারিত ভাবেই এসে পড়েছিল ভারতবর্ষে বিশেষত কলকাতায়। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল বাংলার কুখ্যাত '৪৩ এর মন্বন্তর (১৯৪৩)। অন্যদিকে

১৯৪২ এর গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাকে গোটা দেশের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তখন উত্তাল। এর পাশাপাশি দেশে কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে তখন উঠে আসছে বামপন্থী রাজনীতির ধারা। ১৯৩৫ সালে গঠিত হচ্ছে প্রগতিশীল লেখক গোষ্ঠী (Progressive Writers' Association) আর চারের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এইসব কিছুর মধ্যে বাংলা ভাষায় উঠে আসছেন একঝাঁক রাজনৈতিক সচেতন কবি যারা বামপন্থায় বিশ্বাসী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম- অরুণ মিত্র (১৯০৯), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১), দিনেশ দাশ (১৯১৩), সমর সেন (১৯১৬), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী(১৯২৪), রাম বসু (১৯২৫), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬) প্রমুখ। তিনের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতা যদি হয় রবিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব পথ খুঁজে নেবার কাল, তাহলে চারের দশকের বাংলা কবিতাকে অনায়াসে বলা যায় সমকালের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক আদর্শকে লেখনীতে তুলে ধরার কাল। আর এটা ভুললে চলবে না যে তিনের দশকের কবিদের সময়ে ভারতবর্ষে বামপন্থা সেইভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি, আর ওই সময়ের কবিদের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি সমর্পণও ছিল না। কিন্তু চারের দশকের এক ঝাঁক তরুণ কবির, আগেই বলেছি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি তীব্র পক্ষপাত ছিল। তাই তাদের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনার কথা অনেক বেশি করে উঠে এল। তাদের রচনাশৈলীও তিনের দশকের কবিদের তুলনায় অনেক বেশি সহজবোধ্য হয়ে উঠল। কারণ সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে তাদের লেখাকে

পৌঁছে দেবার দায় তাদের ছিল- যেটা তিনের দশকের কবিদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন-

> " এই দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম পর্যায়ের চেয়ে বেশ কিছুটা আলাদা, এমনকি কোথাও কোথাও বিপরীত। কবিতা যেন দ্রুত ফিরে এল সহজ, সুবোধ্য ভাষার কাঠামোর মধ্যে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু অবশ্য চিরকালই সহজ ভাষায় কবিতা লিখেছেন। তবু, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কাব্যভাষার কারণে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষার সঙ্গে এক দুরূহতার অনুসঙ্গ দীর্ঘস্থায়ীভাবে জুড়ে গেছে তখন। জীবনানন্দের মতো- কবিতার শাব্দ অন্বয়ে রহস্য জড়িয়ে দেবার অভ্যাস থেকেও বিরত রইলেন এই দ্বিতীয় পর্বের কবিরা। পরিচিত শব্দ ও সহজ অন্বয়ের মধ্যে থেকেই নিয়ে আসতে চাইলেন ধ্বনির ঝঙ্কার, অনুভবের অনুরণন, নবীন চিত্রকল্পের দ্যুতি।
>
> দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা হয়ে উঠলেন গভীরভাবে সমাজ-মনস্ক ও রাজনীতি-সচেতন। সেই রাজনীতি বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকেও যেমন মনোলক্ষণ অর্জন করেছে তেমনই স্বদেশের রাজনৈতিক আলোড়ন ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও থেকেছে সমান আগ্রহী। এখন ভাবলে একটু বিস্ময়করই মনে হয় যে, প্রথম পর্যায়ের আধুনিক কবিরা বিশ্ব-রাজনীতির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কিন্তু স্বদেশের সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ সেভাবে তাঁদের কবিতাকে স্পর্শ করেনি।"[২০]

একথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে তিনের দশকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এরকম ঘটনার অভাব ছিল না, যার অভিঘাত সেই সময়ের বাংলা কবিতায় পড়তে পারতো। বরং এর ঠিক আগের দশকের নজরুলের অনেক কবিতাতেই সমসাময়িক রাজনীতির অভিঘাত সুস্পষ্ট। কিন্তু তিনের দশকের আধুনিক কবিরা তাদের দুই বা তিনের দশকের কবিতায় সচেতনভাবেই সমকালের দেশীয় রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ব্যতিক্রমের দু একটি উদাহরণ স্বয়ং জীবনানন্দ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* (১৯২৭) এ সরাসরি সমকালীন রাজনীতির কথা তেমনভাবে উঠে না এলেও একাধিক মণীষী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি। যেমন- বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আবার, 'নিখিল আমার ভাই' এর মতো কবিতা থেকে তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচয়ও মেলে। পরবর্তীকালে, *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের 'শকুন' কবিতার মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার সমালোচনা রয়েছে।যদিও সার্বিকভাবে *মহাপৃথিবী* পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই ধরণের লেখার সংখ্যা নেহাতই অপ্রতুল। কিন্তু চারের দশকের মহাযুদ্ধের ধ্বংস লীলা আর মন্বন্তরের হাহাকারকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি। তার পরিচয় মেলে *মহাপৃথিবী- সাতটি তারার তিমির-বেলা অবেলা কালবেলা*-র কবিতার মধ্যে। পূর্বেই এ বিষয়ে অলোচনা করা হয়েছে।যদিও চারের দশকের কবিদের মতো কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি দুর্বলতা তাঁর ছিল না। কিন্তু, সেটা তাঁর সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি।

চারের দশকের কবিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে অরুণ মিত্র বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রজ (জন্ম- ১৯০৯) আর সুকান্ত সবচেয়ে অনুজ (জন্ম-১৯২৬)। ছন্দোহীনতা অরুণ মিত্রের কবিতার অন্যতম প্রধান

প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য হলে প্রধান ভাবগত বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের কাহিনি বর্ণনা। রোম্যান্টিক তিনি কখনোই নন। আবার রোম্যান্টিকতাকে সচেতনভাবে বর্জন করার জন্য তিনের দশকের কবিদের মতো আশ্রয় নেননি ভাষা ও শব্দের আপাত জটিলতার। তার কবিতার ভাবগত বৈশিষ্ট্যের মতো তার কবিতার ভাষাও আটপৌরে কথ্য ভাষার কাছাকাছি। তিনের দশকের থেকেই মার্ক্সীয় রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন অরুণ মিত্র। এবং চারের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত সেই যোগাযোগ ছিল অটুট। সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন-

> " ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ –এর বাংলাদেশে অরুণ মিত্র সাম্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে ছিলেন- এই সত্যটি কিন্তু তাঁর কবি হয়ে ওঠার ইতিহাসে তাৎপর্যহীন নয় একেবারেই। মার্কসবাদী চিন্তা ও গঠনমূলক কার্যাবলী চল্লিশের দশকে যেসব কবি ও শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অরুণ মিত্র তাঁদেরই একজন।যদিও ভাবনা তখনও অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সংহত হয়নি ; যদিও তর্কবিতর্ক লেগেই ছিল রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-কে নিয়ে- তবু সমাজবোধ ও মানবতাবোধের বিশেষ সাম্যবাদী ধরন, সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিকর্মে রিক্ত মানুষ ও সমাজ-চৈতন্যময়তাকে প্রতিফলিত করবার একটি মূলস্পর্শী অভিপ্রায় অনেকেরই চেতনার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। "[২১]

প্রথম দিককার অরুণ মিত্রের কবিতায় সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা যতখানি প্রচারধর্মিতা পেয়েছিল, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *উৎসের দিকে* (১৯৫৪) থেকেই তা অনেক পরিণত ও সুসংহত রূপ নেয়। এর অর্থ এই নয় যে তার কবিতার বিষয় বদলে গিয়েছিল, সামাজিক বঞ্চনা

ও শোষণের বিরুদ্ধে একই রকম সচল ছিল তার কলম। শুধু কবিতার সোচ্চার উচ্চারণ বদলে গিয়েছিল মননশীলতার পরিমার্জনায়। ১৯৩৯ সালে যে কবি লিখেছিলেন'লাল ইস্তাহার' কিংবা 'কসাকের ডাক' -এর মতো প্রচারধর্মী কবিতা যা বামপন্থী সমাবেশে আবৃত্তি করার উপযুক্ত এবং তা করাও হতো, সেই কবিই তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে লিখছেন 'সঞ্জীবন' কিংবা 'মন্ত্রলোপ' –এর মতো অনুচ্চকণ্ঠ কিন্তু দৃঢ় কবিতা। সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন-

> " স্পষ্ট- উচ্চারিত জনসংগ্রামের কবিতা তিনি তখনও লিখেছেন কিন্তু দ্রুততাল ছন্দোময়তা আর নেই সেখানে ; বাগ্‌বিন্যাসের সাজসজ্জা যেটুকু ছিল তাও যেন আর চোখে পড়ে না। এ জাতীয় কবিতায় তাঁর নিজস্ব ধরন- ধীর, অনুচ্চকণ্ঠ কিন্তু মর্মস্পর্শীভাবে কঠিন, নির্দ্বিদ্ধভাবে অটল-এসে গেছে এখানেই। "[২২]

কবিতায় রাজনৈতিক আদর্শের কথা থাকা দোষের কিছু নয় কিন্তু সেই কবিতাকে আগে কবিতা হয়ে উঠতে হবে। চড়া সুরের প্রচারধর্মী কবিতার সঙ্গে স্লোগানের পার্থক্য খুবই কম। অরুণ মিত্রের এই চড়া সুরের সাধনা থেকে প্রগাঢ়তায় সরে আসার ঘটনা নেহাতই ব্যতিক্রমী নয়, চারের দশকের আরেক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।সুভাষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* (১৯৪০) আবির্ভাবেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল পাঠক মহলে। কিন্তু সেই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ছিল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারধর্মিতার তারসপ্তকের সুরে বাঁধা। তবে সুভাষের সঙ্গে অরুণের এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। প্রথমত, অরুণের মতো দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই সুভাষের কবিতা প্রচারধর্মিতার চড়া সুর থেকে সরে আসেনি। *পদাতিক-চিরকুট-অগ্নিকোণ* পেরিয়ে তার

জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে *কাল মধুমাস* (১৯৬৬) পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, সুরের চড়াভাব বদলে গিয়ে সমহিত হলেও অরুণ মিত্রের কবিতা সাম্যবাদী আদর্শ থেকে সরে যায়নি কিন্তু, সুভাষের কবিতা বামপন্থী রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে গিয়েছে দূরে। বরঞ্চ, সাতের দশকের *ছেলে গেছে বনে* (১৯৭২), *এই ভাই* (১৯৭১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতাতে তিনি বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত বামপন্থী রাজনীতিকেই সমালোচনার মুখোমুখি এনে ফেলেছেন। সাতের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি তার প্রত্যক্ষ সমর্থন না থাকলেও ওই আন্দোলনে নিহত অসংখ্য তরুণ শহীদের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ সমর্থন।

চারের দশকে বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সুভাষ যখন লিখছেন *পদাতিক, চিরকুট, অগ্নিকোণ*-এর কবিতাগুলি, তখন তরুণ কবির রাজনৈতিক চেতনা উত্তাল আবেগের বান এনেছে ছত্রে ছত্রে। কিন্তু, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত *কাল মধুমাস*-এ এসে সুভাষ শুধু যে অনেক গভীর ও দৃঢ় তাই নয়, বরং তার কবিতার বিষয়ও রাজনীতি থেকে ক্রমশ সরে গেল দূরে। প্রকৃতপক্ষে চারের দশকের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিবর্তনশীল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। চারের দশকের কবি হয়ে তিনি সাত, আট এমনকি নয়ের দশকে গিয়েও নিজেকে বারংবার বদলে ফেলেছেন।

চারের দশকের কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র ২১ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করা এই কবি নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থটির (ছাড়পত্র) প্রকাশও দেখে যেতে পারেননি। সাম্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শের প্রচারধর্মিতা ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তার কবিতারও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে অতি অল্প বয়সে প্রয়াত হবার কারণে তার কবিতার পরিণত রূপের আস্বাদ থেকে পাঠকরা বঞ্চিত হয়েছিল

একথা যেমন সত্যি তেমনই এর পাশাপাশি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে *পূর্বাভাষ* –এর কবিতাগুলিতে তার কবিতার এক বাঁক বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সোচ্চার প্রতিবাদের উচ্চকিত সুর সেখানে অনেকটাই পরিশীলিত ও সুসংহত – যা মনে করিয়ে দেয় অরুণ মিত্র ও সুভাষকে।

এছাড়া যাদের কথা না বললে চারের দশকের কবিদের নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তারা হলেন সমর সেন , নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এদের মধ্যে সমর সেনের কবিতায় উঠে এসেছে নাগরিক জীবনের জটিলতা ও শহুরে সাধারণ মানুষের কথা । চারের দশকের অধিকাংশ কবিদের মতো সমর সেনও বিশ্বাসী ছিলেন বামপন্থী রাজনীতিতে। যদিও তার কবিতায় রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতা কোনোদিনই চড়া সুরে বাজেনি। বরং তার প্রকরণ ছিল অনেক বেশি পরিশীলিত। হৃদয়াবেগের তুলনায় তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মননধর্মিতাকে। তাই তার কবিতায় যুগান্তকারী একটি দুটি জনপ্রিয় পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি না মিললেও তার পরিবর্তে পাওয়া যায় বোধের স্বরলিপি। সমর সেন তাই বিপ্লবের চারণ কবি নন- কিংবা বলা ভাল, কোনওদিনই তিনি চারণ কবি হতে চাননি। বরঞ্চ, তার বদলে হতে চেয়েছেন ঋত্বিক, যে বিপ্লবের সুমহান যজ্ঞে গানের সুরমূর্ছনার বদলে করবে দৃঢ় মন্ত্রোচ্চারণ। তাই তার কবিতা কম আবেগময়, বেশি মননধর্মী।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারের দশকের অধিকাংশ কবিদের মতোই সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী হলেও প্রথাগত রাজনৈতিক আদর্শের তত্ত্বে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন-

" বামপন্থী হওয়াটা ছিল ফ্যাশন। কিন্তু, সাধারণ কর্মীদের প্রতি নেতৃত্বের একটা উদাসীন ও উন্নাসিক মনোভঙ্গি ছিল। কোনো প্রশ্নের ঠিকমতো জবাব কেউ দিতেন না। কিছু বুঝিয়েও দিতেন না। আমার কোনো পলিটিক্যাল পড়াশুনো ছিল না।"[২৩]

যদিও বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কোনো অভাব ছিল না তার। কিশোর বয়সে যুক্ত হয়েছিলেন অনুশীলন দলের সঙ্গে, পরিণত বয়সে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল বা আর.এস.পি. এর সাথে। যদিও প্রথম ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী না হলেও আর এস পি র বন্ধুদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল আমৃত্যু। বইএর মৃত কাগজের পাতা থেকে নয়, তার রাজনৈতিক দর্শন তৈরি উঠে এসেছিল জীবন যাপন থেকে। তাই তার কবিতায় রাজনীতি বিশুষ্ক তত্ত্বের যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রাণের ছোঁয়া লাগা রক্তকরবী হয়ে। নিজের মতো করেই সাম্যবাদের মূলসূত্রকে অনুধাবন করে চেষ্টা করেছিলেন বলেই তার কবিতায় শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হওয়া প্রতিবাদের স্বরকে কখনোই আরোপিত বলে মনে হয়না। এবং আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে পীড়িতের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন তার কবিতায় ধরা পড়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অকৃত্রিমভাবে। আর সেই একই কারণে জন্মভূমি ও দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে তিনি কখনোই জোর করে আন্তর্জাতিক হতে চান নি। এমনকি ঈশ্বরও তার কবিতার বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়ে নি। কারণ চাপিয়ে দেওয়া কোনো তত্ত্বকে বয়ে বেড়ানোর দায় বীরেন্দ্রর ছিল না। কবিতার বচন ও বাচনে প্রথম দিকের সুভাষ কিংবা সুকান্তের মতো বাঁধভাঙা আবেগ তার কবিতায় ছিল না। তার বদলে ছিল মনন-ঋদ্ধ এক বিশ্বস্ত উচ্চারণ। যেমন-

“ আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।”[২৪]

কিংবা,

“ এ এক মন্ত্র রুটি দাও, রুটি দাও
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও।
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা-
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা।”[২৫]

ক্ষুধার মতো চরম সত্য পৃথিবীতে দুটি নাই। এই সত্যের কাছে ফিকে হয়ে যায় যাবতীয় তত্ত্ব, বিপ্লব, সমাজচেতনা, স্বদেশপ্রেম। এই সরল সত্যটিকে এত সহজভাবে বীরেন্দ্রর মতোন আর কে-ইবা কবিতায় তুলে আনতে পেরেছে।তাই চারের দশকের কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান সর্বদাই বিশিষ্ট।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চারের দশকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি। সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে প্রথম দিকে ‘অরণি’ পত্রিকায় ‘লেনিনের মৃত্যু’-র কিংবা ১৯৪৯ সালে ‘মহাচীনে’ –এর মতো রাজনৈতিক কবিতা লিখলেও সামগ্রিকভাবে নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় রাজনৈতিক আদর্শ কখনোই প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি। একদিকে তার কলম থেকে যেমন বেরিয়েছে ‘উলঙ্গ রাজা’ কিংবা ‘কলকাতার যীশু’ –এর মতো সামাজিক কবিতা, তেমনই আবার তার *নীলনির্জনে* (১৯৫৪), *অন্ধকার বারান্দা, নীরক্ত করবী*–এর মতো কাব্যগ্রন্থ ভরে আছে প্রচুর ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতায়। তাই কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য তার

কাব্যের অন্যতম বিশিষ্টতা। সাদামাটা ভাষায় সহজ সরল অনাড়ম্বর মূলত কথ্য ভঙ্গির রচনাশৈলী তার কবিতার বিশেষ সম্পদ যা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

এইভাবে বলা যেতে পারে যে, তিনের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্ব অতিক্রান্ত হয়ে নবরূপ ধারণ করে চারের দশকে এসে। তিনের দশকের কবিদের কবিতার প্রধান ভাব ছিল আত্মগত। বিদেশি সাহিত্যের গভীর প্রভাবও সেখানে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আর চারের দশকের কবিরা সেখানে সমাকালীন সমাজ ও রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের কবিতায়। চারের কবিদের কবিতার ভাষাও তিনের তুলনায় অনেক বেশি সহজ, সরল, সরাসরি। তিনের কবিদের মতো কবিতায় আপাত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ওঠেনি। বরং কিছু ক্ষেত্রে তাদের কবিতায় রাজনৈতিক আদর্শের অনুপ্রবেশ এতটাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে যে সেইসব কবিতার কাব্যগুণ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে চারের দশকের কবিরা তিনের দশকের কবিদের প্রভাব থেকে সরে এসে তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন স্বকীয়তা। কবিতায় আনতে পেরেছিলেন এক নতুন সুর। সেখানেই এই দশকের কবিতার সার্থকতা।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আধুনিক কাব্য’, ‘সাহিত্যের পথে’, *রবীন্দ্র রচনাবলী* , দ্বাদশ খন্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), ৪৬৩।

[২] দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩), ২

[৩] তদেব, ৩।

[৪] অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ‘আধুনিকতার সংজ্ঞা’, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (কলকাতাঃ ভারত বুক এজেন্সি, ২০০৩), ২০।

[৫] তদেব, ২১।

[৬] আবু সৈয়দ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ‘ভূমিকা’, *আধুনিক বাংলা* কবিতা (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ।।০।

[৭] সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* (কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫), ৪।

[৮] তদেব।

[৯] মঞ্জুভাস মিত্র, *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইওরোপীয় প্রভাব* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ২০১২), ৩১।

[১০] তদেব।

[১১] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথমপর্যায়* (কলকাতাঃ এ মুখার্জি ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), ২৬২।

[১২] দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩), ৪।

[১৩] বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল* (কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স ১৯৯৭), ১৫৮।

[১৪] সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* (কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫), ৩।

[১৫] সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৃত্তিবাস বাংলা কবিতার পালাবদল* (কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ২০১৪), ৫।

[১৬] তদেব।

[১৭] অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়* (কলকাতাঃঅরুণা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), ৯১।

[১৮] জীবনানন্দ দাশ, "১৯৪৬-৪৭", *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতাঃ) ভারবি ১৯৮৮ ,(১৩৫।

[১৯] সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* (কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫), ৫।

[২০] তদেব, ৫-৬।

[২১] তদেব, ৩১।

[২২] তদেব।

[২৩] সুমিতা চক্রবর্তী, *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়* (কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫), ১৯২।

[২৪] তদেব, ২০৬।

[২৫] তদেব, ২০৭।

৩. জীবনানন্দ দাশ ও পাঁচের দশকের কবি ও কবিতা

৩.১ জীবনানন্দ দাশের কাব্য পরিক্রমা

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ‘ পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ’। এই অংশে আমরা জীবনানন্দ দাশের কাব্যজগতের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো। আমরা ‘জীবনানন্দ’ বলতে কী কী বিষয়কে নির্দেশতন্ত্র হিসেবে স্থির করে নিচ্ছি তা এখানে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হবে। কারণ, জীবনানন্দের কবিতা ভাব ও প্রকরণের দিক থেকে বহু বিচিত্র। এই আলোচনার জন্য আমরা কেবলমাত্র জীবনানন্দের জীবদ্দশায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিকেই বেছে নিয়েছি। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিকে এ আলোচনার বাইরেই রাখা হবে। এবার জীবনানন্দের জীবদ্দশায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো যাক-

- *ঝরা পালক* (১৯২৭)
- *ধূসর পান্ডুলিপি* (১৯৩৬)
- *বনলতা সেন* (১৯৪২)
- *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪)
- *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)
- *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

প্রভাব সুস্পষ্ট। কখনো কখনো সেই প্রভাব এতটাই সর্বগ্রাসী যে একে তখন প্রভাব না বলে অনুকরণ বলাই শ্রেয় মনে হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলেই যে শুধু *ঝরা পালক* (১৯২৭) কে এই আলোচনায় খুব একটা গুরুত্ব থাকবে না, তা নয়, এর আরো দুটি কারণ রয়েছে-

প্রথমত, প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে কবির কাব্যবৈশিষ্ট্যের নির্মাণ অধিকাংশ সময়েই জায়মান পর্যায়ে থাকে। তাকে ভূমিষ্ঠ হবার আগের পর্যায় বলাটাই শ্রেয়। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। যেমন – সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *পদাতিক* (১৯৪০)। কিন্তু, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেই ব্যতিক্রমের তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। কারণ, *ঝরা পালক* এর কবিতাগুলোতে যত না জীবনানন্দ আছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি উপস্থিত প্রাক্-আধুনিক তিন কবি- মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়ের লেখাতে কবি তার কাব্যশৈলীকে নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন কিন্তু তা পুরোপুরি নির্মিত হয়নি। তিনি অনুসন্ধান করে চলেছেন নিজস্ব কাব্যভাষা, নিজস্ব কাব্যজগতের। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের যাত্রা তখনো শেষ হয়নি।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যেই কবি এই *ঝরা পালক* এর কাব্যশৈলীকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। বস্তুত, এর সামান্য কয়েকটি কবিতা যেমন- 'নীলিমা', 'পিরামিড', ' ডাকিয়া কহিলা মোরে রাজার দুলাল' প্রভৃতিকে বাদ দিলে, পরবর্তী সময়ের কবিতাগুলির মধ্যে *ঝরা পালক*–এর অন্যান্য কবিতার মূল ভাব কিংবা প্রকরণ- কোনোটাই সঞ্চালিত হয়নি। তাই *ঝরা পালক* –কে জীবনানন্দের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন পর্বের রচনা বলে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। কেউ কেউ দাবি তুলতে পারেন এই বলে যে *ঝরা পালক*–এ ব্যবহৃত 'দলবৃত্ত' ছন্দ আবার ফিরে এসেছে *বেলা অবেলা*

কালবেলা–র বেশ কিছু কবিতার মধ্যে। কিন্তু, সে প্রসঙ্গে বলা যায় দুটি গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতাতে দলবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে একথা সত্যি এবং জীবনানন্দ *ঝরা পালক* –এর পর সেই *বেলা অবেলা কালবেলা* তে এসেই আবার দলবৃত্তের ব্যবহার করেছেন বলে একে *ঝরা পালক* –এর কাব্যপ্রকরণের ফিরে আসা বলে মনে করাই যেত, যদি না উভয় কাব্যগ্রন্থের কবিতার দলবৃত্ত ছন্দের মধ্যে বেশ কিছু মূল চারিত্রিক পার্থক্য থাকতো।*ঝরা পালক* –এর কবিতাগুলোতে ব্যবহৃত দলবৃত্ত পুরোপুরি সত্যেন্দ্রনাথের দলবৃত্ত। হাল্কা শব্দ ব্যবহার করে, শ্বাসাঘাতের প্রাধান্যে তার চলন ঠমক ভরা দ্রুত লয়ের। কিন্তু, *বেলা অবেলা কালবেলা*–র কবিতাগুলোতে যে দলবৃত্তকে আমরা পাই সে একান্তভাবেই জীবনানন্দীয়। শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য সেখানে অনুপস্থিত, ধীর তার লয়। এ যেন দলবৃত্তের ছদ্মবেশে মিশ্রকলাবৃত্তেরই নবরূপ। তাই, *বেলা অবেলা কালবেলা*–র ছন্দ ব্যবহারকে *ঝরা পালক* –এর ছন্দের পাশে রাখাটা নেহাতই বাতুলতা। সুতরাং এইসব কারণে আমরা *ঝরা পালক* কে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করাকেই শ্রেয় মনে করছি।

এরপর আসা যাক, *ধূসর পান্ডুলিপি* (১৯৩৬) আর *বনলতা সেন* (১৯৪২)-এর প্রসঙ্গে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতি একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকৃতি প্রধানত গ্রামের প্রকৃতি। *বনলতা সেন* (১৯৪২) –এ এসে সেই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম।*ধূসর পান্ডুলিপি* –তে যে প্রেম ছিল না তা নয়, তবে, সেখানে প্রকৃতি চেতনা প্রেমকে ছাপিয়ে উঠেছে। প্রকৃতি আর প্রেমকে সংযুক্ত করেছে মৃত্যুচেতনা। আবার, *ধূসর পান্ডুলিপি* আর *বনলতা সেন* –এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে লেখা *রূপসী বাংলা* –র কবিতাগুলোতেও প্রকৃতি-প্রেম-মৃত্যু চেতনার মিশ্রণ ঘটেছে। তবে সেখানে প্রেমকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে প্রকৃতি আর মৃত্যু চেতনা। বস্তুত, *রূপসী বাংলা* –য় গ্রাম বাংলার

প্রকৃতি আর মৃত্যু ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এছাড়া, এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শুধু এই পর্যায়েরই নয়, জীবনানন্দের সমস্ত পর্যায়েরই বৈশিষ্ট্য। সেটি হল ইতিহাস চেতনা। প্রকৃতি, প্রেম, নারী এইসব কিছুকে কবি সুদূর অতীতের পটভূমিতে নিয়ে যেতে চান। এই ইতিহাস কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস। সেখানে এশিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলন- এইসব স্থান ফিরে ফিরে আসে।*রূপসী বাংলা* –র ক্ষেত্রে এই ইতিহাস আবার একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব ইতিহাস। সেখানে মঙ্গলকাব্যের চরিত্ররা যেমন – বেহুলা, লহনা, ধনপতি, শ্রীমন্ত ঘুরে ফিরে আসে। সময়ের ধারণা এখানে চক্রাকার।

ধূসর পাণ্ডুলিপি -র প্রকৃতির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। বাংলা কবিতায় 'প্রকৃতি' একটি বহু ব্যবহৃত বিষয়বস্তু বা থিম। আধুনিক কবিদের পূর্বে রোম্যান্টিক কবিরা এই প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন বিস্ময়ের নবজাগরণের উপাদান। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বর্ষা আর বসন্ত দুই প্রিয় ঋতু। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে শাশ্বত নির্মল আনন্দ খুঁজে পেয়েছে তাঁর কবিমন। জীবনানন্দ কিন্তু সেই পথে হাঁটলেন না। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ যতটা না রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় উপস্থিত আছে বিষাদ। তাঁর প্রকৃতি প্রখর আলোর চেয়ে অনেক বেশি করে ধরা দেয় অন্ধকারে। ঋতুর মধ্যে তাঁর ঝোঁক বেশি ছিল হেমন্তের দিকে। এই হেমন্ত ঋতুটির অস্তিত্ব একান্তভাবেই ভারতীয় জলহাওয়াতেই বর্তমান। আরও নির্দিষ্ট করে বললে এই বাংলাতেই তার অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। শরৎ আর শীত- এই দুই ঋতুর মাঝখানে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।*ধূসর পাণ্ডুলিপি –বনলতা সেন* পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রকৃতি অনেক বেশি হেমন্তের আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া রয়েছে শীত। এই শীত সবকিছুকে রিক্ত করে দেবার কাল। ধান

কাটার পরে খেতে শুকনো খড় পড়ে থাকার কাল। হেমন্ত সম্পর্কে কবির আচরণ দুইরকম।*ধূসর পাণ্ডুলিপি* তে তিনি লিখছেন- " হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন"[১]- অর্থাৎ, হেমন্ত এখানে শূন্যতা, বিচ্ছেদের কাল। আবার, *বনলতা সেন* –এ এসে আমরা পাচ্ছি- " অঘ্রান এসেছে আজ আমাদের দুজনের মনে।"[২] অর্থাৎ, হেমন্ত এখানে বিচ্ছেদের নয়, মিলনের ঋতু। যদিও, সমগ্র *বনলতা সেন* জুড়েও আবার হেমন্তকে মিলনের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করেননি কবি। *বনলতা সেন* –এ অন্য কবিতায় রয়েছে –

" হেমন্ত আসিয়া গেছে;-চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে-শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে।"[৩]

অর্থাৎ, এখানে হেমন্ত আবার বিচ্ছেদের কাল, শূন্যতার সময়, যৌবন ফুরিয়ে যাবার ঋতু। যদিও এই কবিই আবার লিখবেন- " হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে।"[৪] সুতরাং, কবির কাছে হেমন্ত একই সঙ্গে মিলন ও বিরহ, প্রেম ও বিচ্ছেদ –এই পরস্পর বিরোধী ভাব বহন করে এনেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়ে কবি প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন, তার মধ্যে রোম্যান্টিকদের মতো বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে আত্মের সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা যে একেবারে নেই, তা নয়, কিন্তু, পার্থক্য এইখানেই যে এখানে আত্ম-যোগের পাশাপাশি একটা গোটা ঐতিহ্য, গোটা ইতিহাস, সমগ্র মানবাত্মার অবিচ্ছিন্ন সময় সরণীর সংযোগ সাধনেরও প্রচেষ্টা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* –র 'বোধ' কবিতাটিকেই ধরা যাক। এই কবিতায় যে আত্ম-অন্বেষণের কথা কবি বলেছেন, প্রশ্ন জাগে, একি শুধুই সংযোগহীন একক-আমির সংযোগ সাধনের জন্য আকুতি, নাকি তা

ওই সময়েরই সংযোগহীনতার বিভ্রান্তি। কবি এখানে একটা ‘বিমূঢ় সময়ের’ মধ্যে প্রোথিত। দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক ডামাডোলের মধ্যে পড়ে সৃষ্টি হওয়া এই বিভ্রান্তি বোধহয় সমগ্র শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির বিভ্রান্তি, হতাশাবোধ। একে কোনও এক ব্যক্তি জীবনানন্দের আত্মকথন ভেবেই থেমে গেলে ভুল হবে। এ প্রসঙ্গে হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

> “ এক ব্যাভিচারী প্রহরে যখন মানব হৃদয়ও শসা কিংবা চালকুমড়োর মতো বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে গেছে, অথবা সঠিক ক্রেতার অভাবে তা হয়ে উঠেছে নষ্ট, পচা জঞ্জাল- সেই কালবেলায়, কবি স্বয়ং নৈরাশ্যের নৈমিষারণ্যে অজ্ঞাতবাসকেই সময়োচিত মনে করেছেন।”[৫]

ঐ একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি লিখছেন-

> “ আপাতশ্রুতিতে মনে হতে পারে, কবির গভীর এই একাকিত্ববোধ বুঝি কোনো ব্যক্তিগত বিলাস, বুদ্ধিজীবীসুলভ উন্নাসিকতা। কিন্তু তা নয়। এই কবিতায় দেখা গেছে, শ্রমের সহজাত মূল্যকে, জীবনধারণের সহজ চাহিদাকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি। এমনকি চেষ্টা করেছেন তার অংশীদার হতে ।”[৬]

সুতরাং বলাই যায় যে, ‘বোধ’ কবিতার কবি একটা নির্দিষ্ট সময়ের হতাশাবোধে ক্লান্ত একটা বিশেষ শ্রেণির একাকিত্বের কথাই তুলে আনতে চেয়েছেন। সে কথা শুধুমাত্র সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনাবিলাস নয়। দীপ্তি ত্রিপাঠীর কথাগুলি এ ক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য-

“ বলতে কি, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ-যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।”[৭]

এরপর আসা যাক *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) -র কথায়। শুধু কালের দিক থেকেই নয়, ভাবগত দিক থেকেও *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) দাঁড়িয়ে আছে *বনলতা সেন* (১৯৪২) আর *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮) –এর মাঝখানে। *বনলতা সেন* –এর গ্রামীণ প্রকৃতি আর প্রেমের কবিকে *সাতটি তারার তিমির*–এ এসে আমরা পাবো নাগরিক কবি হিসেবে। চারের দশকের যুদ্ধধ্বস্ত কলকাতার নাগরিক জীবনের হতাশা ও অন্ধকারকে জ্ঞানবৃদ্ধ সপ্তর্ষিরাও যেন দূর করতে অপারগ এখানে। সময়ের নৈরাশ্যবোধ এখানে কলকাতাকে মিলিয়ে দিয়েছে সমসাময়িক পৃথিবীর শূন্যতার সঙ্গে। বস্তুত, *সাতটি তারার তিমির*–এ এসে ধূসর পাণ্ডুলিপি-*বনলতা সেন* - এর জীবনানন্দ যেন বদলে গিয়েছেন অনেকটাই। আর এই বদল শুরু হয়ে গেছিল *মহাপৃথিবী* থেকেই। এই বদল তাঁর কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত বুদ্ধদেব বসুরও খুব একটা অভিপ্রেত ছিল না।

প্রকৃতি-প্রেম এইসব থেকে সরে গিয়ে জীবনানন্দের কাব্যজগত যে ক্রমশ সরে যাচ্ছে নাগরিক জীবনের জটিলতার দিকে, তার কিছুটা ইঙ্গিত মেলে *বনলতা সেন* –এর শেষ কবিতা ‘পথ হাঁটা’-র মধ্যে। পরবর্তীকালের ‘রাত্রি’ (*সাতটি তারার তিমির)* কিংবা ‘ফুটপাথে’ (*মহাপৃথিবী*) কবিতার মতো এখানেও দেখা মেলে রাতের কলকাতায় পথ হাঁটা এক কবির-

“ একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত- তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা

নির্জনে ঘিরেছে এসে ; - মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব ”[৮]

মহাপৃথিবী–র কবিতাগুলির মধ্যে সামান্য দু একটি (যেমন- ‘নিরালোক’, ‘ফিরে এসো’) বাদ দিলে বেশিরভাগই বনলতা সেন- এর প্রকৃতি-প্রেমের ভাবজগত থেকে সরে গেছে। তার বদলে এসেছে অস্তিত্ব, সমাজ, শহুরে জীবনের জলছবির গল্প। এখানে ‘আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো’[৯] ট্রাম লাইনের কথা যেমন রয়েছে, তেমনই তার পাশাপাশি ‘ এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব / ভাসিতেছে চিরদিন’।[১০] এখানে শীতের মানে ‘সার্কাসের ব্যাথিত সিংহ’।[১১] ‘কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ’য়ে’[১২] এখানে ভেসে গেছে। এই কাব্যগ্রন্থের কবি বলে ওঠেন-

“ডাইনির মাংসের মতন

আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন ;

বাদুড়ের খাদ্যের মতন

একদিন হ’য়ে যাবে ;

যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়- তারে ছিঁড়ে খাবে’।”[১৩]

এখানে ‘পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ’[১৪] কেবলই ‘স্থূল হাতে ব্যবহৃত –ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হ’য়ে’ পরিণত হয় ‘শুয়ারের মাংস’[১৫]-এ। এই কাব্যগ্রন্থেই আমরা পরিচিত হই এক ‘বিপন্ন বিস্ময়’[১৬]–এর সঙ্গে, যা ‘অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়’[১৭]। এই বিস্ময় “আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে/ ‘আমাদের ক্লান্ত করে”[১৮]। সেই ক্লান্তি

থেকে মুক্ত হতে আশ্রয় নিতে হয় লাশকাটা ঘরে। এইভাবে *মহাপৃথিবী*-র কবিতাগুলি সন্ধান দেয় এক নতুন কাব্যজগতের।

সাতটি তারার তিমির-এ এসে এই কাব্যজগত হয়ে ওঠে আরও অনেক বেশি নাগরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সেই কারণেই জটিলতর। একদা 'প্রকৃতির কবি' আখ্যা পাওয়া জীবনানন্দ *সাতটি তারার তিমির*-এ এসে লিখছেন-

" হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;

অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে ।

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে ।

একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে "[১৯]

রাতের মহানগরের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন *সাতটি তারার তিমির*-এর অন্ধকারেই ফুটে উঠেছে। 'লঘু মুহূর্ত' এই রকমই আরেকটি কবিতা যেখানে রাতের শহরে ভিখিরিদের জীবন যাপনের ছবি আঁকা হয়েছে। সেখানে 'তিনজন আইবুড়ো ভিখিরীর'[২০] সঙ্গে জুটেছে এক ভিখারিনী। তার রূপে নেই কোনো 'পাখির নীড়ের' আশ্রয়।বরং সেই রূপ খুব বাস্তবিকভাবেই অ্যান্টি-রোম্যান্টিক-

" একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে

অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে

নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নীকে।

এ মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।”[২১]

কিন্তু ওই তিন ভিখিরীর মেয়েটির সেই ‘কুরূপ’ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই-

“ দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক’রে দিলো তাকে আরেক গেলাস:

‘ আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস ?”[২২]

রাতের কলকাতার এই ছবি দেখে শঙ্খ ঘোষের পঙ্‌ক্তি ধার করে আমাদের বলতে ইচ্ছা করে-

“ এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা

হেঁটে দেখতে শিখুন। ”[২৩]

সমালোচকরা এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকেই জীবনানন্দের সবচেয়ে জটিল ও সমাজ সচেতন পর্যায়ের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শীতল চৌধুরী লিখছেন-

“কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য “সাতটি তারার তিমির” কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে একটি বিশেষ মূল্যবান কথা বলেছেনঃ “মোটের ওপর “সাতটি তারার তিমির”-এ কবি জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর মানব-সমাজে এসে মিশেছেন।” এই মেশাটার পেছনে কবির মনোলোকে জড়িয়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়চেতনা[২৪]

প্রকৃতপক্ষে, *সাতটি তারার তিমির* এ চারের দশকের বাংলার নির্মম দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংসলীলা প্রভৃতির অভিঘাত ফুটে উঠেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। চারের দশকের বাংলা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সমাজ-রাজনীতিকে অস্বীকার করার

তেমন কোনও উপায়ও সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ের ছিল না। জীবনানন্দের কবিতাতেও তাই বারংবার ফুটে উঠেছে এই ঘটনাবহুল ও অস্থির সময়ের চালচিত্র। ' যে আঁধার আলোর অধিক'- বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থের এই শিরোনাম যেন *সাতটি তারার তিমির* এর নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সময়ের স্রোতের অখন্ডতাকে স্বীকার করে নিয়ে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির কালের যাত্রাপথ নির্মিত হয়েছে। লেখা হয়েছে 'ঘোড়া', 'আকাশলীনা', সমারূঢ়' এর মতো কবিতা। *সাতটি তারার তিমির* -ই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। এরপর, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে, যদিও তার মধ্যে কিছু কবিতা বাদ দিলে বাকি সবই পূর্ব প্রকাশিত। তাই একে সংকলন বলাই শ্রেয়। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *রূপসী বাংলা, (১৯৫৭), বেলা, অবেলা কালবেলা* (১৯৬১), *সুদর্শনা (১৯৭৪), মনবিহঙ্গম (১৯৭৯), আলোপৃথিবী* (১৯৮১), প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে *রূপসী বাংলা, (১৯৫৭)* ও *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১) এই দুটি গ্রন্থের পান্ডুলিপি কবি নিজে প্রস্তুত করে রেখেই গেছিলেন আর *বেলা অবেলা কালবেলা* নামটিও কবিকৃত। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন-

> " এর মধ্যে *বেলা অবেলা কালবেলা* –র নামও কবিপ্রদত্ত ; আর *রূপসী বাংলা* র নামকরণ সম্ভবত প্রকাশকের- প্রতিক্ষণ প্রকাশিত *রূপসী বাংলা* (১৯৮৪) সংস্করণে নাম পাওয়া যাচ্ছে 'গাঙুরে'।[২৫]

জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জীবিতাবস্থায় যাকে প্রবল আর্থিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, কবিযশও তেমনভাবে জোটেনি, মৃত্যুর ষাট বছরের পরেও তার একের পর এক অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন গ্রন্থাকারে

প্রকাশিত হয়ে চলেছে- এই ঘটনা সত্যিই আশ্চর্যজনক এবং একই সঙ্গে তা জীবনানন্দের অনুরাগীদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার উদ্রেগ ঘটায়।

৩.২ পাঁচের দশকের কবি ও কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি পাঁচের দশকে পা রাখার আগে আধুনিক বাংলা কবিতা যে দুই দশক অর্থাৎ তিন ও চারের দশক পেরিয়ে এসেছে, সেই দুই দশকের কবিতার মধ্যে একটা প্রধান চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। তিনের দশকের কবিদের কাছে যেখানে কবিতার মূল ভাবটি অনেক বেশি আত্মগত ছিল, চারের দশকে এসে সেই ভরকেন্দ্র সরে গিয়েছিল সমাজ ও রাজনীতির দিকে। এই সরে যাওয়া যে শুধু চারের দশকের কবিদের কবিতাতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল তা নয়, তিনের দশকের যেসব কবিরা চারেতে এসেও লিখছেন, তাদের অনেকের কবিতাতেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন- জীবনানন্দ দাশ। তিনের দশকে *ধূসর পান্ডুলিপি-* তে প্রকৃতি আর প্রেম নিয়ে ব্যস্ত থাকা এই কবির কলম থেকেই চারের দশকে বেরিয়েছিল *মহাপৃথিবী* কিংবা *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের চূড়ান্ত সমাজ মনস্ক ও রাজনৈতিক কবিতাগুলি। চারের দশকে এসে জীবনানন্দের মতো এক সময়ের প্রবল আত্মগত কবিও মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেন নি সমসাময়িক সমাজ থেকে। আসলে চারের দশকের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, উত্তাল সমাজ, তেতাল্লিশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সব মিলিয়ে যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, কোনও সংবেদনশীল কবি সাহিতিকের পক্ষেই তাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না।

পাঁচের দশকে এসে সেই ভরকেন্দ্র আবার গেল সরে। চারের রাজনৈতিক কবিরা তখনো লিখছেন এবং লিখছেন তাদের মতো করেই। বুদ্ধদেব কিংবা জীবনানন্দের মতো তিনের দশকের অনেক কবিই তখনো সৃষ্টিশীল। কিন্তু, পাঁচের দশকে যেসব কবিরা নতুন করে কলম ধরলেন, তাদের কবিতা একদিকে যেমন চারের দশকের কবিদের মতো রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হওয়া থেকে বিরত থাকল, তেমনই আবার তিনের দশকের কবিদের মতো এদের কবিতায় আপাত দুর্বোধ্যতার অভিযোগও উঠল না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র* –এর ভূমিকাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন-

> " রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বাংলা কবিতায় একবার পদাবলী আর পল্লীগাথার সুরে ভক্তি আর করুণার ঢল নেমেছিল। এরপর ভারতচন্দ্রকে সমান্তরালে রেখে বাংলা কবিতার মোড় ফেরালেন একদল কৃত্যবিদ্য কবি। পাশ ছাড়া তাঁদের যুক্তিবুদ্ধির ঘেরাটোপে মাথা গলানো শক্ত ছিল।
>
> এই গোটা পর্বে স্বধর্মে নিত্যপ্রবহমান একটি ধারা লোকের চোখে পড়লেও, তার মৃদু কণ্ঠস্বর তেমন করে লোকের কানে পৌঁছোয়নি। হট্টগোল থেমে গেলে জীবনানন্দের কবিতার কলকল্লোলে বাংলার আকাশবাতাস ভরে গেল।
>
> বাংলা কবিতাকে তার স্বখাতে ফিরিয়ে আনলেন জীবনানন্দ। শক্তি তাঁর উত্তরসাধক।"[২৬]

তিনের দশকের কবিকুলের রচনার আপাত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে সুভাষ জীবনানন্দকে বাদ দিলেও তিনের দশকের অধিকাংশ সমালোচকই তা দেননি। তবে শক্তিকে জীবনানন্দের উত্তরসাধক বলে অভিহিত করে সুভাষ উভয় কবির মধ্যে যে

যোগসূত্রটি রচনা করতে চেয়েছেন, তা শুধু এই দুই কবির সৃজনীর মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক নয়, প্রকৃতপক্ষে তা পাঁচের দশকের কবিকুলের ওপর জীবনানন্দের অভিঘাত। এই বিষয়ে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই উপ-অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য পাঁচের দশকের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

আগেই বলা হয়েছে চারের দশকের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল। পাঁচের দশকে সেই আবহাওয়া চাইছিল কিছুটা থিতু হতে। বিশাল ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন চায় নিবিড় বিশ্রাম, তেমনই এই দশকে এসে আধুনিক বাংলা কবিতার মূল বিষয়বস্তুও যেন কিছুটা শান্ততার পক্ষপাতী। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিছু বছর আগেই (১৯৪৭)। স্বাধীন দেশের দেশীয় নেতৃত্বে ধীরে ধীরে নবরূপে গঠিত হচ্ছে সবকিছু। এরই মাঝে তীব্র কাঁটার মতো সংগোপনে বিঁধে আছে দেশভাগের যন্ত্রণা। তবু, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর সেই আগুনে নেই চল্লিশের দিনগুলির মতো। এই রকম একটা পটভূমিতে কবিতা লিখতে শুরু করছেন যারা, তাদের কবিতায় আবার শাশ্বত সময়ের চিরন্তন কথাগুলিই উঠে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই দশকের কবিদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। প্রেম, প্রকৃতি এইসব চিরায়ত বিষয়গুলিই তাদের কবিতার মূল ভাব হয়ে উঠেছে বারেবারে। চারের দশকের মতো, রাজনৈতিক দর্শনের অভিঘাত তাদের কবিতায় পড়েছে খুবই স্বল্প। তিনের দশকে যেমন নতুন কবিদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল *কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা* প্রভৃতি পত্রিকার হাত ধরে, এখানেও তেমনই নবীন লেখনীর দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল *শতভিষা* (১৯৫১), *কৃত্তিবাস* (১৯৫৩) প্রভৃতি পত্রিকা। তার সঙ্গে অবশ্য *কবিতা*-র মতো পুরোনো পত্রিকাও সঙ্গী হয়েছিল এইসব তরুণ কবিদের। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম অবশ্যই *কৃত্তিবাস*। পাঁচের

দশকের প্রধানতম কবিরা, যেমন- আলোক সরকার(১৯৩১) , শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১), শঙ্খ ঘোষ(১৯৩২) , শক্তি চট্টোপাধ্যায়(১৯৩৩) , অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪) ,তারাপদ রায়(১৯৩৬) , উৎপল কুমার বসু(১৯৩৭) , প্রমুখ উঠে এসেছিলেন মূলত এই *কৃত্তিবাস*-এরই হাত ধরে। এবার পাঁচের দশকের কয়েকজন কবিদের বিষয়ে আলোকপাত করা যাক-

অরবিন্দ গুহ(১৯২৮)- পাঁচের দশকের অন্যতম শক্তিমান কবি অরবিন্দ। তিনি মূলত রোম্যান্টিক কবি এবং প্রেমের কবিতাতেই তাঁর কবি প্রতিভার আলো সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের উজ্জ্বলতর প্রতিভার ভিড়ে অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও কৃত্তিবাসের যুগে কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন এক জনপ্রিয় নাম। *কৃত্তিবাস* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। প্রেম অরবিন্দর কবিতার মূল এবং প্রধানতম ভাব। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে অপূর্ব বিষাদ মাখানো বিরহের প্রতিধ্বনি। ছন্দের ক্ষেত্রেও অরবিন্দর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।প্রধানত কলাবৃত্ত ছন্দে লিখলেও দলবৃত্তেও তিনি নিজের কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আলোক সরকার (১৯৩১)- পাঁচের দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি *শতভিষা* (১৯৫১) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক আলোক সরকার। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উতল নির্জন* প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫০ সালে। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* গ্রন্থে দেবীপ্রসাদের কলমে আলোক সরকারের এই কাব্যগ্রন্থটিকে কালের দিক থেকে পাঁচের দশকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে অভিহিত করা

হয়েছে। তাঁর পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল-*সূর্যাবর্ত, আলোকিত সমন্বয়, অন্ধকার উৎসব, বিশুদ্ধ অরণ্য, স্তব্ধলোক, মেঘনিবেশ* প্রভৃতি। আলোক সরকার নিবিড়ভাবে প্রকৃতি আর প্রেমের কবি। তাঁর কাব্যজগতের মধ্যে একটা শান্ত নীরবতা রয়েছে। কোনো ব্যস্ততা নেই, নেই কোনও অযাচিত অপ্রয়োজনীয় নাটকীয় মুহূর্ত। সম্পূর্ণ অন্য এক ছবির মতো রোম্যান্টিক জগত যা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর খুব কাছের হয়েও যেন বহুদূরের-

"জানবে না কোনোদিন বিকেলের মায়াবী আলোয়
রাজার কুমার হ'য়ে আমি পথ হাঁটি। কত কাচে
পেয়েছি চিন্ময় সুর, মনে-মনে ছড়ানো ভালোয়
গিয়েছি আলোর দেশে- সোনার গাছের হীরা-ফুল
এমন সহজ আসে নিভৃত চাওয়ায়।"[২৭]

কিংবা-

"নিভৃত ধ্যানের তাপে প্রকাশিত- প্রস্ফুটিত বিশুদ্ধ কমল
অরণ্যের প্রতিটি গাছের শিরা মূর্ত আবির্ভাব।
ভালোবাসা, কোথায় একাকী বসো কোন ছাদে ঘনিষ্ঠ সজল
বৃষ্টির থেমে-যাওয়া আলো। চৈত্রের দুপুর"[২৮]

অথবা-

"মূক পাতাগুলো তামসী নিথর হাওয়া
উড়িয়ে আনলো।

তখন ভোরের বেলা।

ভোরবেলাকার আকাশ বাগান, প্রস্তুত আসা-যাওয়া

হলুদ পাখির, কালো ভ্রমরের।

স্পর্ধিত আলো জাগ্রত অবহেলা।"[২৯]

শব্দ চয়নের দিক থেকেও আলোক সরকার শুধু প্রাঞ্জলই নন তার সাথে পেলবও। কোনো কঠিন পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের ঝোঁকও দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সেইভাবে তাঁর কবিতায় দেখা যায় না। তাই খুব সহজেই তাঁর কবিতা মনকে ছুঁয়ে যায় ।

কবিতা সিংহ (১৯৩১)- বাংলা কবিতার ইতিহাসে একজন ব্যতিক্রমী কবির নাম কবিতা সিংহ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যার বিচারে নেহাতই অপ্রতুল হলেও তাঁর লেখা কবিতা গুণ এবং সংখ্যাগত মানে নেহাতই অপ্রতুল নয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকাতে তাই তিনি লিখছেন-

"যাঁরা কবিতার খবর রাখেন, তাঁরা জানেন বাংলার ছোট বড় জানা অজানা পত্র-পত্রিকায় গত চার দশক ধরে অজস্র কবিতা লিখেছি। সে সব কবিতা যদি দু মলাটের মাঝখানে স্থায়িত্ব পেত, হয়ত আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অতি প্রসবের দোষগ্রস্ত হত। আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তাই তিনটি। প্রকাশকাল ১৯৬৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৫ 'সহজসুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী' এবং 'হরিণাবৈরী'। এই গ্রন্থ তিনটি অজস্র রচনার সাক্ষ্য নয়, অজস্র বিসর্জনের প্রমাণস্বরূপ মাত্র।"[৩০]

পাঁচের দশক-পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে নারীবাদী ধারার যাত্রা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তার ভগীরথ ছিলেন কবিতা সিংহ। তাঁর কবিতার মধ্যে সমাজ সচেতনার সাথে শৈল্পিক

সহাবস্থান দেখা যায়। এই ব্যাপারে শঙ্খ ঘোষের সাথে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল হয়েও প্রকটভাবে প্রচারধর্মী হয় নি। এখানেই কবি হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়(১৯৩১)- কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিদের কথা বললেই যে কয়েকজন কবির নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর সেই কবিতার পঙ্‌ক্তি- " রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক"[৩১] এখন প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শরৎ কুমারের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য আবেগের আতিশয্য বর্জন করে নির্লিপ্ত কথনভঙ্গিমায় সোজা কথা সোজা ভাবে বলে যাওয়া। এই নির্লিপ্ততা ও স্পষ্টভাষণ তাঁর কবিতায় কিছু অতি পরিচিত বিষয়বস্তু যেমন- প্রেম, যৌনতা, বিরহ প্রভৃতিকে করে তুলেছে অন্যন্যসাধারণ। কবিতায় যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। আর তাই পাঁচের দশকের প্রচুর নামীদামি কবিদের ভিড়েও হারিয়ে যান নি তিনি। যৌনতা শরৎ কুমারের কবিতার একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু। যৌনতার ব্যাপারে কবিতায় কথা বলার সময় তিনি সর্বদাই সোজাসাপটা এবং অকুতোভয়। তথাকথিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোনও বিধিনিষেধ তাঁকে কবিতায় হিপোক্রিট করে রাখতে পারে নি। তাঁর 'খুকী সিরিজ' এর কবিতাগুলি বাংলা কবিতায় যৌনতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই সিরিজের কবিতাগুলিতে যৌনতার যে রূপ ফুটে উঠেছে, তাকে সমাজ বিকৃত যৌন বাসনা বলে অভিহিত করতে পারে কিন্তু, একথা অনস্বীকার্য যে তাতে কবিতাগুলির কাব্যগুণ কোনো মাত্রায় বিনষ্ট হয় নি। বরং জয় গোস্বামীর কবিতার পঙ্‌ক্তির অংশবিশেষ ধার করে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শরৎ কুমার অন্তত পাঠকের কাছে 'যৌন ভাবে সৎ' থাকতে চেয়েছেন।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)- পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে সুসংহত ও পরিমিত কবির নাম শঙ্খ ঘোষ। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের রচনা থেকে অনায়াসে তাঁর কবিতাকে আলাদা করা যায়। কিভাবে আবেগের আতিশয্যে ভেসে না গিয়ে 'অনুভূতিদেশ থেকে উঠে' আসা আলোকে ঘনীভূত করে অতি স্বল্প শব্দের মিতব্যয়িতায় তাকে প্রকাশ করা যায় কবিতায়, সেই কৌশলের মুকুরবিম্ব চোখে পড়ে এই কবির লেখায়। একদিকে এই পরিমিতিবোধ আর অন্যদিকে ছন্দ ব্যবহারের অমিত পটুত্ব তাঁর কবিতাতে যোগ করেছে এক অনন্যসাধারণ মাত্রা। কবিতার বিষয়বস্তুর নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্যময়। যদিও *কৃত্তিবাস* এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'দিনগুলি রাতগুলি' –র মূল ভাব প্রেম, তবু সমসাময়িক অধিকাংশ কবির মতো শুধু প্রেম আর প্রকৃতির গল্পেই থেমে থাকেনি তাঁর কলম। তিনি প্রবল ভাবেই নাগরিক কবি। আধুনিক শহুরে জীবনের জটিলতার কাহিনি তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে বারংবার। তিনিই পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতে শিখিয়েছেন- "এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা "[৩২]। সমসাময়িক সমাজ জীবনের অনেক কৃষ্ণকায় দিকও উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। চারের দশকের কবিদের মতো কোনও বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও তাঁর কবিতায় বার বার ধরা পড়েছে সমাজের নীচের তলার মানুষদের কথা। তাঁর কবিতার বাচনভঙ্গি অত্যন্ত তির্যক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব মেল বন্ধন। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

" এ কোন্ দেশ ?

মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে

শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার

ক্ষীণকায় শিবিরের বজ্র-আলিঙ্গনে হুতাশী জনসঙ্ঘের গুরুসংখ্যা-

মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে

আমার রাত্রি আমার দিন তার কটাক্ষে বিপন্ন দয়িত

এ কোন্ দেশ ?”[৩৩]

অথবা-

“ হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়

হায় তোকে ভাত দেব   কি দিয়ে যে ভাত দেব হায়”[৩৪]

কিংবা-

“বেচিস না মা বেচিস না

বেচিস না আমায়

ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়

তুই আমাকে খা”[৩৫]

চারের দশকের কবিদের থেকে কোনো অংশেই কম সামাজিক নয় শঙ্খের এই পঙ্ক্তিগুলির বক্তব্য। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন স্লোগান ধর্মিতাকে সরিয়ে রেখেও কবিতায় লেখা যায় সবহারাদের কথা। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায় রুখে-কাব্যগুণের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপোষ না করেও। আবার এর পাশাপাশি প্রেমের কবিতাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। যেমন-

“ আমি যদি পথে পথে একমুঠো বাঁচবার মতো প্রাণ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হই

তখন তোমার চোখ একা একা আকাশের মতো ম্লান কেঁপে
মেঘে মেঘে বুক ভরে তপস্যার মতো।"[৩৬]

অথবা-

" কত বলি, কত ভালবেসে মৃদু স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ
তাকে কোরো না কোরো না। সে তবু শোনে না। বারংবার ঘুরে ঘুরে একই
বৃত্তে অন্তহীন সে পেয়েছে শুধু একখানি
অবসন্ন দীন ছায়ামাখা ভারি কৃপণ আকাশ
সেই তার ভালো।"[৩৭]

কিংবা-

" সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না ?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।"[৩৮]

শঙ্খ ঘোষের কবিতার মূল সুরকে তাঁর নিজের কথাতে বলা যায়-

" সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।"[৩৯]

সহজ কথাকে সহজ করে বলার কাজ খুব একটা সহজ নয় আর এই কঠিন কাজটাই সারা জীবন কবিতার মধ্যে করে চলেছেন কবি। পুরাণ বা ইতিহাসের অনুসঙ্গের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় নেহাতই কম নেই। কিন্তু তার মধ্যে অনুপস্থিত সেই অনুসঙ্গের সাহায্যে

বক্তব্যকে আপাত জটিল করে তোলার প্রচেষ্টা। বরং রয়েছে তার মাধ্যমে বক্তব্যকে অনেক বেশি সহজ সরল করে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করার বাসনা। *বাবরের প্রার্থনা* -র মতো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের সমনামের কবিতাটির কথা এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য। গোটা কবিতার মধ্যে কোথাও কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখ মাত্র না করে শুধু শিরোনামের সাহায্যেই তিনি সমকালের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন এক ঐতিহাসিক মিথের। শুধু তাই নয় সমগ্র কবিতার মধ্যে বাবরের যে করুণ আকুতি ফুটে উঠেছে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তার মধ্যে দিয়ে যেন সাতের দশকের রাজনৈতিক হত্যালীলায় জর্জরিত এবং ধ্বংস হতে থাকা বাংলার যৌবনকে বাঁচানোর জন্য এক পিতার প্রার্থনার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে। তাই কবিতাটি সেই সময় প্রবল ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। এভাবেই কবি শুধুমাত্র আত্মমগ্ন না থেকে বারে বারেই চোখ ফিরিয়েছেন সমকালের দিকে। আর তাই তাঁর কবিতার পাঁজরে সামাজিক অবক্ষয়, অপ্রাপ্তি আর শোষণের বিরুদ্ধে বারে বারেই বেজে উঠেছে দাঁড়ের শব্দ। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

আনন্দ বাগচী (১৯৩২)- আনন্দ বাগচী পাঁচের দশকের শুরুর দিকেই কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন।বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো তাঁর কবিতা। *কৃত্তিবাস* পত্রিকার কবিরা তখনো পাঠক বা সমালোচক মহলে সেইভাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তাই *কৃত্তিবাস* এর সূচনালগ্নে পরিচিতি লাভের আশায় ‘বিখ্যাত কবি’ আনন্দ বাগচীকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক মজুমদারের সঙ্গে সম্পাদকের আসন অলংকৃত করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কারণ সুনীল তখনো সুবিখ্যাত ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’ হন নি।এতটাই ছিল পাঁচের গোড়ায় আনন্দ বাগচীর কবিখ্যাতি। যদিও, বলাই বাহুল্য যে, পরবর্তীকালে সেই খ্যাতির গ্রাফ ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে। *কৃত্তিবাস* গোষ্ঠীর একঝাঁক

তরুণ কবিদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জোয়ারের স্রোতে আর নিজের পূর্ববর্তী জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে পারেন নি তিনি। যদিও তিনিও *কৃত্তিবাস* গোষ্ঠীরই একজন কবি ছিলেন। আনন্দ বাগচী প্রধানত প্রেমের কবি। উপস্থাপনা এবং ছন্দের কারুকার্যের দক্ষতায় মাঝে মাঝেই চমকপ্রদ সব পঙ্‌ক্তি রচনা করলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতায় সেইভাবে স্বতস্ফূর্ততা ছিল না। তবে প্রকাশভঙ্গিমার স্মার্টনেসে অনেক সময়েই তিনি অতি সাধারণ কোনো পঙ্‌ক্তিকে করে তুলেছেন অসাধারণ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩)- শুধু পাঁচের দশকেরই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথের কথায় যদি 'ছন্দের যাদুকর' বলা যায়, তাহলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে অনায়াসে শব্দের যাদুকর বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কবিতায় শব্দকে যেন নিজের কলমের সুতোয় ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন তিনি। তাই অনায়াসে তিনি বলতে পারেন-

"তুমি যেখানেই থাকো, জানি এই ব্যর্থ রচনার
শব্দের দ্যোতনা পাবে..."[৪০]

কিংবা-

"শব্দ গুলিসুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্থ-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে-
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই-মুখর"[৪১]

তাঁর কবিত্বশক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে অতি সাধারণ সম্ভাবনাময় পঙ্‌ক্তিকেও তিনি করে তুলেছেন অসাধারণ। সাধু চলিত শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগে গুরুচন্ডালী তাঁর কবিতায় দোষ হিসেবে দেখা দেয় নি, বরং তা সুসক্ষমরূপে ধারণ করতে সাহায্য করেছে কবিতার ভাবকে। সুগম করেছে কবিতার প্রবহমানতার পথ। যেমন-

"প্রিয়তম
যৌথ ও নির্মম
সমাজ গিয়েছে চলে দূর
যোগাযোগ ধীরে ধীরে হতেছে মধুর
জানালার আর্চ হতে বাদুড়ের হাতে
এ-রাত্রি ভরেছে অকস্মাতে
যৌথ ও নির্মম
প্রিয়তম"[৪২]

কিংবা-

"যে হৃদয় থেকে তুমি জেগেছিলে সে হৃদয়ে আর
যাবার উপায় নাই, সে হৃদয়ে কোলাহল নাই ;
সকল বিছানা হতে কোমলতা নিয়েছে কুকুর-
কোনদিন ঘুম নাই, আশা নাই, তরিবৎ নাই।"[৪৩]

শুধু শব্দ চয়নেই নয়, ছন্দের ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত- এই তিন প্রকার ছন্দেই তাঁর কুশলতার সাক্ষ্য বহন করছে অজস্র কবিতা।

মূল বিষয়বস্তু প্রেম হলেও তাঁর কবিতায় অভাব ছিল না অন্য বিষয়েরও। তবে প্রধানত শক্তি প্রেমের কবি। তাঁর কবিতায় প্রেম বিভিন্ন রূপে ধরা পড়েছে অপূর্ব লেখনীতে-

" প্রেমের মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে
নীল সমুদ্রে সারাটি দিন কিংবা ধবল সাত পাহাড়ে-
প্রেমের মড়া জলে ভাসে না, তাই বলে কি ডুবতে পারে"[৪৪]

প্রচলিত একটি গানের পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে শক্তি প্রেমের এক ভিন্নতর রূপ এখানে প্রকাশ করেছেন। আবার-

"মেঘলাদিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে...
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললামঃ খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।"[৪৫]

এক্ষেত্রে প্রেমের রূপ আদ্যন্ত রোম্যান্টিক। আবার কখনো তিনি এঁকে ফেলেন ভালোবাসার এক অদ্ভুত উপমার চালচিত্র-

" মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মতো ছিলো উঁচু
কামারপুকুরে গিয়ে একদিন মনীষাকে খুব আদর যতন প্রেম করা হলো।
বলা হলো, অঘ্রানে বিবাহ করো তমুকের সাথে, সুখী হবে।"[৪৬]

একদিকে যেমন গীতিমাধুর্য তাঁর কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে চূড়ান্ত আধুনিক শৈলী ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়। তিনি লিখেছেন যেমন প্রচুর, হারিয়েছেন বোধহয় তার

থেকেও বেশি। তারাপদ রায়ের মতো তিনিও প্রথম থেকেই কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া প্রথমে তিনি কবিতা নয়, গদ্য লিখতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম কবিতা 'যম'। প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* পত্রিকায়। তারাপদ রায়ের মতোই *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় শক্তির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় সপ্তম সংখ্যায় অর্থাৎ বৈশাখ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। কবিতার নাম 'সুবর্ণরেখার জন্ম'। তার আগে অবশ্য শক্তি *কৃত্তিবাস* এর ষষ্ঠ সংখ্যায় স্ফুলিংগ সমাদ্দার ছদ্মনামে লিখেছেন একটি গ্রন্থ সমালোচনা। গ্রন্থটির নাম *বর্গী এল দেশে*। কবি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। *কৃত্তিবাস* –এ প্রকাশিত শক্তির প্রথম কবিতাটি গদ্যে রচিত হলেও পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার পাঠককে তিনি ভুলিয়েছেন তার কবিতার অপূর্ব ছন্দোমেদুরতায়। নিজের ছন্দোদক্ষতাকে জাহির করার জন্য নয়, কবিতায় ছন্দকে তিনি যেমন খুশি ব্যবহার করেছেন কবিতার ভাবকে আরো বেশি করে সুপ্রকাশিত করার জন্য। দলবৃত্ত ছন্দে কালজয়ী সব প্রেমের কবিতা লিখে শক্তি যেন ছড়ার আর গানের ছন্দের নাম থেকে দলবৃত্তকে মুক্তি দিলেন। কলাবৃত্ত ছন্দেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম প্রধান শক্তি তাঁর আবেগ। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আবেগের আতিশয্যে ভেসে গিয়েও কবিতার কাব্যগুণকে ধরে রাখা সম্ভব। বাঁধন ছেঁড়া আবেগের বন্যার মধ্যেও তিনি কবিতার মধ্যে কবির নিয়ন্ত্রণ হারান নি। তাই তার কলম থেকে বেরিয়েছে কালজয়ী সব কবিতা, যেগুলি জীবনানন্দ – পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩)- পাঁচের দশকের অধিকাংশ কবিদের মতোই প্রেমকেই কবিতার মূল ভাব স্থির করে নিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন এই কবি-অধ্যাপক। কিন্তু, সমসাময়িক হাজার প্রেমের কবিতার ভিড়েও স্বতন্ত্রভাবে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতার

স্বর। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো শব্দ নিয়ে যা খুশি তাই করার প্রচেষ্টা ছিল না তাঁর। বরং এর উলটো পথে হেঁটে অনেক মাপজোপ করে শব্দকুলের অসংখ্য সদস্যের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে সুস্থাপন করেছেন উপযুক্ত শব্দকে। তাঁর কবিতার সঙ্গে অবধারিত ভাবেই তাই আবেগের সাথে মিশে গেছে যৌক্তিক বোধের স্বরলিপি। মন আর মননের এমন সুচারু মেলবন্ধন শঙ্খ ঘোষ ছাড়া পাঁচের দশকের অন্য কারুর কবিতায় তেমন ভাবে মেলে না। কিছুটা কাছাকাছি থাকবেন প্রণবেন্দু। যদিও শঙ্খ ঘোষের কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম একথা কখনোই বলা যায় না। বরং অলোকরঞ্জন আর প্রণবেন্দুর কবিতার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এই দুই কবির কবিতা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় লিরিক্যাল ভাব প্রণবেন্দুর কবিতায় তুলনামূলকভাবে বেশি। অলোকরঞ্জন সে তুলনায় অনেক বেশি ক্লাসিক্যাল। মেধার প্রয়োগ যেন তাঁর কবিতায় একটু বেশি। এবং শব্দ চয়নের দিক থেকেও তিনি যেন একটু বেশিই খুঁতখুঁতে। তাই তাঁর কবিতার প্রেমে পড়ার পাঠকের চেয়ে দূর থেকে তাঁর কবিতাকে নমস্কার করার লোকের সংখ্যাই যেন অধিক। বুদ্ধিবৃত্তি যেন মাঝেমাঝে ছাপিয়ে গেছে হৃদয়বৃত্তিকে। তাই তাঁর কবিতার পাঠককে হতে হয় একাধারে কাব্যরসিক এবং প্রাজ্ঞ। তাঁর শব্দচয়নকে অনুধাবন করতে গেলে নিবিড়ভাবে ডুব দিতে হয় প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গে। আর সেই অনুসঙ্গের তাৎপর্যকে অনুধাবন করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রজ্ঞার। এ প্রসঙ্গে তিনের দশকের বিষ্ণু দে'র কবিতা স্মর্তব্য। বিষ্ণু দে'র কবিতার ক্ষেত্রেও পাঠককে অনুসঙ্গের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়তো গ্রীক এবং ভারতীয় পুরাণ সম্পর্কিত প্রজ্ঞার। যদিও বিষ্ণু দে'র তুলনায় অলোকরঞ্জন অনেক কম মিথ বা পুরাণ-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কবিতায়।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে। নাম *যৌবন বাউল*। এতে কবিতা সংখ্যা ১০৮। যেকোনো কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে আয়তনের দিক থেকে এটি ব্যতিক্রমীভাবে স্ফীতকায়। পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের মতো এই কাব্যগ্রন্থেরও অধিকাংশ কবিতার মূল ভাব প্রেম। যদিও প্রেম ছাড়াও অন্য বিষয়ের ওপর কবিতাও নেহাতই কম নেই। কিন্তু শব্দচয়ন এবং বলার ভঙ্গিমায় খুব সহজেই বেশ কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি পাঠকের হৃদয়ে পেয়ে যায় স্বতন্ত্র স্থান। এক্ষেত্রে দু-একটি উদাহরণ তাৎপর্যপূর্ণ-

> “ এখানে ওদের কয়েকদিনের ডেরা,
> কুচক্রী মনে মধুচক্রের আশা,
> একটু শুনবে ঝর্ণাতলায় জলকপোতের ভাষা-
> তারপর ফের শহরে ফিরবে এরা ; ”[৪৭]

কিংবা-

> “ আমি হই অনুধ্যানী অশ্বত্থের মত মগ্নব্রতী
> আমার নীলিমা হও, ডালে-ডালে ঝরাও প্রণতি। ”[৪৮]

অথবা-

> “ সে কান্না তবু গান হয়ে ওঠে ; গোধূলির সংলাপে
> একলা খুশির পালক ছড়িয়ে কোপাইয়ের জল কাঁপে,
> পাখি হয়ে যেন উড়ে যাবে সে-ও, আকাশকে ঘিরে-ঘিরে

চামর দোলাবে, চারণ শোনাবে সূর্যের মন্দিরে।। ”[৪৯]

অথবা-

“ আহা এ কেমন ফুল নির্বেদের বিবর্ণ পরাগে,
ফুলের ভিতরে নদী জাগে,
তটের পঞ্জরে যার সুগন্ধের জোয়ারী সেতার
ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে অববাহিকার পূর্বরাগে। ”[৫০]

“ উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবীঃ
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি ”[৫১]

বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন হলেও উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় কবির প্রকৃতির ওপর বিশেষ পক্ষপাতের কথা। তাঁর প্রেম শহরের ইঁট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিতে চায় সবুজ প্রকৃতির কোলে। তাই রূপকল্প, উপমা, চিত্রকল্প সবখানেই প্রকৃতির ঘটেছে অনুপ্রবেশ। শহরের মেকি সভ্যতার বাইরে এসে তিনি নিশ্চিন্ত নিরাপদ শান্তি খোঁজেন। তাই তাঁর কবিতা প্রবলভাবেই প্রেম ও প্রকৃতির আলিঙ্গনে বাঁধা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪)- পাঁচের দশকের তথা কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর প্রধান দুই কবির একজন হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় জন অবশ্যই শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিদের নিয়ে সেই সময়ে যে সমস্ত বোহেমিয়ানিজমের গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরতো, সেই গল্পগুলির প্রধানতম চরিত্র ছিল এই দুজন। শুধু কবি হিসেবেই নয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনচর্চাও ছিল সেই সময়ে কলকাতার সাংস্কৃতিক আড্ডার

প্রধান বিষয়বস্তু। কবিতাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন সুনীল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একা এবং কয়েকজন* প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে। পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে- *আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি* (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), *বন্দী জেগে আছো* (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), *আমার স্বপ্ন* (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), *সত্যবদ্ধ অভিমান* (১৩৮০ বঙ্গাব্দ), প্রভৃতি।*কৃত্তিবাস* এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'নীলিরাগ'। ভাব প্রকরণ এবং শব্দ চয়নে তার মধ্যে তিনের দশকের কবিদের বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া ভাষার মধ্যে সাহিত্যিক কৃত্রিমতার গন্ধ তখনো পুরোপুরি যায় নি তাঁর লেখা থেকে। কিন্তু, ক্রমশ সুনীলের কবিতার ভাষা হয়ে উঠল কথ্যভাষার কাছাকাছি। শব্দ চয়নে এল সহজ সরল আটপৌরে ঘ্রাণ। তিনের দশকের মধুর কোমল প্রেমিকের খোলস গেল খসে। বেরিয়ে এল এক রাগী যুবক যে চারের দশকের কবিদের মতো কোনও রাজনৈতিক আদর্শের সংলাপ বলে যায় না, বরং সে যেন সমকালের অতি পরিচিত পাশের বাড়ির ছেলে, যে প্রেমও করে কিন্তু সেই প্রেমে রোম্যান্টিক কোমলতা কম, বাস্তবের রুক্ষ কঠোরতা, স্পষ্টতার ভাগ অনেক বেশি। আর তাই সে কবি অকুতোভয়ে লিখতে পারে এই রকম পঙ্‌ক্তি-

> "উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে
> গর্ভবতী হলো, তার মোমের আলোর মতো দেহ
> কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
> সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে
> যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
> এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।"[৫২]

কিংবা অনায়াসে তিনি আঁকতে পারেন সমকালীন প্রেমের কঠোর বাস্তব প্রেমের চিত্র-

"ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কী-যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মূদ্রা করতলে গুণে গুণে দেখলো সস্নেহে
এ-মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো
অলিন্দের আলো।"[৫৩]

সুনীল উদ্দাম প্রেমিক। তাঁর যৌবন স্পর্ধিত। অনায়াসে তিনি তাই লিখতে পারেন-

" আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দুচোখে তবু ভীরুতার হিম।"[৫৪]

কিংবা প্রেমের ব্যাপারে কখনো কখনো তিনি উদ্দাম শরীরী-

"আমার নিঃশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে-
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জজ্ঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরো দিন পর

অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর

তুমি হও নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, ঠান্ডা, দেবদূতী

কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।”[৫৫]

সুনীলের কবিতায় প্রেমের কথা বলতে গেলে অবধারিত ভাবে যে নারীর নাম বলতে হবে, সে নীরা। ‘নারী’- এই শব্দের স্বরবর্ণগুলির পারস্পরিক স্থান বিনিময়ে সৃষ্ট এই নাম নীরা সুনীলের মানস-সুন্দরী। নীরা, কলকাতা আর কবির প্রেম বহু কবিতায় হয়ে গেছে একাকার। যেমন-

“এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই,শুধু তুমি, নীরা

এ-কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের

থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে একমুহূর্ত ভাববে

কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে-তখন আমার

এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাস রেফ্

ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার

আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও

বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি”[৫৬]

কিংবা-

“নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে

সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়

নীরা আজ ভালো আছে ?

গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য- ওরা জানে

নীরা আজ ভালো আছে !

অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়

নীরার খবর”[৫৭]

অথবা-

“নীরার চোখের জল চোখের অনেক

নীচে

টল্‌মল্

নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে

বুক, বাহু, আঙুলে

ছড়ায়

শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা

আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত

আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক”[৫৮]

সুনীল তাঁর কবিতায় কোনো গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলতে চাননি কখন। তাঁর কবিতার বক্তব্যের পুরোটাই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা। তাই পাঠক সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারে তাঁর কবিতার সাথে। আর সেই কারণেই পাঁচের দশকের অন্যতম জনপ্রিয় কবির নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিনয় মজুমদার (১৯৩৪)- পাঁচের দশকের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন বিনয় মজুমদার। যদিও তাঁকে পাঁচের দশকের শেষ দিকের কবি বলাই শ্রেয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫৮ সালে। আর তার আগে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখালেখির কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় না। প্রথম বই সেইভাবে পাঠক মহলে সাড়া না ফেললেও চিত্রটা বদলে গেল ১৯৬১ সালে, যখন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *গায়ত্রীকে* প্রকাশিত হল। মূলত ডায়রির ফর্মে লেখা এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে ব্যর্থ প্রেম, বিরহের মতো অতি পরিচিত বিষয়বস্তু এক অচেনা রূপ পরিগ্রহণ করে চমৎকৃত করল পাঠক ও সমালোচক মহলকে।পরবর্তীকালে গ্রন্থটির বেশ কয়েকবার নাম পরিবর্তন করেন কবি স্বয়ং। এই কাব্যগ্রন্থেরই একটি নাম হয়েছিল *আমার ঈশ্বরীকে*। শেষমেশ গ্রন্থটির নাম রয়ে যায় *ফিরে এসো, চাকা*। বিনয়ের পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম- *ঈশ্বরীর, অধিকন্তু, বাল্মীকির কবিতা, অঘ্রানের অনুভূতিমালা* প্রভৃতি।

প্রকৃতি আর প্রেম বিনয়ের কবিতায় মিশে আছে অঙ্গাঙ্গি ভাবে। প্রেমের কবিতায় বিনয় যেন তার সবটুকু প্রতিভাকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রেমের মধ্যে যৌনতার ভাগ একটু বেশি। এবং এই ভাগ যত সময় এগিয়েছে তত বেড়েছে। *বাল্মীকির কবিতা* র কয়েকটি কবিতাকে এক সময়ে অশ্লীলতার দোষে নিষিদ্ধও করা হয়েছিল। বিনয়ের কবিতাকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায় তাঁর কবিতায় গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োগের কারণে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কবি প্রতিভার পাশাপাশি বিনয়ের গণিতের প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ। গাণিতিক আরোহী তত্ত্বের প্রয়োগ এবং ইউক্লিডীয় জ্যামাতিক যুক্তিজালের ব্যবহার তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে যোগ করেছে এক অন্য মাত্রা। যেমন-

“সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী

পৃথকতা থেকে এসে একীভূত হবার নিয়মে

কিছু পরিবর্তীদের বহিষ্কারে শেষে নিয়ে আসে

সম্ভব স্বাধীনতার রূপতল,আকার,প্রকৃতি-”[৫৯]

কিংবা-

“...বাস্তব বিশ্বের মতো হয়ে আমাদের

মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে, মানসের বিশ্বও বাস্তব।

সকল মানসী তাই নির্ভুল অস্তিত্বময়ী...”[৬০]

অঘ্রানের অনুভূতিমালা-র দীর্ঘ কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে বিনয়ের দক্ষতা প্রশ্নাতীত-

“জীবন রয়েছে তার, উড়ে উড়ে নেচে- নেচে কত গান গায়,

কত রূপকথা করে, শরমে রঙিন হয়ে হয়তো বা বলে,

‘তুমি কি ভেবেছো আমি এই মেয়েটির দেহে – শরীরের ফাঁকে

ফুটে থাকা ফুল শুধু, হতে পারে,ঠিক কথা হতে পারে তাও”[৬১]

সব মিলিয়ে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতায় বিনয় মজুমদার একটি স্বতন্ত্র নাম।

শিবশম্ভু পাল(১৯৩৪)- পাঁচের দশকের অন্যতম কবি শিবশম্ভু পাল। *কৃত্তিবাস* এর প্রথম সংখ্যা থেকেই কবিতায় নিজস্বতার ছাপ রেখে উপস্থিত ছিলেন তিনি।পাঁচের দশকের অধিকাংশ কবিদের মতো শিবশম্ভুর কবিতারও প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রেম।যদিও জীবনবোধ ও জীবন দর্শনও তাঁর কবিতায় মাঝেমাঝেই প্রধান হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক

অন্যান্য কবিদের মতো বিশাল জনপ্রিয়তা না পেলেও *কৃত্তিবাস* সহ পাঁচের দশকের অন্যান্য পত্রপত্রিকার তিনি প্রায় নিয়মিত কবি ছিলেন।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫)- পাঁচের দশকের মূলত প্রেমের কবিদের ভিড়ে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে সহজেই আলাদা করা যায়।প্রেমের কবিতা লিখলেও সমরেন্দ্র সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নীরব থাকতে পারেন নি। প্রেমকে সরিয়ে দেশ ও সমকাল বারে বারেই তাঁর কবিতায় প্রধান বিষয়বস্তুর জায়গা নিয়েছে। তাঁর কবিতায় নেই আবেগের আতিশয্য।বরং তার বদলে রয়েছে মন্ত্রোচ্চারণের ঋজুতা। প্রেম, যৌনতা এইসব যে তাঁর কবিতায় একেবারে অনুপস্থিত ছিল তা নয়, কিন্তু এইসবের প্রগাঢ় উপস্থিতি সত্ত্বেও সমরেন্দ্রর কবিতা পাঁচের কবিদের মাঝে যে হারিয়ে যায় নি, তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর কথনভঙ্গিমা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬)- পাঁচের দশকের যে কবি রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সুচারুভাবে মিশিয়েছিলেন তির্যকতাকে, তিনি হলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে বাদ দিলে প্রেমের সঙ্গে মেধার প্রয়োগের এত সুন্দর মেলবন্ধন পাঁচের দশকে খুবই বিরল। অনেকে এ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদারের উল্লেখ করতেই পারেন। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিনয়ের কবিতাতেও প্রেম ও মেধার সুমিশ্রণ উপস্থিত। কিন্তু বিনয়ের কবিতায় বিজ্ঞান ও গণিতের তত্ত্ব সেক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই বিনয় এক্ষেত্রে তুলনীয় নন। বরঞ্চ প্রণবেন্দুর কবিতার কিছুটা কাছাকাছি রাখা যেতে পারে শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জনকে। আলোক সরকার যেখানে শান্ত সংহত প্রেমের

ছবি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়, সেখানে প্রণবেন্দুর প্রেমের গতি উত্তাল, দুরন্ত তার শব্দ চয়ন। আরবি ঘোড়ার মতো তাঁর কবিতায় প্রেম ছুটে চলে টগবগিয়ে-

" ভীরুচোখ লুব্ধ হল জীবনের পণ্যবিপণিতে ;
দূরের- দ্বীপের ঘ্রাণ কাছের গভীর গূঢ় টানে
ভেসে এল এ-হৃদয়ে। তীব্রবহা প্রগাঢ় শোণিতে
মাতাল মাল্লার মোহ ভাষা পেল পাল-ছেঁড়া গানে,[৬২]

প্রণবেন্দুর কবিতায় শব্দ প্রয়োগকে বোধহয় সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তারই কবিতার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি দিয়ে-

" প্রতিটি শব্দকে তুমি সদ্যোজাত শিশুর মতন
দোলাও দুহাতে, তুমি প্রতিটি পাহাড়
প্রতিধ্বনি দিয়ে ভাঙো, নাম ধরে ডাকো-
যেন এইমাত্র চড়ুইভাতির
বন্ধুরা চলেছে ফিরে ভ্রমর-রঙিন কোনো গ্রামের ভেতরে।"[৬৩]

যদিও কবিতায় প্রণবেন্দু বলেছেন- " খুব ভয়ে-ভয়ে আমি/ কবিতা লেখার দিকে চলে আসি।"[৬৪]- কিন্তু তাঁর কবিতার পাঠক খুব সহজেই অনুভব করেন কবিতার পঙ্‌ক্তির মধ্যে তার সাহসী বিচরণ। সাবলীল তার ভাষা প্রয়োগ। তাই অনায়াসে তিনি লিখে যান মনে রাখার মতো অজস্র পঙ্‌ক্তি, অসংখ্য কবিতা। কবি প্রণবেন্দু একাধারে উদ্দাম প্রেমিক এবং চিন্তাশীল দার্শনিক।

তারাপদ রায় (১৯৩৬)- কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে তারাপদ রায় এক বিশিষ্ট নাম। যদিও কবিখ্যাতির চেয়ে রম্যরচনার গদ্যশিল্পী হিসেবেই পরবর্তী কালের পাঠক সমাজে তিনি অধিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তবু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁর কাব্যপ্রতিভা গদ্যপ্রতিভার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। *কৃত্তিবাস* পত্রিকার সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন না তিনি। এই পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে *কৃত্তিবাস* এর সপ্তম সংখ্যায়। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। কবিতার নাম 'বসন্ত'। কবির নিজের কথায়-

> " কবিতা লেখা মোটামুটি আরম্ভ করে আমি অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলাম 'পরিচয়' এবং তখনকার 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায়। তখনও কৃত্তিবাসের কাছে আমি পৌঁছোইনি, কৃত্তিবাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাইনি।
>
> একটু সাবালক হয়ে আমি কৃত্তিবাসে এসেছিলাম, সেটা কৃত্তিবাসের তৃতীয় কী চতুর্থ বছর এবং আমি সদ্য এম এ পরীক্ষা দিয়েছি। কৃত্তিবাসে এসে অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।"[৬৫]

আর স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়-

> "তারাপদ রায়ের প্রথম কবিতা পড়েই আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। যেমন অপ্রতিরোধ্য তার আগমন, তেমনই মৌলিক ও প্রাণোচ্ছল তার কবিতা।"[৬৬]

পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের মতো তারাপদর কবিতারও মূল ভাব প্রেম, একথা বলা যায় না, বরং বিষয় বৈচিত্র্যে তারাপদ রায়ের কবিতা বেশ অন্যরকম। সরাসরি নিজের

নাম উল্লেখ করে নিজেকে সম্বোধন করে লেখা কবিতায় তারাপদর স্বকীয়তা অনন্যসাধারণ-

" দাঁতাল শুয়োর নিয়ে খেলা করা,
একমাত্র তোমাকেই তোমাকে মানায়,
বদ্ধঘরে মুখোমুখি চকচকে আয়নায়
নিজের ছায়ার সামনে পরিতৃপ্ত তারাপদ রায়।"[৬৭]

কিংবা-

" এ কেমন মাঠের মতো শান্ত, অসহায়
যেন নীলঘাসের গালিচায়
নৌকা না আরাম কেদারা ?
কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু ?"[৬৮]

অথবা-

" ছায়া কেন আয়নায় আসে না ? কেন যে কষ্ট করে
সকলকে জানাতে হয়, তারাপদ রায়ের প্রতিভা,
রূপের মতন হায় প্রতিভার হয় না প্রকাশ !"[৬৯]

উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তারাপদ রায় নিজের স্বকীয়তাকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। বহু পঙ্‌ক্তিতেই উপমার বিষয়ে তিনি বাকিদের থেকে আলাদা। যেমন-

"চুণী গোস্বামীর মতো সাবলীল সহজ বাতাস"[৭০]

কিংবা-

“সেক্সপীয়রের মতো সস্তা নও তুমি,...”[৭১]

প্রেমের কবিতাতেও তারাপদর কলম থেমে থাকে নি। পাঁচের অন্যান্য কবিদের মতো প্রেমকেই রচনার প্রধান বিষয়বস্তু না করলেও নিজস্ব ভঙ্গীতেই তিনি লিখে গেছেন একের পর এক প্রেমের কবিতা। দু একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

“ আমাদের দুঃখী প্রেম বহু অপেক্ষার শেষে একা
আমাদের রাজহাঁস ম্লান মুখে ফিরে গেছে কবে
তাকে ডেকে ভালো করে বসানো হলো না, ভালোবাসা, আদর হলো না
আমাদের অবসর, আমাদের সময় ছিলো না।”[৭২]

অথবা-

“ সমুদ্র শঙ্খের চুড়ি, রাগরক্ত সিঁথির মহিমা,
আদিগন্ত স্মৃতিভার সঞ্চারিতা নীলাঞ্জনা তৃণা,
অক্ষম পটুয়া আমি, আমি ব্যর্থ, সাজাতে পারি না
স্মরণশোভন রূপে, হে মৃন্ময়ী, তোমার প্রতিমা।”[৭৩]

তারাপদ রায়ের কবিতার মধ্যে আত্ম অন্বেষণের ব্যগ্রতা সুস্পষ্ট। এই আত্ম অন্বেষণ হয়তো আধুনিক কবি কিংবা আরো বিস্তৃতভাবে ধরলে কবি মাত্রেই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তারাপদর ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। শুরু থেকে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সাথে না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি এমন ভাবেই এই গোষ্ঠীর কবিদের সাথে মনেপ্রাণে মিশে গিয়েছিলেন

যে নিজের ছেলের নাম রাখেন ‘কৃত্তিবাস’। তারাপদ রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তোমার প্রতিমা* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এছাড়া, তাঁর পরবর্তী কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম *ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন* (১৯৬৭), *কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু* (১৯৭০), *নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক* (১৯৭৪), *পাতা ও পাখিদের আলোচনা* (১৯৭৫), *ভালোবাসার কবিতা* (১৯৭৭), প্রভৃতি।

উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭)- উৎপল কুমার বসু চিরপথিক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন দেশে বিদেশে ক্লান্তিহীন ভাবে, তেমনি তাঁর কবিতার মধ্যেও ধরা পড়ে সেই ভ্রামমানতার সুর। যার দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম *পুরী সিরিজ* এবং *আবার পুরী সিরিজ,* তাঁর সম্পর্কে চির পথিকের বিশেষণটি বোধহয় মোটেও অত্যুক্তি নয়। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে এক জঙ্গমতা। স্থবির জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে বসে দার্শনিকতার তত্ত্ব আওড়ানোর বাসনা কোনোদিনই তাঁর ছিল না। তাই তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় তারুণ্যের সচলতা, যৌবনের উদ্দাম টগবগে ভাব। দার্শনিকতা যে তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত তা নয়। কিন্তু সেই দার্শনিকতা কখনো আরোপিত মনে হয়না। তা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা এবং জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দু- একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে-

“বস্তুত, ধূলির খেলা ফেলে দিয়ে আমি বারবার
অন্য সকলেরই মতো ধ্রুব তত্ত্বে, আত্মজিজ্ঞাসায়
ফিরে যেতে চেয়েছি যৌবনে
তবু আত্মরতিহীন কোন্ সৌরময়দানে আধিপত্য মানুষের ?

তবু ব্যথাহীন কোন্ বিচ্ছেদের নীল ?

কোন্ মৃত্যু ঔদাসীন্যহীন ?”[৭৪]

অথবা-

“ প্রতিটি হোমাগ্নির কাছে হাঁটু মুড়ে বসব আমি, জানতে চাইব তার রসায়ন, ভূতবিজ্ঞান,

তার জ্যোতির্বিদ্যা, কী উপায়ে সে ফুটিয়ে তোলে হিন্দোল হাঁড়ির ভিতর পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল

আমি জানতে চাইছি ভোরবেলা কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপের উপর কেন হিম

দাঁড়িয়ে থাকে গোয়েন্দা শুকতারা, সূর্য ওঠার আগে, ঠিকে আসার আগে

উত্তর না মেলা এক কৃশগণিতের দিকে তাকিয়ে সারা সকাল আমরা সপরিবারে হাসছি,”[৭৫]

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *চৈত্রে রচিত কবিতা* প্রকাশিত হয় কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে। প্রকাশক স্বয়ং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৬৩-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। মূল ভাব অবশ্যই প্রেম। এই প্রেমের ভাষা সাবলীল। যদিও শব্দচয়নে তৎসম এবং সাধু ঘেঁষা শব্দের প্রভাব তখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি, তবু, সামগ্রিক ভাবে তাকে কখনোই দুর্বোধ্য বলা যায় না। তাঁর প্রেমে একদিকে যেমন রয়েছে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকতা আবার তার সঙ্গে স্থানে স্থানে প্রয়োজন মতো শরীরময়তারও নেই অভাব। দু একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

“ অসংখ্য চুমোয় আমি একটিই তনু শুধু জীবনে ফোটাব।

কেননা তোমার দৃষ্টি উদ্ভিদের। চেতনা তোমার

মহাবনস্পতিতলে এক ম্লান বিপুল গ্রন্থের

হলুদ অধীর পাতা-এখানে সমস্তবেলা অনর্থে কাটানো গেল।”[৭৬]

অথবা-

“সুন্দরী আধেকলীনা, তুমি দেহভার
কিছু রাখো দুপুরের হলুদ বেলায়
কিছু রাখো অন্ধকার জলের গভীর দেশে-প্রমত্ত আশার
লক্ষ ঢেউ মুছে যায় একাকার সাগরে, সকালে,”[৭৭]

কিংবা-

“জানু তুমি ! তুমিই জানালা ! অনুসন্ধিৎসায় তুমি খুলে যাও
পুরুষের প্রেমের খেয়ালে। তরঙ্গের বিপুল চাপড়ে সমস্ত সৈকত ছেয়ে
শুধু খুলে যাওয়া, পুরুষের ব্যক্তিত্বমোচন
পুরুষের অশ্রুপাত, পুরুষেরই ক্রমাগত লীন সাদা অশ্রুচিহ্ন মুছে ফেলে
বালির গহ্বর খুঁড়ে, দীর্ঘ ব্যাপ্ত শীতের আকুতি।”[৭৮]

কখনো কবির প্রেম খুলে দিয়েছে নিষিদ্ধ সম্পর্কের জানালা। ভেঙে দিয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধের চৌকাঠ। কারণ প্রেমের কাছে সবই তুচ্ছ-

“এবার অদিতি আমি তোমারই কোলের কাছে সরাসরি পড়ে যেতে থাকি
ধর্মচ্যুত, আশ্রয়বিহীন
নিজেরই বোনের প্রতি যৌনতা ও উপদ্রব আমি লক্ষ করি
নক্ষত্রসন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে শাহীবাগ গম্ভীর আগুন

নিয়ে ক্রীড়াশীল, ক্ষমা নেই, নির্দেশ, অপরাধবোধ

দেখাও অদিতি।”[৭৯]

উৎপলের কবিতা যেন ছন্দে লেখা ভ্রমণ কাহিনি। নিজে ভ্রমণ পিপাসু ছিলেন বলেই হয়তো তাঁর কবিতায় বার বার উঠে এসেছে ‘তাকিয়ে দেখার আনন্দ’। প্রকৃতির বর্ণনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার পঙ্ক্তিতে। যেমন-

“তোমাকেও আবিষ্কার তৎক্ষণাৎ

কাঞ্চীকাবেরীর জঙ্গলের মর্ম ছিঁড়ে চন্দনবনের করাতকলের পাশে,

তোমাকেও আবিষ্কার তৎক্ষণাৎ গতরজনীর আলেয়ায়, খাজুরাহে

নৈকষ্যকুলীন, শূদ্র, ব্রাহ্মণের শোভাযাত্রাময় ঐ

ভাঙা স্তম্ভে, মিথুনবিপ্লবে-

হিমালয়, ডালহৌসী পাহাড়ে এক চিঠির অক্ষরে,”[৮০]

অথবা-

“জামের বনের মধ্যে আমি এক চিরস্মরণীয়

বাঘের হলুদ ছোপে সাথীহারা সন্তান বাঘের

ঘোরাফেরা দেখি। পুরনো জামের বনে আমি শুধু মানুষের

শোভাযাত্রা দেখেছি শৈশবে। সে-সব জামের বন আজ আর

উপদ্রবহীন নয়।”[৮১]

কিংবা-

"কার্তিক জ্যোৎস্নায় আজ ওড়ে ঐ বিশাল বেলুন।

একা শ্বেত ধূ ধূ মাঠে। স্পষ্ট তাকে দেখা যায়।

রাঁচিরোড স্টেশন পেরিয়ে

আমাদেরই এই দিকে আগুয়ান বিশাল বেলুন।

ও কি চাঁদ নয় ? ও কি ঈশপের উড্ডীন শাদা তাঁবু নয় ?

প্রচন্ড বাতাস লেগে রাঁচিরোড স্টেশন এবং

আমাদের পরশ্রীকাতর গোল বেলুন উড়ছে।"[৮২]

এইভাবে উৎপলের কবিতার মধ্যে প্রেম প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। এই প্রকৃতি মেকি নয়। তার জীবন্ত রূপ যেন যৌনতার মতোই সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে এই কবির কবিতায়।

নবনীতা দেবসেন(১৯৩৮)- গদ্যশিল্পী হিসেবে অধিক পরিচিতি লাভ করলেও কবি নবনীতার যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই পাঁচের দশকেই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করার পর, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় পাঁচের দশকের শেষদিকে- ১৯৫৯ সালে। গ্রন্থটির শিরোনাম ছিল *প্রথম প্রত্যয়* । তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, আত্মনিমগ্নতা আর বেদনার এক আশ্চর্য মেলবন্ধন যা পাঠকের মনোজগতকে নিয়ে যায় এক ভিন্ন পরিবেশে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল- *স্বাগত দেবদূত, স্বপ্নে আমি রাজপুত্র,* ইত্যাদি।

এছাড়া, এই সময়ের আরো কয়েকজন কবির মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, বটকৃষ্ণ দে, যুগান্তর চক্রবর্তী, ফণীভূষণ আচার্য, প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় মূল ভাব হিসেবে উঠে এসেছে আত্মনিমগ্নতা। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী চারের দশকের কবিদের সঙ্গে যেমন তাঁদের প্রভেদ লক্ষ করা যায়, তেমনি আবার সাদৃশ্য দেখা যায় তিনের দশকের কবিদের রচিত কবিতার সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই দুই দশক অর্থাৎ তিন ও পাঁচের কবিদের কবিতার মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করবো। আরও ভালভাবে বললে পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছে আমরা পাঁচের দশকের কবিদের কবিতার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তিনের দশকের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে, তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

[১] জীবনানন্দ দাশ, 'নির্জন সাক্ষর', *ধূসর পান্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ২৫।

[২] জীবনানন্দ দাশ, 'অঘ্রান প্রান্তরে', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৭৩।

[৩] জীবনানন্দ দাশ, 'দুজন', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৬৫।

[৪] জীবনানন্দ দাশ, 'নাবিকী', *সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ১০০।

[৫] হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার জীবনানন্দ* (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ), ৩৯।

[৬] তদেব।

[৭] দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩), ১১৭।

[৮] জীবনানন্দ দাশ, 'পথ হাঁটা', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৭৪।

[৯] জীবনানন্দ দাশ, 'ফুটপাথে', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৯০।

[১০] জীবনানন্দ দাশ, 'শব', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৮২।

[১১] জীবনানন্দ দাশ, 'শীতরাত', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৮৬।

[১২] জীবনানন্দ দাশ, 'স্থবির যৌবন', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৮৯।

[১৩] জীবনানন্দ দাশ, 'মনোবীজ', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৯৪।

[১৪] জীবনানন্দ দাশ, 'আদিম দেবতারা', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৮৮।

[১৫] তদেব।

[১৬] জীবনানন্দ দাশ, 'আট বছর আগের একদিন', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৮৫।

[১৭] তদেব।

[১৮] তদেব।

[১৯] জীবনানন্দ দাশ, 'রাত্রি', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ২১৩।

[২০] জীবনানন্দ দাশ, 'লঘু মুহূর্ত', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ, (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ২১৪।

[২১] তদেব, ২১৫।

[২২] তদেব।

[২৩] শঙ্খ ঘোষ, 'বাবুমশাই', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ১৮৬।

[২৪] শীতল চৌধুরী, *জীবনানন্দ অন্বেষা বোধের স্বরলিপি,* (কলকাতাঃপ্রতিভাস ২০১০), ৭০।

[২৫] আবদুল মান্নান সৈয়দ,*জীবনানন্দ দাশ, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ৬৬৯।

[২৬] সুভাষ মুখোপাধ্যায়,'মুখবন্ধের মুখোসে', শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১)।

[২৭] আলোক সরকার, 'বিস্ময়' ,*উতল নির্জন,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, (কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ২০০৫),১৩ ।

[২৮] আলোক সরকার, 'শীত' ,*বিশুদ্ধ অরণ্য,* (কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ২০০৫),৬৭।

[২৯] আলোক সরকার, 'অরচনা' ,*হিমপ্রহর,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, (কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ২০০৫),

[৩০] কবিতা সিংহ, 'ভূমিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে;জ পাবলিশিং ২০০৯)।

[৩১] শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'মত্ত অবস্থায় রচিত', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,*)কলকাতাঃ দে জ' ,(১৯৯৬ ,পাবলিশিং ১২।

[৩২] শঙ্খ ঘোষ, 'বাবুমশাই', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ১৮৬।

[৩৩] শঙ্খ ঘোষ, 'শিশুসূর্য', *কবিতা সংগ্রহ -১*, (কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ৩৬।

[৩৪] শঙ্খ ঘোষ, 'যমুনাবতী', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ৫০।

[৩৫] শঙ্খ ঘোষ, 'কালযমুনা' *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ২২৯।

[৩৬] শঙ্খ ঘোষ, 'খন্ডিতা', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ৪৫।

[৩৭] শঙ্খ ঘোষ, 'দিনগুলি রাতগুলি', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ২০।

[৩৮] শঙ্খ ঘোষ, 'সঙ্গিনী', *কবিতা সংগ্রহ -১*,(কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ১৯৯৪), ২০২।

[৩৯] তদেব, ২০১।

[৪০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কথোপকথন',*পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ৮৩।

[৪১] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'যেভাবে শব্দকে জানি',*পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ৯৭।

[৪২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'আছে আছে সে এখানে আছে',*পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ৯৯।

[৪৩]শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ', *পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ৭৯।

[৪৪]শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'প্রেমের মড়া', *পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ১৭৮।

[৪৫]শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'বাঘ', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৬), ৮৪।

[46]শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'পুনর্বিবেচনা', *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ৪১।

[47]অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'বুধুয়ার পাখি', *কবিতা সংগ্রহ প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ২৩।

[48]অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'এ বাসনা বোধিসত্ত্ব', *কবিতা সংগ্রহ প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৬৭

[49]অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'গোধূলির শান্তিনিকেতন', *কবিতা সংগ্রহ প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩০।

[50] অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'বসুধারা কল্যাণের ব্রতে', *কবিতা সংগ্রহ প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩৩।

[51] অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'নির্জন দিনপঞ্জী', *কবিতা সংগ্রহ প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৫১।

[52]সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিবৃতি', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ১৮।

[53]সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুপুর', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ১৯।

[54]সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'তুমি, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ২০।

[55]সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'হিমযুগ', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ৩৩।

[56]সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ৪৯।

[৫৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীরার অসুখ' *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ৬২।

[৫৮] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'নীরার হাসি ও অশ্রু', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯), ৭০।

[৫৯] বিনয় মজুমদার, '৯নং কবিতা', *অধিকন্তু, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ *কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৭৬।

[৬০] বিনয় মজুমদার, '১নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৮৩।

[৬১] বিনয় মজুমদার, '৪নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৯৪।

[৬২] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'ভরা আঠারোর গান', (কলকাতাঃ প্রমা ২০০৯), ১৯।

[৬৩] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'তৃষ্ণার ভেতর থেকে', (কলকাতাঃ প্রমা ২০০৯), ৩৪।

[৬৪] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, 'আমি কবিতার দিকে', (কলকাতাঃ প্রমা ২০০৯), ১৯।

[৬৫] তারাপদ রায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৭।

[৬৬] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "তারাপদ রায় সম্পর্কে অসমাপ্ত রচনা", *কৃত্তিবাস বাংলা কবিতায় পালাবদল,* সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস ২০১৪), ১৫৮-৫৯।

[৬৭] তারাপদ রায়, 'একমাত্র তোমাকেই', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ২৯।

[৬৮] তারাপদ রায়, 'কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু' *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৫৯।

[৬৯]তারাপদ রায়, 'একান্ত ব্যক্তিগত' *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩২।

[৭০] তারাপদ রায়, 'একমাত্র তোমাকেই' *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ২৯।

[৭১] তারাপদ রায়, 'সেক্সপীয়র ও প্রতিবেশিনী', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩১।

[৭২] তারাপদ রায়, 'আবার প্রেমের কবিতা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৯৫।

[৭৩] তারাপদ রায়, 'উৎসর্গ', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ২১।

[৭৪] উৎপল কুমার বসু ,'ফেরিঘাট', *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৭০।

[৭৫] উৎপল কুমার বসু ,*লোচনদাস কারিগর, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ১৩৪।

[৭৬] উৎপল কুমার বসু ,'আবিষ্কার', *চৈত্রে রচিত কবিতা, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৩৯।

[৭৭] উৎপল কুমার বসু ,'এই বেলাভূমি', *চৈত্রে রচিত কবিতা, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৩০।

[৭৮] উৎপল কুমার বসু ,'পুরী সিরিজ', *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৫৭।

[৭৯]উৎপল কুমার বসু ,'বোনের সাথে তাজমহলে', *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৭৪।

[৮০] উৎপল কুমার বসু ,'ফেরিঘাট', *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৭০।

[৮১]উৎপল কুমার বসু ,'নীলকুঠি', *আবার পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৮৩।

[৮২]উৎপল কুমার বসু ,'মধু ও রেজিন', *আবার পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৯১।

৪. পঞ্চাশের কবিদের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ

পূর্বের অধ্যায়ে পাঁচের দশকের প্রধান কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ওই কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ সম্বন্ধে আলোকপাত করা। পাঁচের দশকের কবিদের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ একটি সাধারণ ঘটনা। সেই সময়ে খুব কম কবিই ছিলেন, যাঁদের কোনও কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটেনি। পাঁচের দশকে লিখতে শুরু করেছেন, এরকম প্রায় সব কবিই তাঁদের কবিতায় প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে জীবনানন্দের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রভাবের প্রমাণ একদিকে যেমন তাঁদের কবিতা তেমনি অন্যদিকে পরবর্তীকালে তাঁদের বিভিন্ন স্মৃতিচারণামূলক গদ্যেও তাঁরা নিজেরাই একথা স্বীকার করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে জীবনানন্দের অভিঘাত সব কবির উপর সমান ভাবে পড়েনি। কয়েকজন কবির ক্ষেত্রে এই অভিঘাতের মাত্রা এবং ব্যাপ্তি অনেক বেশি প্রকট ও প্রসারিত। আবার, অনেক কবির ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত স্বল্প ও সূক্ষ্ম। তাই পাঁচের দশকের কবিদের ওপর জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ নিয়ে বিশদে আলোচনা করার সময় সমস্ত কবিকে নিয়ে আলোচনার দৈর্ঘ্য যে সমান হবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই বাংলা কবিতার ইতিহাসে কবিদের গুরুত্ব এবং তাঁদের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রাভেদকে মাথায় রেখে মোট পাঁচজন কবিকে নির্বাচিত করে এই অধ্যায়ের আলোচনাকে তিনটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। আলোচনার প্রথম অংশে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ এবং দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে কারণ পাঁচের দশকের যে দুইজন

প্রধান কবিদের লেখায় জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে বেশি প্রতিগৃহীত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদার। এই দুজন কবি ছাড়া আরো তিনজন কবিকে নির্বাচন করা হয়েছে যাঁরা পাঁচের দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেও তাঁদের লেখায় জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রা শক্তি এবং বিনয়ের তুলনায় খুবই কম। এঁরা হলেন আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬) এবং উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭)। এই তিনজন কবিকে নিয়ে তৃতীয় উপ-অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

> "এই সময়ে জীবনানন্দের আকর্ষণও তাঁর কাছে ছিল অমোঘ...প্রথম পর্যায়ে জীবনানন্দ তাঁর কবিতার নামকরণে এবং বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির মধ্যে যেন সশরীরে বিরাজ করছেন...শুধু চিত্রকল্পেই তিনি জীবনানন্দকে ব্যবহার করেননি। কাব্যের শরীর গঠনে, শব্দ ব্যবহারে অর্থাৎ পয়ারের বিভিন্ন মাত্রা ব্যবহারে, ভারী আর হালকা,-সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের প্রয়োগেও জীবনানন্দ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।"[১]

উপরের উদ্ধৃতির রেশ ধরে বলা যায়, বিনয় মজুমদার ছাড়া পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে যদি কেউ নিজের কবিতায় জীবনানন্দের সবচেয়ে সফল এবং ব্যাপক প্রতিগ্রহণ করে থাকেন, তবে সেই কবির নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)। এই অধ্যায়ের আলোচনার

বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ। সমগ্র আলোচনাটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম অংশের আলোচনার বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ।

৪.১.১ কবিতার ছন্দে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতার সর্বাধিক আলোচিত কবি শক্তি। ছন্দ প্রয়োগের কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর ব্যাপকতা ও বহুমাত্রিক শক্তি যেকোনো কবির কাছেই ঈর্ষণীয়। বাংলা ছন্দের তিনটি স্বীকৃত ধারার প্রতিটিতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। জীবনানন্দ কিংবা বিনয় মজুমদারের মতো তাঁকে শুধুমাত্র বা প্রধানত মিশ্রকলাবৃত্তের শিল্পী বলা মোটেও সমীচীন হবে না। সরল কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর অংশগ্রহণ গুণগত এবং পরিমাণগত -উভয় দিক থেকেই অনন্য। বিশিষ্ট ছান্দসিক নীলরতন সেন বলছেন-

> “ কলাবৃত্তের তুলনায় শক্তি মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্তের ব্যব্যহার অনেক বেশিকরেছেন। মিশ্রবৃত্তে তিনি কমবেশি দেড় শতাধিক সনেট লখেছেন, বেশ কিছু দশ মাত্রক পঙ্‌ক্তির কবিতা লিখেছেন, মুক্তকের নিদর্শনও কিছু কম নেই। তাছাড়া, স্তবক বন্ধ মিত্রাক্ষর পয়ার ত্রিপদীও রয়েছে।”[২]

কিন্তু একথা স্মর্তব্য যে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধুমাত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দের উপর

জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ দেখানোর প্রচেষ্টা রয়েছে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে জীবনানন্দ মূলত মিশ্রবৃত্তের শিল্পী। সুতরাং এই প্রবন্ধাংশে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত কবিতাই আলোচিত হবে।

আলোচনার শুরুতে বলা ভাল, বিনয় মজুমদারের মতো শক্তির কবিতার ছন্দে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের কোনো সরলরৈখিক উত্থান কিংবা পতন দেখা যায় না। তবে আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মিশ্রবৃত্তের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে একটি হল দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির ব্যবহার আর অপরটি অসম দৈর্ঘের পঙ্‌ক্তির ব্যবহার। অসম পঙ্‌ক্তির প্রসঙ্গে পরে আসা হবে। প্রথমে আমরা দেখব মিশ্রবৃত্তের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির ব্যবহারের নিদর্শন।

শক্তির এই দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির ব্যবহার নিয়ে নীলরতন সেন বলছেন-

> " ছয়, আট, বারো বা চোদ্দ মাত্রার লাইনের মিশ্রবৃত্ত কবি লিখেছেন। তবে দশ বা আঠারো মাত্রার লাইন তিনি বেশি পছন্দ করতেন মনে হয়।" [৩]

দশ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তির নিদর্শন প্রসঙ্গে পরে আসছি। আলোচনার শুরুতে থাকবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* র প্রথম কবিতা 'খেলনা' র কিছু পঙ্‌ক্তি-

" পাবো না কখনো তারে আর,/ একবার পেয়েছিনু, /যেন বাল্যে খুব দূরদেশে//
গর্ভের সমান কাছে/ বারেবার আসা তার/ হয় না কখনো জানি/ তবু ডাকা-ডাকি//

খেলনা খেলনা দাও /ভাঙি ছুঁড়ে দিয়ে/ দেয়ালে বা দেয়ালের/ অনেক উপরে।//
কী নীল খোলে না দ্বার,/ হাতে যার অপেক্ষার/ বিশাল বিফল দুঃখ/ তার বুকে ভেসে//
হে অপেক্ষা খেলনা দাও/ আর ভাঙি, ভাঙি, টুকরো/ করি জন্ম, কেন দিলে//
কেবল মুন্ডেরে।//"[৪]

জীবনানন্দের মিশ্রবৃত্তের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য এখানে সুস্পষ্ট। প্রথমত, পঙ্‌ক্তির দীর্ঘতা। পঙ্‌ক্তির চলন এখানে

১০+৮+১০=২৮

৮+৮+৮+৬=৩০

৮+৬+৮+৬=৩০

৮+৮+৮+৬=৩০

৯+৯+৮=২৬

৬

সুতরাং, এই ২৮/৩০ মাত্রার সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। বাংলা আধুনিক কবিতায় এই দীর্ঘ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা জীবনানন্দেরই হাত ধরে। পরবর্তীকালে যাকে সঙ্গী করেছিলেন বিনয়

মজুমদার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় এই প্রতিগ্রহণের ছাপ সুস্পষ্ট।

এছাড়া জীবনানন্দের মিশ্রবৃত্তের অপর যে বৈশিষ্ট্য আলোচ্য কবিতায় উঠে এসেছে তা হল অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তির ব্যবহার। এখানে পঙ্‌ক্তিগুলিতে মাত্রার সংখ্যা যথাক্রমে ২৮, ৩০, ৩০, ৩০, ২৬ ও ৬। অর্থাৎ, মাঝের তিনটি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রা সংখ্যা ৩০ থাকলেও প্রথম ও শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে তা কমে গেছে।

স্পষ্টতই মহাপয়ারের এই চলনের মৃদুমন্দতা জীবনানন্দকেই মনে পড়ায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতায় মহাপয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের তর্কাতীত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করার পরেও কবিতাটিতে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ সম্পর্কে নিঃসংশয় কীভাবে হওয়া যায়? এর উত্তরে বলা যায়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে ব্যবহৃত বেশ কিছু শব্দবন্ধ তুমুলভাবেই জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- 'ফসলক্ষেতের', 'মরাই', 'ইঁদুর'। তাছাড়া সমিল প্রবহমান পয়ার কিংবা মহাপয়ারের ব্যবহার স্বাভাবিক ভাবেই জীবনানন্দকেই মনে করায়।

এবার আসা যাক আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তির নিদর্শনের প্রসঙ্গে।

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য কাব্যগ্রন্থের 'নিয়তি' কবিতার তৃতীয় স্তবক-

"সে-বেলা গেলেই ভালো/ যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে//

রূপসী মুখের ভাঁজে /হায় নীল প্রবাসী কৌতুক;//

বিরতির হে মালঞ্চ,/আপতিক সুখের নিরালা//

বিষাদেরে কেন ঢাকো /প্রয়াসে সুগন্ধি বনফুলে।”//[৫]

বলাই বাহুল্য, পঙ্‌ক্তি এক্ষেত্রে দ্বিপদী এবং তার চলন মহাপয়ারে অর্থাৎ ৮+১০ মাত্রার দুটি পদে। সুতরাং এটি আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তির একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। শুধু আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তির কারণেই নয়, এই কবিতাটির বাক্যশৈলি, শব্দচয়ন সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ- যা ‘রূপসী মুখের ভাঁজে” থেকে ‘হায় নীল” সর্বত্র বিরাজমান। তবু এইসবের মধ্যেও বোঝা যাচ্ছে কবি শক্তির শক্তিমান উপস্থিতি যার ফলে জীবনানন্দের ‘প্রগাঢ় কৌতুক’ হয়ে যায় ‘প্রবাসী কৌতুক’, ব্যাধির বিশেষণ হয় ‘নিষ্পলক’ আর উঠে আসে এইসব চরম পঙ্‌ক্তি-

“...আপতিক সুখের নিরালা” [৬]

অন্য একটি কবিতার উদাহরণ নেওয়া যাক। ওই একই কাব্যগ্রন্থের ‘সেনেট ১৯৬০’ কবিতায় আমরা দেখি-

“তোমাদের শেষ নেই,/ যবে শুরু ফসলক্ষেতের//

বুক ভ’রে গর্ত খোঁড়া,/ একপ্রান্ত মেলানো পল্লীতে।//

মরাই, গুদোম কিংবা/ আটচালা অতিপ্রাদেশিক;//

ইঁদুর, বিহগশ্রেষ্ঠ /গান করো কাতারে, সিঁড়িতে।//"[৭]

পঙ্‌ক্তির চলন এখানেও

৮+১০=১৮

এরপর আসা যাক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থেরই আরেকটি কবিতার প্রথমাংশে যার নাম 'জন্ম এবং পুরুষ'-

" আবার কে মাথা তোলে/ ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ//

সাধ হয় মাথা তোলে/ ফাঁসা মাথা একাকার মাথা//

গহ্বরে মাংসের বিড়ে / মাড় মুত ফুল রক্তপাত//

আগায় দুপাড় পিছে.../ স্তম্ভ লাল ছিলা লাল, লাথি//

ভাঙে ঈশ্বরের মুখ, / বোঁচা নাক, সহসা সিন্দুক //

খুলে গেছে, দুমড়ে গেছে; / ক্লান্ত শাদা হা ঈশ্বর, ভেক //

চিতিয়ে মরেছে রাশি, / শাদা পেট উল্লুক চৌতাল//" [৮]

এখানেও মহাপয়ার বন্ধের পঙ্‌ক্তি পাওয়া যাচ্ছে । প্রতিটিরই দৈর্ঘ্য সমান। আঠারো মাত্রার এই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির চলন ৮+১০।

এরপর নেওয়া যাক আরও একটি ১৮ মাত্রার দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধের মিশ্রবৃত্ত পঙ্ক্তির কবিতার কিছু অংশ- ওই একই কাব্যগ্রন্থ থেকে। কবিতার নাম 'পাতাল থেকে ডাকছি'-

" স্পর্ধার মৃত্যুই শ্রেয়, / তুমি ভ্রান্ত পুণ্যের কৌতুকে//

আমারে নিতেছো টানি,/ আলিঙ্গনবিহীন দুর্গম...//

বামে বা দক্ষিণে আহা / প্রেম দুঃস্থ পাংশু রসাতল//

উপস্থ ব্যাধির পোকা, / কৃমি, পুঁজ,রক্তপাত বুকে//

আমারে ভালোই বাসে। //

-নরক! নরক! ওরা / বলে তারে চীৎকৃত সমীহে//

বরং দূরেই রয়; / রম্য লীঢ় সম্পতি-সম্বৃত//

শুকনো সুখী সামাজিক; / অতিকায় দুঃস্বপ্নে বিলীন //

উজ্জ্বল সুস্থের স্পর্ধা। //

এই স্পর্ধা পুণ্যে নেবে ছেনে//

এত বড়ো কারিগর। / ডৌল ভেঙে রহস্যে নবীন //

নিয়ে যাবে যেন নিশা / প্রলোভে পাখিরে //

কুলায়-উষ্ণতা থেকে / দেশান্তরে বিরহে বিনাশে//

অক্ষয় নিদ্রায়। //

প্রিয়তম, রাখো আত্ম এনে//

আমার পাতালে বুকে / উপভোগ আরণ্যক মূলে//

ভীষণ সৌন্দর্য, দ্যাখো / পাপ আহা অত্যুজ্জ্বল পাপ//

স্ফটিক হে আদিনাগ / পলালমন্ডিত কেশমালা //

শ্বেততম উষ্ণ চর, / হে স্ফীতি হে মহান প্রলয়//

আসন্ন কোরক বিশ্বে / এই-ই মাত্র ভাস্কর্য পাতাল । //”[৯]

এখানে পঙ্‌ক্তির চলন প্রথম স্তবকে

৮+১০

৮+১০

৮+১০

৮+১০

৮

দ্বিতীয় স্তবকে তা একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক রকমই-

৮+১০

৮+১০

৯+৯

৮

তৃতীয় স্তবকে পৌঁছে তা হয়ে গেল এইরকম-

১০

৮+১০

৮+৬

৮+১০

৬

আবার দেখা যাচ্ছে চতুর্থ তথা শেষ স্তবকে গিয়ে পঙ্‌ক্তিগুলির সজ্জা-

১০

৮+১০

৮+১০

৮+১০

৮+১০

৮+১০

সুতরাং প্রতি স্তবকের প্রথম এবং শেষ পঙ্‌ক্তিকে অপূর্ণ বলে স্বীকার করে নিলে এ নিয়ে কোনো সংশয় থাকে না যে পূর্ণ পঙ্‌ক্তিগুলি দ্বিপদী এবং তার চলন মহাপয়ার বন্ধে অর্থাৎ ৮+১০ মাত্রায়। এখানে একটি বিশেষ ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুই পদের মাত্রা বিভাজন ৯+৯। মহাপয়ারের ৮+১০ চলনের মধ্যে এই প্রকার বিজোড় চলন সম্পর্কে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য এইরকম-

> " অধুনাপূর্ব কালে আট মাত্রার পরে অর্ধযতি রাখাও আবশ্যক বলে গণ্য হত না। অর্থাৎ অর্ধযতি-লোপের নিদর্শনও খুব বিরল ছিল না। ফলে চোদ্দ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি অনেক সময় ছয়-আট, চার-দশ, চার-ছয়-চার, চার-আট-দুই ইত্যাদি মাত্রা বিভাগে বিভক্ত হত। এমন কি, সাত-সাত মাত্রার বিভাগও খুব বিরল ছিল না... বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, একমাত্র সাত ছাড়া অন্য-কোনো অসম সংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগ দেখা যায় না সেকালের কবিদের রচনায়...কবি মধুসূদন তৎকালীন পয়ারের এই অসমান যতিবিভাগ ও তজ্জাত আভ্যন্তর গতিবৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রবহমান (অমিত্রাক্ষর) পয়ার রচনায়। তবে তিনি পয়ার পঙ্‌ক্তিতে

সাত মাত্রার যতিবিভাগ ছাড়া আরও কিছু অসম সংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগও মেনে নিয়েছিলেন ছন্দে গতিবৈচিত্র্য সাধনের প্রয়োজনে। কিন্তু হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা এ-রকম অসম সংখ্যার মাত্রাবিভাগ মেনে নেন নি। এমনকি পূর্বাগত সাত মাত্রার বিভাগও পরিত্যক্ত হয়েছে। কেননা, অসম সংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগ পয়ারপঙ্‌ক্তির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে ব্যাহত করে। তাই আজকাল পয়ারের যতিবিভাগে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসম সংখ্যার মাত্রা দেখা যায় না। অধিকন্তু আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচিত অপ্রবহমান পয়ারে ও মহাপয়ারে আট মাত্রার পরবর্তী অর্ধযতি-লোপের নিদর্শনও খুব বিরল।”[১০]

উপরের উদ্ধৃতিতে যা পয়ার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাকে মহাপয়ারের ক্ষেত্রে ধরলে স্বাভাবিক ভাবেই সাতের বদলে নয় মাত্রার প্রসঙ্গ উঠে আসবে এবং বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রে প্রবোধ চন্দ্রের মতামতকে স্বীকৃতি দিলে তা রবীন্দ্রনাথ নয় বরং মধুসূদনের প্রতি শক্তির নৈকট্যকেই প্রমাণিত করে। প্রকৃত বিষয়টি হল ছন্দের প্রচলিত কাঠামোকে ভাঙার প্রচেষ্টা, যা কিনা শক্তি সারাজীবন ধরেই তার কবিতায় করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে শক্তির নিজের একটি কবিতাকে উদ্ধৃত করলে অত্যুক্তি হবে না। কবিতার নাম ‘ভাঙা গড়ার চেয়েও মূল্যবান’। কাব্যগ্রন্থ ১৯৮২ সালে প্রকাশিত *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো-*

“কে জানে কেমন করে ছন্দের বারান্দা ভাঙা হবে?

মিস্তিরি মজুত, কাছে শাবল গাঁইতি সবই আছে।

লোকবল আছে, আছে ভাঙনের নিশ্চিত নির্দেশ,

ভাঙার ক্ষমতা আছে, প্রয়োজনও আছে।

বারান্দা জেনে গেছে; সবাই ভাঙনে নয় দড়!

ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে,

এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে

গায়ে আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।

অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে, মূর্খ, ভাঙা শিখতে হয়-

অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান

কখনো-সখনো! ” [১১]

এই কবিতাটিকে চুম্বকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কাব্যের ছন্দ বৈশিষ্ট্য বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পাঁচের দশকের আরেক বিখ্যাত কবি ও অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের ছন্দ আলোচনার বই *ছন্দের বারান্দা* । উপরের কবিতায় এই ছন্দেরই বারান্দা ভাঙার উল্লেখ আছে। প্রথাগত ছন্দের চলনকে ভাঙার প্রচেষ্টা শক্তি তাঁর কবিতায় সারা জীবন ধরে করে গেছেন। উল্লেখ্য যে তাঁর প্রথম রচিত কবিতা ‘যম’ মিশ্রবৃত্তে রচিত হলেও

'জরাসন্ধ' কিন্তু গদ্যে লেখা। সাধারণত দেখা যায়, প্রথম বা প্রথম দিকের কবিতায় অপরিণত কবির ঝোঁক থাকে দলবৃত্তের প্রতি কারণ আপাত ভাবে তার নির্মাণ কৌশল সহজতর। বাংলা কবিতায় মিশ্রবৃত্তের সুমহান শিল্পী জীবনানন্দ দাশও নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* এ বেশ কিছু দলবৃত্তের কবিতা লিখেছেন। ব্যতিক্রম শক্তি এবং অবশ্যই বিনয় মজুমদার। তাও কবিজীবনের একদম শুরুর কবিতাগুলিতে না হলেও অনতিবিলম্বেই শক্তি প্রবেশ করেছেন দলবৃত্তের রাজ্যে। তাকে 'ছড়ার ছন্দ' থেকে পরিণত করেছেন 'সিরিয়াস প্রেমের কবিতার' বাহকে। কিন্তু বিনয় সারাজীবন দলবৃত্তকে অচ্ছুত করেই রাখলেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিজীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে মিশ্রবৃত্তে রচিত কবিতার সংখ্যা কমতে থাকবে। তার স্থান ক্রমশ গ্রহণ করবে কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত। কলাবৃত্তের মধ্যে আবার কবির প্রিয়তম পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্ব। তাঁর অসংখ্য জনপ্রিয় কবিতা লেখা হয়েছে এই পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট কলাবৃত্ত ছন্দে। কলাবৃত্তের পাশাপাশি দলবৃত্তেও তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্তে রচিত কবিতাগুলি এই অভিসন্দর্ভের নিরিখে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় আলোচনার পরিসরের বাইরেই রাখা হল, কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় কবির মিশ্রবৃত্তে রচিত কবিতা এবং সেই কবিতাগুলিতে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ অন্বেষণ। এই প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচিত হয়েছে কিছু দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির কবিতা যার ধীরোদাত্ত তানপ্রবণতার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে এক জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। কিন্তু মুক্তকের উদাহরণ ছাড়া কি সঠিকভাবে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণের প্রমাণ গৃহীত হয়, তাই এবার আলোচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হবে শক্তির মিশ্রবৃত্তে রচিত কিছু অসম পঙ্‌ক্তির কবিতা যার মধ্যে স্পষ্টতর জীবনানন্দীয় চেতনা জগৎ।

প্রথমেই উল্লেখ করা যাক *সোনার মাছি খুন করেছি* কাব্যগ্রন্থের 'এলেজিঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক কবিতাটির অংশবিশেষ-

"অনন্ত নক্ষত্র আজ /খেলা করে আকাশের বুকে//

আমি যেন টের পাই/

আমি যেন দেখে যেতে পারি//

তোমাদের কঠিন অসুখে//

তোমরা ঔষধপত্র / পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক//

অনন্ত নক্ষত্র দূরে / খেলা করে- করে হতবাক্‌।//" [১২]

এখানে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি উল্লেখযোগ্য অভিমুখ দেখা যায়। প্রথমটি হল প্রথম পঙ্‌ক্তির শব্দচয়ন বিশেষণের ব্যবহার ও চিত্রকল্প নির্মাণ যা অবধারিত ভাবে মনে করায় জীবনানন্দকে। 'নক্ষত্র', 'আকাশের বুকে' আর সেই নক্ষত্রের বিশেষণ 'অনন্ত'। সব মিলিয়ে একটা জীবনানন্দীয় পরিবেশ। এই পরিবেশ ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে পরের দুটি পঙ্‌ক্তিতে 'আমি যেন' শব্দ গুচ্ছের দ্বিবিধ ব্যবহারে। সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগও এখানে কবিতাটিকে জীবনানন্দীয় করে তুলেছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমুখগুলি নির্ধারিত হয়েছে কবিতাটির ছন্দরীতির নিরিখে। দ্বিতীয়ত, মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত কবিতাটির ছন্দোবন্ধ মহাপয়ার এবং ফলে এখানেও পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির মতো সুদীর্ঘ ১০+৮= ১৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি কবিতাটিকে জীবনানন্দীয় করে তুলেছে। আর তৃতীয়ত, এখানে প্রথম তিন পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিল বিহীন অসমান পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি কবিতার ছন্দোবন্ধকে অমিল প্রবহমান পয়ার বা মুক্তকে পরিণত করেছে যা পুনরায় কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দীয় অভিঘাতের উপস্থিতিকেই প্রমাণ করছে। অনেকে শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিলের উপস্থিতির কারণে কবিতাটিকে অমিল না বলে সমিল প্রবহমান পয়ার বা সমিল মুক্তক বলেও দাবি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কবিতাটির প্রথম স্তবকের পঙ্‌ক্তি বিভাজন হবে নিম্নরূপ-

“অনন্ত নক্ষত্র আজ /খেলা করে আকাশের বুকে//

আমি যেন টের পাই/

আমি যেন দেখে যেতে পারি/

তোমাদের কঠিন অসুখে//

তোমরা ঔষধপত্র / পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক//

অনন্ত নক্ষত্র দূরে /খেলা করে- করে হতবাক্‌।//”[১৩]

অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিকে

"আমি যেন টের পাই/

আমি যেন দেখে যেতে পারি/

তোমাদের কঠিন অসুখে//"[১৪]

এই তিন লাইনে ভেঙে সাজানো হয়েছে। সেক্ষেত্রেও কবিতাটি মুক্তক এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মাত্রা সংখ্যা হবে ৮+১০+১০=২৮। আর বলাই বাহুল্য, বাংলা কবিতায় এই সুদীর্ঘ ২৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি নিঃসন্দেহে জীবনানন্দের প্রভাবকেই স্বীকৃতি দেয়।

শুধু প্রথম স্তবকেই নয়, সমগ্র কবিতা জুড়েই ছড়িয়ে আছে জীবনানন্দের চেতনা জগৎ। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকটি এই রকম-

" ওরা এই পৃথিবীর / কেউ নয়-ঐ নক্ষত্রেরা//

আমরা তো পৃথিবীর লোক/

আমাদের অভিমান হোক/

আমাদের হোক রাগদ্বেষ//

আমরা মেটাবো একা-একা//

অনন্ত নক্ষত্র তবু /খেলা করে- দূরে দেখা যায়//"[১৫]

এখানে ছয় লাইনে বিন্যস্ত চারটি পঙ্‌ক্তির মাত্রাবিভাজন নিম্নরূপ-

৮+১০=১৮

১০+১০+১০=৩০

১০

৮+১০

পুনরায় এখানে একটি সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি এবং এর দৈর্ঘ্য পূর্বের স্তবকের ২৮ মাত্রার চেয়েও দীর্ঘ। এটি ৩০ মাত্রার।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে দুটি স্তবকের পঙ্‌ক্তি বিন্যাস ভিন্ন। শুধু এই দুই স্তবকের ক্ষেত্রেই নয়, কবিতাটির অবশিষ্ট স্তবকগুলির পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ্যর মধ্যেও অসমতা লক্ষ্যণীয়।

এরপর আসা যাক ওই একই কাব্যগ্রন্থের "হাওয়া-বদল" কবিতাটির কথায়। এটি মিশ্রবৃত্তে রচিত দুই স্তবকে বিন্যস্ত একটি কবিতা। প্রতিটি স্তবকের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ছয়। মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা বারো অর্থাৎ এটি সনেট হতে হতেও হয় নি। যদিও পঙ্‌ক্তির চলন সনেট অনুসারী-

"হাওয়ার বদল আমি / টের পাচ্ছি। নিঃসঙ্গ প্রকৃতি//

কাছে এসে খেলা করে, / আমিও খেলায় ব্যস্ত হই//

কৃত্রিমে শিল্পের জন্ম / ভোগ করে এখন বিস্তৃতি//

চাই আমি, মনে হয়, / দেয়ালে স্থাপিত দীর্ঘ মই//

নেবে সেই পরপারে, / যেখানে সকলে বাঁধে ঘর//

আলোতে ছায়াতে বসে, / ভোগ করে নারী ও ঈশ্বর।//"[১৬]

স্পষ্টতই, এটি একটি ১৮ মাত্রার দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধের মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির কবিতার একটি স্তবক। কবিতাটির মধ্যে 'টের', 'খেলা করে' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং মৃত্যুচেতনার বিষণ্ণতা মহাপয়ারের মৃদুমন্দ তানপ্রবণতার সাথে মিলে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এক জীবনানন্দীয় পরিবেশ।

এরপর আসা যাক *পদ্যসমগ্র-৩* এর অন্তর্গত *সুখে আছি* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গে। প্রথমে "উপদ্রুত ঘাসের ভিতরে" শীর্ষক এই কবিতার কিছু অংশ-

"এখন গভীরভাবে / ঘাসের ভিতরে বসে থাকা//

ভাল মনে হয় এই / প্রগাঢ় রোদ্দুরে//

আকাশের নিচে থেকে / থাকা নয় অথচ ছায়ায়//

এই ঘাস নদী গাছ- / এলোমেলো হাওয়ার কুহক //

মনের ভিতরে কিছু / গাছপালা এঁকে দেবে বলে।//"[১৭]

জীবনানন্দীয় আমেজে ভরপুর এই কবিতার শব্দচয়ন থেকে শুরু করে মহাপয়ারের ১৮ মাত্রার মৃদুমন্দ চলন।

ওই একই কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা “কবিতার কাছে” -

“ কবিতার খুব কাছে /এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো //
যন্ত্রণায় ভারি হয়ে, / মৃত্যুতে পাথর হয়ে গেছে //
মাটিতে পড়েছে ঢলে / ধুলোবালি যাকিছু স্নেহের //
কথা বলে, মহিমায় /একদিন ও ছিলো আত্মীয়। //

কবিতার খুব কাছে / এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো //
যে ভাবে মানুষ যায় / মানুষীর মনের গভীরে- //
সেইভাবে, এসে যায় / নষ্ট ফুল কবিতার কাছে //
মানুষের কাছাকাছি / ফুল এসে পড়েছে ধুলায়।//”[১৮]

উপরের কবিতাটিও শুধু যে আঠারো মাত্রার মহাপয়ারের চলনেই জীবনানন্দকে মনে পড়ায় তা নয়। কবিতাটির “যে ভাবে মানুষ যায় মানুষীর মনের গভীরে” -এই পঙ্ক্তিটি একসাথে মনে পড়ায় জীবনানন্দের দুটি কবিতার পঙ্ক্তিকে-

"মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে"[১৯]

আর,

"কোনো এক মানুষের তরে কোনো এক মানুষীর গভীর হৃদয়"[২০]

শুধু জীবনানন্দই নয়,কবিতাটির -"কবিতার খুব কাছে এসে গেছে নষ্ট ফুলগুলো " -পঙ্‌ক্তিটি আমাদের মনে করায় সমসাময়িক কবি বিনয় মজুমদারের এই অমোঘ পঙ্‌ক্তি-

"মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়"[২১]

এরপর আলোচনার কেন্দ্রে আসবে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *হেমন্ত যেখানে থাকে* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা। এই কাব্যগ্রন্থটির বেশ কিছু কবিতা শুধু যে মিশ্রবৃত্তে রচিত তাই নয়, এর শব্দচয়ন, বিষয়বস্তু এবং বাক্যশৈলির মধ্যে পাওয়া যায় জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। প্রথমে উল্লেখ করা যাক কাব্যগ্রন্থটির নাম-কবিতাটি।

" হেমন্ত যেখানে থাকে, / সেখানে কৌতুক থাকে গাছে/

সাড়া থাকে, সচ্ছলতা থাকে।//

মানুষের মতো নয়, / ভেঙে ভেঙে জোড়ার ক্ষমতা/

গাছেদের কাছে নেই//

হেমন্ত বার্ধক্য নিতে আসে//

খসায় শুকনো ডাল, / মরা পাতা, মর্কুটে বাকল/

এইসব।//

হেমন্ত দরোজা ভেঙে / নিয়ে আসে সবুজ নিঃশ্বাস...//

মানুষের মতো নয় / রক্তে পিত্তে সৌভাগ্যে সরল//

শিশুটির মতো রাঙা / ক্রন্দন ছিটিয়ে চারিপাশে//

হেমন্ত যেখানে থাকে, / সেখানে কৌতুক থাকে গাছে।।//"[২২]

জীবনানন্দের প্রিয় ঋতু হেমন্ত এখানে কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতাটি মিশ্রবৃত্তে রচিত। মুক্তকে নির্মিত কবিতাটির পঙ্‌ক্তির মাত্রাসজ্জা নিম্মরূপ-

৮+১০+১০=২৮

৮+১০+৮=২৬

১০

৮+১০+৪=২২

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

কবিতাটির শুরুর দিকে আমরা যেমন ২৮ বা ২৬ মাত্রার সুদীর্ঘ জীবনানন্দীয় পঙ্ক্তি পাচ্ছি, মধ্যে পাচ্ছি ২২ মাত্রার পঙ্ক্তি, তেমনি আবার শেষ চারটি পঙ্ক্তির মাত্রাসংখ্যা সমান- ১৮ মাত্রা।হেমন্তের উপস্থিতির কারণে গাছে কৌতুকের অবস্থান দাবি করলেও এই সুদীর্ঘ মিশ্রবৃত্তের চলন কবিতাটির মধ্যে সংযুক্ত করেছে এক জীবনানন্দ-সুলভ মনখারাপের মেজাজ।

শুধু এই কবিতাটিই নয়, এই কাব্যগ্রন্থের আরো বেশ কয়েকটি কবিতার মধ্যে এই অলস তানপ্রবণতা জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণকেই প্রমাণ করে। যেমন, ‘সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের’ শীর্ষক এই কবিতাটি-

“সমস্ত নক্ষত্র আজ /নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ//

বোঝাতে না পেরে যেন / আরো দূরে চলে যেতে থাকে//

অভিমানই এরকম / অঘটন ঘটাতে সক্ষম-//

এই ভেবে, মানুষেরও / বুক অভিমানে ভরে যায়//

মানুষ নক্ষত্র নয়, / নক্ষত্রের মতো দূরে নয়//

মানুষের মধ্যে তবু / নক্ষত্রপুঞ্জেরা খেলা করে।//

সেরকম খেলা থেকে / প্রাপণীয় সমস্ত বোধের//

জন্ম হয়, মৃত্যু হয় /- মানুষেরই মধ্যে যেতে থাকে//

মিশে, তা মাটিতে যেন, / শস্যে আর শ্যাওলার ভিতরে //

ক্ষিপ্র ছুঁচ ? কিন্তু সে তো / মেশে না মাটিতে-রক্তে-হাড়ে //

তাহলে ও ছুঁচ নয়, / গভীর ব্যাপক ম্লান প্রেম !//

কিশোরজীবনে শুধু / একবারই ছুঁয়ে যেতে আসে-/

অকারণে...//

সমস্ত নক্ষত্র আজ / নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ//

বোঝাতে না পেরে যেন / আরো দূরে চলে যেতে থাকে// ।।”[২৩]

এখানেও মহাপয়ার বন্ধের পঙ্‌ক্তি পাওয়া যাচ্ছে । একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি পঙ্‌ক্তিরই দৈর্ঘ্য সমান। আঠারো মাত্রার এই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির চলন ৮+১০।

এই প্রকার চলনের পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট আরো একটি কবিতার উদাহরণ ওই একই কাব্যগ্রন্থ থেকে-

"শব্দের নিজস্ব অনুতাপ / তাকে পুড়িয়েছে জ্বরে//
সে শুয়ে রয়েছে তার / চতুর্দিকে কমলার খোসা//
যেন সে নক্ষত্রহারা / তরুণের মতো লাল চুল//
কাঁধের উপরে ফেলে, / উদাসীন, পড়েই রয়েছে...//
এই পড়ে থাকা, এই / পর্যটন-বিমুখ আত্মার//
এই শুয়ে-বসে শুধু / জব্দ হওয়া, এই মর্চে-ধরা//
আকাশের নিচে থেকে, / বাতাসের ছোঁয়া লেগে এই//
মনপ্রাণ-সুদ্ধ ডুবে / যেতে চাওয়া মৃত্যুর গভীরে!//"[২৪]

এখানেও ১৮ মাত্রার দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধের পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

এরপর আমাদের আলোচ্য শক্তি রচিত সনেট গুলি। সারা জীবনে কবি প্রচুর সনেট রচনা করেছেন। বিচিত্রিতায় পূর্ণ তার ভাষা, বৈচিত্র্যে ভরা তার বিষয়। সেই সনেটের ছন্দরীতিই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আনন্দ থেকে প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র-৬* 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে সম্পাদক মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় লিখছেন-

> " তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন অনুশীলন করে প্রথমে ছন্দোবন্ধ লেখা তৈরি করা কবিতা রচনার প্রথম ধাপ।

‘ অনুশীলনকামী মাত্রের প্রতি আমার সাদর নির্দেশ হলো-অন্তত একশোটা সনেট লিখুন। তারপর নিজের পথ চোখের সামনে খুলে যাবে।’ তাঁর এই নির্দেশ শুধু কথার কথা ছিল না। নিজের অনুশীলনপর্বে সেই পান্ডুলিপির খাতা দুটি ভাগ্যে তিনি নষ্ট করেননি বা হারিয়ে ফেলেননি। সেই পান্ডুলিপিতে দেখা যায় সনেট রচনার আদর্শ সামনে রেখে ধ ন ন প মিলিয়ে ‘যম’ এবং আরও কয়েকটি সনেট লিখতে পেরেই তিনি মনে করেছিলেন এবারে তিনি কবি হিসাবে পরিচিত হতে পারেন।”[২৫]

আবার ওই একই গ্রন্থের এর ভূমিকায় মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় লিখছেন-

“ **১৯৮৯** সালে শক্তির পান্ডুলিপি থেকে শক্তির পরিত্যক্ত প্রায় সাড়ে তিনশো কবিতা নিয়ে ‘অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়’ প্রকাশিত হয়েছিল সমীর সেনগুপ্তের সম্পাদনায়। সেই পান্ডুলিপি তথা গ্রন্থ থেকেই তিয়াত্তরটি চতুর্দশপদী বেছে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন এই পান্ডুলিপির খাতা থেকেই একশোটি কবিতা বেছে নিয়ে শক্তি ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ প্রকাশ করেছিলেন। উভয়ের রচনাকাল একই”[২৬]

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি বিষয় উঠে আসছে। প্রথমত, সনেটগুলি লেখা হয়েছিল শক্তির কবিজীবনের প্রথম দিকে। উপরের গ্রন্থপরিচয়েরই অন্য একটি স্থানে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় লিখছেন-

" ১৯৫৭-৫৮ সালের কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে বাকি সব চতুর্দশপদীরই রচনাকাল ১৯৬১-৬৩ সাল।"[২৭]

আর দ্বিতীয়ত, একই সময়ের লেখা মোট ১৭৩ কবিতার কবি-নির্বাচিত একশোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* যা *পদ্যসমগ্র-১* এর অন্তর্গত আর অন্য ৭৩ টি কবিতা *চতুর্দশপদী* নাম দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে *পদ্যসমগ্র*-৬ এতে। অর্থাৎ প্রকাশকাল ভিন্ন হলেও কবিতাগুলির রচনাকাল একই।

এই কবিতাগুলি যেহেতু শক্তির কবিজীবনের প্রথম দিকের রচনা, ফলে কবিতাগুলিতে জীবনানন্দের প্রভাব অনেকাংশেই স্পষ্ট। যদিও একথা যেমন সব কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তেমনি আবার কোনো কবিতার পুরোটাই জীবনানন্দ-প্রভাবিত এমনও বলা যাবে না। তবে বেশ কিছু কবিতার বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি এবং শব্দগুচ্ছের মধ্যে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের পরশ যে রয়েছে একথা অনস্বীকৃত। এই অংশে সেই পঙ্‌ক্তি বা শব্দগুচ্ছ কিংবা চিত্রকল্প নয়, বরং ওই সনেটগুলির ছন্দের চলন কতটা জীবনানন্দ-প্রভাবিত ছিল, সেই আলোচনাই করা হবে। সুতরাং যে সব কবিতার শব্দচয়ন, চিত্রকল্প বা প্রায় সমগ্র

পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দ-প্রভাবিত সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে না, যদিও সেগুলি ছন্দের দিক থেকেও প্রবল ভাবে জীবনানন্দ-প্রভাবিত। অন্যত্র এগুলি আলোচিত হবে।

প্রথমে আলোচিত হবে *পদ্যসমগ্র-১* এর অন্তর্গত *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* -র কয়েকটি কবিতা। কোনো নির্দিষ্ট কবিতায় প্রবেশের আগে কয়েকটি কথা বলা দরকার যেগুলি সামগ্রিক ভাবে এই কবিতাগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। প্রথমত, প্রথা ভাঙায় সিদ্ধহস্ত কবি এখানেও সনেটের প্রথামাফিক গঠনকে সব সময় মেনে চলেন নি। দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কবিতাগুলিতে সনেটের দৃঢ় কাঠামো বা ঠাসবুনন অনুপস্থিত। বরং কবিতাগুলি জুড়ে রয়েছে একটা আলগা ভাব যা একমাত্র তুলনীয় জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা* -র কবিতাগুলির সাথে। আবেগের সংক্ষিপ্ততা নয়, আবেগের আতিশয্য মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে প্রথা বিরুদ্ধ ভাবে। এখানেও তুলনীয় সেই *রূপসী বাংলা* -ই। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও প্রকট। কোনো কোনো কবিতায় ঘটেছে অন্ত্যমিলের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এ ব্যাপারে জীবনানন্দও নয়, শক্তির একমাত্র তুলনা খোদ তিনিই। তাই যথোপযুক্ত কারণেই এই কবিতাগুলিকে ‘সনেট’ না বলে ‘চতুর্দশপদী’ বলা হয়েছে। এই কথাগুলি তার প্রায় সমস্ত চতুর্দশপদী কবিতা সম্পর্কেই খাটে। এবার কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক-

“ এইখানে একদিন / অসংখ্য বালিকা এসে / শুয়ে পড়েছিলো-//

এইখানে একদিন / অসংখ্য , একের পর, / একটি বালিকা//

শুয়ে কথা বলেছিলো, / ফুল যত ফুলেরে শুধায়-//

তেমনি অসংখ্য কথা, / এইখানে ওরা কয়েছিলো।//

আমিও ছিলাম তবে / বালিকার মতো মাথা দিয়ে//

নাতি-আলোকিত কোনো/ শিকড়ের মাটিতে-মাখানো//

এলানো হাতের ’পরে ; / ঘাঘ্‌রার ঔদাস্য সাজালে//

ওদেরি মতন বড়-/ঘর-ছেড়ে-আসা অভিমানে !/

সেই দিন হতে আর / একযোগে বালিকারা কেউ//

এইখানে আসে নাই, / শোয় নাই, বসে নাই, আহা//

একে একে আসিতেই / উহাদের ভালো লাগিতেছে//

উহাদের আর কোনো / সংঘ নাই, ভালোবাসা নাই//

মেয়েমানুষিতে হায় / উহাদের জব্দ করিয়াছে//

এইখানে একদিন// উহারা শুধায়েছিলো /‘বন্ধু’ সমস্বরে।।//”[২৮]

কবিতাটির মূলত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিগুলির (প্রথম, দ্বিতীয় আর শেষ পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী) মাত্রাবিন্যাস নিম্নরূপ-

৮+৮+৬=২২

৮+৮+৬=২২

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+১০=১৮

৮+৮+৬=২২

ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। প্রথম দুটি এবং শেষ পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিলে অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলির চলন দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধে। আর প্রথম দুটি ও শেষ পঙ্‌ক্তিটি সুদীর্ঘ ২২ মাত্রার, যার চলন মনে করায় *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলির চলনকে। অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে একে প্রায় অন্ত্যমিল বর্জিতই বলা চলে। একমাত্র প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল দেখা যায়। কবিতাটির মধ্যে ‘মেয়েমানুষি’, ‘কয়েছিলো’, ‘হায়’ এইসব শব্দ এবং প্রথম দুটি আর শেষ পঙ্‌ক্তিটি তুমুলভাবেই জীবনানন্দ-প্রভাবিত।

এরপর আসা যাক ১৩ সংখ্যক কবিতায়-

“ এখন পাতার শব্দে /জেগে উঠি, পাতার পতনে//

মনে হয় ওতপ্রোত / বক্ষোপরে তোমার পতন//

হয় নাথ! দাবানল / জ্বলে প্রতি বৃক্ষেরে ঘেরিয়া-//

মালা ব্যক্তিগত অয়ি, / শুধু জাগে গোলাপের ফাঁকি//

সমর্পণে। যদি যাও, / আমারে মাড়ায়ে যেও সখা//

ধূলায় ও বৃক্ষতলে / নীরবে, বিদায় যবে রাখি//

গিয়েছিলে-সে কি যাওয়া /? সে কি নয় অনন্ত-মগন ?//

পাতাগুলি ঝরে যায়, / জেগে উঠি শব্দে, শিহরনে।//

এখনি,আর-একবার / ডাক দিয়ে মিলাবো আঁধারে//

হে বন্ধু, প্রাণের ধন, / পুরাতন খেলার দোসর//

চলে গেলে দেখি ওই / পথ ধরে সুদূরে, একাকী-//

কাছে তো একান্তে ছিলে / বক্ষে মম, যবে বারে বারে//

বলিতে আপন নাম, / ধরায়ে দিতাম শত ফাঁকি-//

'ও তোমার নাম নয়, / ওগো তুমি চিরমেঘাবৃত !//'''[২৯]

কবিতার ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। পঙ্‌ক্তিগুলির চলন দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধে। অর্থাৎ সব কটি পঙ্‌ক্তিরই চলন ৮+১০=১৮। স্বাভাবিকভাবেই এই চলন মনে পড়ায় জীবনানন্দকে, যদিও এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিলে শব্দ চয়ন বা চিত্রকল্প নির্মাণ কোনোটিতেই জীবনানন্দের ছায়া পড়েনি।

এই কবিতাটিতেও অন্ত্যমিলের অপ্রতুলতা। একমাত্র একাদশ ও ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তিতেই পাওয়া যাচ্ছে অন্ত্যমিলের উপস্থিতি। অবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলি অন্ত্যমিল বিহীন।

অন্য একটি কবিতায় আসা যাক।

"এখনো যায়নি বেলা, / হাওয়া দেয় পশ্চিমা-তুফানি//

এ বন্দর ছেড়ে গেলে / বন্দর পাবে না বহুদিন//

গেলে কি জাহাজ ? ঘাট / ছেড়ে গেলে এখনো তো জানি //

আমারে জানাবে, যাই। / বেলা হলো চপলতাহীন।//

কোনখানে বেলা যায়, / কোনোখানে বেলা ফিরে আসে//

ছায়ায়-কপোলতলে / ভাগ্য খেলা করে মুহুর্মুহু//

কোমল বলের মতো / শৈশব জড়িয়ে থাকে ঘাসে//

বন্দরে, জাহাজঘাটে / মানবিক বিদায় মিহিন !//

বন্দরের মাঝখানে / ঘনবদ্ধ কাঠামো-বেষ্টিত//

দুর্দান্ত জাহাজ আছে /কোনো এক-তোমার চেহারা//

ওই জাহাজের মতো / হয়ে গেছে। বহুদিন পরে//

আ-পরিপ্রেক্ষিত প্রেম / কেঁপে ওঠো, হও রোমাঞ্চিত।//

বহুদিন পরে বলে / মনে হয় তুমিই জাহাজ//

বন্দরে, জাহাজঘাটে / প্রেত হয়ে বিচরণ করো!// ”[৩০]

এক্ষেত্রেও কবিতার ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত এবং আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিগুলির চলন দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধে। অর্থাৎ সব কটি পঙ্‌ক্তিরই চলন ৮+১০=১৮। অন্ত্যমিলের বিষয়টি এক্ষেত্রে

একটু অদ্ভুত। প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল ধ ন ধ ন তারপর পঞ্চম এবং সপ্তম পঙ্‌ক্তিতেই কেবল অন্ত্যমিল রয়েছে। অবশিষ্ট কবিতাটি অন্ত্যমিল বিহীন।

এরপর আসা যাক *পদ্যসমগ্র*-৬ এর অন্তর্ভুক্ত ‘চতুর্দশপদী-র অন্তর্গত দু-একটি কবিতার প্রসঙ্গে।

“অন্ধকারে ইতস্তত / ভ্রমণ করেছি মধ্যরাতে//
সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু ধরে / চলে গেছি যেখানে যাবার-//
চারজন ন্যাংটো হয়ে / বেশ্যাকেও করেছি লাঞ্ছিত-//
নীল আলো-মনে হয়, / সমুদ্রেরও দেয়াল উঠেছে।//
এখন বয়স থেকে / শাদা চুল বেছে নেয় যুবা-//
ইনফিউশন খেয়ে / রবীন্দ্রসংগীত উচ্চারণ//
করে, টপ্পা দেয়, বলে- / আধুনিক কবিতা কী ধীর,//
শান্ত ও তদ্গতভাবে / ছাপা হয় দেশ ও অমৃতে !//
সন্ধ্যায় ৬ টার পর / কোন-চোৎ কফি খায় রোজ//
কাঙাল মাগীকে যদি / ঘরে তুলি নতুন কাপড়ে//
ওয়ারিশান-বলে তুমি / বলবে নৈতিক পাঁচকথা।//

অন্ধকারে ইতস্তত / ভ্রমণ করেছি মধ্যরাতে

ট্যাক্সি ও জেব্রায় চড়ে / ভালোমানুষের মেয়েদের

বহুদূর ভালোবেসে, / বুকে ধরি বেশ্যা ও প্রবীণা।”[৩১]

কবিতার ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। পঙ্‌ক্তিগুলির চলন দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধে। অর্থাৎ সব কটি পঙ্‌ক্তিরই চলন ৮+১০=১৮। স্বাভাবিকভাবেই এই চলন মনে পড়ায় জীবনানন্দকে, যদিও এখানে প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি এবং শেষ স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তি বাদ দিলে শব্দ চয়ন বা চিত্রকল্প নির্মাণ কোনোটিতেই জীবনানন্দের ছায়া পড়েনি। কবিতাটি অন্ত্যমিল বিহীন। কবিতাটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি মনে করায় মধ্যরাতে কলকাতায় পথ হাঁটা সেই কবি জীবনানন্দকে। রাতের অন্ধকারে পথ হেঁটে শহরকে চিনে নেবার সুতীব্র বাসনা যেন কখন আত্ম অন্বেষণে পরিণত হয়ে যায় এই দুই কবির কাছেই।

এরপর আসা যাক অন্য একটি উদাহরণে-

“ এখন অনেক রাতে / জানালার প্রান্তে বসে আছো//

দেয়ালে তোমার ছবি / রবীন্দ্রনাথের, হাতে আঁকা//

সন্ধ্যাবেলা হতে দূরে / আমূল নক্ষত্র আছে জেগে//

তুমি যেন ভালোবাসো/ চাঁদের ভিতরে কোলাহল।//

বাসনার শেষ, সেকি / আলোকের নির্বাপণসম ?//

বাসনার শেষ, সেকি / হেমন্তের তীরে অশ্রুপাত//

বৃদ্ধার প্রভাতবেলা / দেয়ালের ফোটোগ্রাফ দেখে ?//

পাখিদের ক্রন্দনের / কারণ কে বলে বুঝিয়াছে//

অবুঝ সকলে নয়, / ধর্মপ্রাণ, সাশ্রু তো সবাই-//

কেবল আমার মনে / তোমার মূরতি ঝরে পড়ে।//

ক্ষমা নাই ? সুন্দরের / হাতে গড়া প্রদীপ যখন//

জড়ায়ে ধরেছি 'দয়া / করো' বলি তবু ক্ষমা নাই।”//[৩২]

এই কবিতাটিরও ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত এবং পঙ্‌ক্তিগুলির চলন দ্বিপদী মহাপয়ার বন্ধে। অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিগুলি ৮+১০=১৮ মাত্রার। এই কবিতাটিও অন্ত্যমিলবর্জিত। সমগ্র কবিতাটির মধ্যে দু-একটি স্থানে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ বেশ স্পষ্ট, যেমন-

“সন্ধ্যাবেলা হতে দূরে আমূল নক্ষত্র আছে জেগে”

কিংবা, “হেমন্তের তীরে”। যদিও ১৮ মাত্রার চলন ছাড়া কবিতাটির বাকি অংশে সেই অর্থে জীবনানন্দের প্রভাব পড়েনি। বরং শেষ পঙ্‌ক্তিতে “জড়ায়ে ধরেছি 'দয়া করো' বলি তবু ক্ষমা নাই।” উচ্চারণের সাথে সাথে যে আবেগের আতিশয্য দেখা যায়, তা সনেটের নিয়ন্ত্রিত আবেগের নীতির পরিপন্থী। এভাবেই শক্তি প্রচলিত সুরকে ভেঙেছেন বারে বারে- তৈরি করেছেন নিজের সুর, সফল অনুরণনের সাথে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে শক্তিকে আমরা কলাবৃত্ত কিংবা দলবৃত্তের সুদক্ষ কারিগর হিসেবে সাধারণত মনে করি, সহজ শব্দের স্রোতে যিনি ছন্দোবোধে লিরিক্যাল, মিশ্রবৃত্ত ছন্দে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি রচনা করে জীবনানন্দ-সুলভ তানপ্রবণতায় তিনি মোটেও কম যান না। আরও দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ-অনুসারী এই ছন্দ-মেদুরতা নির্মাণের প্রবণতা তাঁর কবি জীবনের শুরুর দিকেই সবচেয়ে বেশি ছিল। সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তকেই। তবু মাঝে মাঝেই পুরোনো প্রেম তাঁর জেগে উঠেছে মিশ্রবৃত্তের প্রতি, ফলে পাওয়া যাচ্ছে *হেমন্ত যেখানে থাকে*- র মতো কাব্যগ্রন্থ যেখানে আবার সিংহভাগ কবিতাই রচিত হচ্ছে মিশ্রবৃত্তে এবং পুনরায় দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দীয় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি রচনার প্রবণতা। চতুর্দশপদী কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যদিও এগুলির রচনাকাল কবির কাব্যজীবনের প্রথম দিকেই। শুধু এক্ষেত্রে জীবনানন্দের অন্ত্যমিলের প্রবণতাকে তিনি গ্রহণ করেন নি অধিকাংশ সময়ে। সব মিলিয়ে বলা যায় বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছন্দোশিল্পী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মিশ্রবৃত্তে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ বহুলাংশেই পড়েছে।

৪.১.২ অনন্ত নক্ষত্রবীথিঃ জীবনানন্দীয় পঙ্‌ক্তি ,উপমা ও চিত্রকল্পের প্রতিগ্রহণ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের একটি প্রধান দিক হল সরাসরি জীবনানন্দের কবিতার পঙ্‌ক্তিকে সামান্য পরিবর্তন করে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা। একে আন্তর্পাঠ বলা যেতে পারে। ইতিপূর্বে এই ধরনের পঙ্‌ক্তি-প্রয়োগ আমরা দেখেছি বিষ্ণু দে-র কবিতায়, যেখানে তিনি রবীন্দ্র-পঙ্‌ক্তিকে নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন বহুবার।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি দেখা যায় জীবনানন্দ-কবিতার পঙ্‌ক্তির পুনরুচ্চারণের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই পুনরুচ্চারণে কখনো জীবনানন্দের কবিতার সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তিটিকেই সামান্য বদলে ব্যবহার করা হয়েছে, কখনো সেই ব্যবহার আংশিক পঙ্‌ক্তিকে ঘিরে। তবে পূর্ণ কিংবা আংশিক- উভয় ক্ষেত্রেই শক্তির এই জীবনানন্দ-কবিতার পঙ্‌ক্তির পুনর্প্রয়োগকে নিছক অনুকরণের স্তর বলা যাবে না। কারণ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শক্তি পঙ্‌ক্তিটির এমন কিছু বদল ঘটিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে কবি শক্তির কবিশক্তির মুন্সিয়ানার একটি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ছাপ দেখা যায়। এছাড়া এই আন্তর্পাঠের ক্ষেত্রে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হল শক্তির কবিতার কালানুক্রমিক বিশ্লেষণে এই পুনরুচ্চারণের কোনো নিদির্ষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কন করা যায় না। অর্থাৎ, শক্তির কবিতায় জীবনানন্দ-কবিতার পঙ্‌ক্তির ব্যবহারের কোনো কালানুক্রমিক ধারাবাহিক লক্ষণ নেই। তাঁর সমগ্র কবিজীবন জুড়েই বিক্ষিপ্ত ভাবে জীবনানন্দ-কবিতার পঙ্‌ক্তির পুনর্ব্যবহার দেখা যায়। ‘এই শহরের রাখাল’ প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন-

" বাংলা কবিতায় জীবনানন্দকে প্রধান কবি হিসেবে আবিষ্কার আর আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন যাঁরা, শক্তি ছিলেন তাঁদের প্রধান একজন। কিন্তু এই সবই ছিল সচেতনভাবে নিজেকে গড়ে তুলবার কিছু প্রাথমিক উপাদান"[৩৩]

এবার আসা যাক এই আন্তর্পাঠের কয়েকটি উদাহরণের প্রসঙ্গে। প্রথমেই আলোচনায় নেওয়া হচ্ছে *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*- র কয়েকটি সনেট। যেমন-

" আবার জ্যোৎস্নায় ফিরে আসিব কি, আরো একবার

জ্যোৎস্নায়, আঁধারে নয়- অবাস্তব রূপালি জ্যোৎস্নায়

আবার আসিব ফিরে ? মনে পড়ে, মোটে সত্য নয়

এমন মিথ্যারে ভালোবাসিতাম দীর্ঘকাল ধরে"[৩৪]

বলাই বাহুল্য যে এখানে জীবনানন্দ দাশের *রূপসীবাংলা* কাব্যগ্রন্থের সেই বহুল প্রচারিত কবিতাটির জনপ্রিয় পঙ্‌ক্তির অংশ "আবার আসিব ফিরে" ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে কবিতাটির সেই অংশটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে-

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে- এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;

হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে

কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;" [৩৫]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনানন্দের বহু পরিচিত কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম তিনটি শব্দ অর্থাৎ "আবার আসিব ফিরে" অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে শক্তির আলোচ্য কবিতার তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম তিনটি শব্দ হিসেবে। যদিও শব্দ তিনটি গ্রহণের সময়ে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি কিন্তু উভয় কবিতার মধ্যে তিনটি শব্দ মিলিয়ে তৈরি হওয়া বাক্যদুটির মধ্যে পার্থক্য রচনা করে দিয়েছে একটি যতিচিহ্ন। জীবনানন্দের কবিতায় বাক্যটির শেষে কোনো যতিচিহ্ন নেই, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে বাক্যটি বিবৃতিমূলক অর্থাৎ এখানে কবির কাছে তাঁর নিজের ফিরে আসার মধ্যে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু শক্তির কবিতায় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার বাক্যটিকে বিবৃতিমূলক থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করেছে। এখানে ফিরে আসার ব্যাপারে কবি নিজে সংশয়ী। তাঁর এই সংশয় ধরা পড়েছে শক্তির কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম অংশ থেকেই-

"আবার জ্যোৎস্নায় ফিরে আসিব কি"-

এখানে 'কি' শব্দের প্রয়োগ বাক্যটিকে করে তুলেছেন সংশয়ী। ফলে দেখা যাচ্ছে এখানে শক্তির কবিতায় কবি সংশয়ী ফিরে আসা নিয়েই, আর জীবনানন্দের কবিতায় কবির ফিরে আসা নিয়ে সংশয় না থাকলেও কবি দ্বিধাগ্রস্থ প্রত্যাবর্তনের রূপ নিয়ে। এখানেই শক্তির কবিতাটি জীবনানন্দের কবিতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, 'জ্যোৎস্নায়', 'আঁধারে' 'রূপালি জ্যোৎস্নায়'- প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ কবিতাটির এই অংশে এনেছে এক আশ্চর্য জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। শব্দপ্রয়োগজনিত সাদৃশ্যের পাশাপাশি বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রেও এসেছে জীবনানন্দীয় প্রতিগ্রহণ। জীবনানন্দের কবিতায় বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ শৈলী দেখা যায়- যা এই কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে অনুসরণ করা হয়েছে। সেটি হল একটি বিবৃতিমূলক বাক্যের বদলে প্রশ্নবোধক সংশয়াত্মক বাক্য রচনা করে সেটিকে একাধিকবার ব্যবহার করে যেন সংশয়কে নিশ্চিহ্ন করে বিবৃতিটিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অসংখ্য কবিতায় এই শৈলীর প্রয়োগ চোখে পড়ে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ্য করা হল-

"ফণীমনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি ?- আছে ; মনে হয়,
এ নদী কি কালীদহ নয় ? আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি ? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব ;- তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।"[৩৬]

এরপর আসা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্য একটি কবিতার উদাহরণের প্রসঙ্গে। পদ্যসমগ্র- এর অন্তর্গত *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* গ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক সনেটটির আংশিক উল্লেখ করা হল-

" মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের ঘরে ফেরে নাই

উহারা জেব্রার পার্শ্বে চরিতেছে। বাইশ জেব্রায়,
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে
কালের কাঁটার মতো, ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন
চরিয়া বেড়ায় ওরা-কথা কয়- কী কথা কে জানে ?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না এ তো মনে হয়
আরো বহু কথা মনে হয়, শুধু বলিতে পারি না।
বাইশটি জেব্রা কি তবে জেব্রা নয় ? ময়ুরপঙ্খীও
হতে পারে এই ভৌত সামুদ্রিক জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
বামনের বিষণ্নতা বহে নেয় ও কি নারিকেল
ও কি চলচ্ছবিগুলি লাফাতে লাফাতে চলে যাবে ?
ও কি মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?
অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায় ।। ”[৩৭]

এই কবিতাটি আলোচনা করার পূর্বে জীবনানন্দ দাশের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঘোড়া' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

" আমরা যাইনি ম'রে আজো- তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়ঃ

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন- এখনো ঘাসের লোভে চরে

পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;

বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;

চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো- ঘুমে- ঘেয়ো

কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও- পাশের পাইস্- রেস্তরাঁতে,

প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে

সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;

এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।"[৩৮]

উপরের দুটি কবিতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলে প্রথমেই বলা যায় সংরূপগত ভাবে কবিতাদুটি ভিন্ন। জীবনানন্দের কবিতাটিতে পঙ্ক্তি সংখ্যা ১২ সুতরাং এর সনেট হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অন্যদিকে শক্তির কবিতাটি শুধু যে চতুর্দশপদী বা চোদ্দ পঙ্ক্তির- তাই নয় বরং গাঠনিক দিক থেকেও এটি একটি সনেট হবার কিছুটা হলেও দাবি রাখে। যদি সনেটকে “monument of moments” বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে দেখব ভাবগত দিক থেকেও এটিকে সনেট বলে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু পরিপূর্ণভাবে সনেট হবার পথে কবিতাটির গঠনগত দিক থেকে একটি প্রধানতম অন্তরায় রয়েছে৷ তা হল কবিতাটির অন্ত্যমিলহীনতা। আমরা জানি সনেটের পঙ্ক্তিগুলি অন্ত্যমিলযুক্ত এবং এই অন্ত্যমিলের প্রশ্নে অষ্টক এবং ষটক অংশের মধ্যে ভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। আলোচ্য কবিতাটি সম্পূর্ণভাবেই অন্ত্যমিল বর্জিত। সুতরাং *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* -র অন্তর্গত হলেও প্রথাগতভাবে একে সম্পূর্ণ সনেট বলার ক্ষেত্রে কিছু বাধা রয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে জীবনানন্দের কবিতাটিও “monument of moments” হলেও সনেটের কোনো বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে দেখা যায় না। সুতরাং দুটি কবিতাই সনেট নয়।

এবার আসা যাক কবিতাদুটির মধ্যের শব্দ এবং বিষয়গত সাদৃশ্য প্রসঙ্গে।দুটি কবিতাই জ্যোৎস্নায় মাঠের মধ্যে ঘোড়া চরে বেড়ানোর দৃশ্যের সাক্ষী এবং উভয় ক্ষেত্রেই সেই ঘোড়ার মালিক একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ মহীন। জীবনানন্দের কবিতায় শুধু ঘোড়া চরে বেড়ালেও শক্তির কবিতায় সেই ঘোড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জেব্রা। আরো ভাল করে বললে শক্তির কবিতায় জেব্রাই প্রধান। কবিতার শুরুতে মহীনের ঘোড়াগুলি এখানে “জেব্রার

পার্শ্বে চরিতেছে ”[৩৯]। তারপর যত এগিয়েছে কবিতা ক্রমশ ঘোড়া আর জেব্রার ব্যবধান যেন মুছে গেছে। কবিতাটির শেষের দিকে তো কবি শক্তি ঘোড়াগুলিকেই মনে করেছেন জেব্রা। প্রবল সংশয়ী চিত্তে সন্দেহ অলংকারের সার্থক প্রয়োগে কবি বলে ওঠেন-

“ও কি মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?”[৪০]

আর তারপরই তিনি সফলভাবে নির্ণয় করেন এই সংশয়ের কারণ-

“অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায় ”[৪১]

প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটিকে জীবনানন্দের উপরিউক্ত কবিতার আন্তর্পাঠ হিসেবে দেখানো যায় কারণ প্রথমত জীবনানন্দের কবিতাটি পাঠ না করলে এই কবিতার বয়ান পাঠকের কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবে না। অবশ্যই পাঠক জীবনানন্দের কবিতাটি না পড়েও এর রসাস্বাদন করতেই পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে কবিতাটির বয়ানের একটা অংশ যেন পাঠকের কাছে রয়ে যাবে অজানা। কবিতাটি শুরুই হচ্ছে এমনভাবে, যেন কবি ধরেই নিয়েছেন পাঠক জীবনানন্দের কবিতাটি পড়ার পরেই তাঁর কবিতাটি পড়তে বসেছেন। উভয় কবিতার মধ্যেই একটা পরাবাস্তব পরিবেশের আঘ্রাণ মিশে আছে। যে আঘ্রাণে জীবনানন্দের কবিতায় “প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া”[৪২] চরে বেড়ায় ঘাস খাবার লোভে, চরে বেড়ায় “পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর ’পরে ”[৪৩], সেই একই পরাবাস্তবতায় শক্তির কবিতায় মিশে যায় ঘোড়া আর জেব্রা কিংবা ঘোড়াকে মনে হয় ময়ুরপঙ্খী। এখানেই উভয় কবিতার সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবার আসা যাক এইরকম আর একটি কবিতার উদাহরণে যেখানে জীবনানন্দের একটি নির্দিষ্ট কবিতার শক্তি কর্তৃক প্রতিগ্রহণের ছাপ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এখানেও একটি নির্দিষ্ট কবিতার সুস্পষ্ট আন্তর্পাঠের পরিচয় মিলেছে। এবার প্রথমে উল্লিখিত হবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত কবিতাটি-

“মালবিকা অইখানে যেওনাকো তুমি,

কথা কয়োনাকো অই যুবকের সাথে,

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে ?

মালবিকা জানো তুমি ঘাসে কি লবণ ?

সামনে দেওদার বন, আমি বসে আছি।

ফিরে এসো মালবিকা কী সুস্বাদ এখানে, জীবনে-

ফিরে এসো মালবিকা যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর,

শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ-

ফিরে এসো মালবিকা,

ও পলাশে তোমাকে সাজাবো ;

রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো ;

ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো।

ফিরে এসো মালবিকা,

যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।

এখানে মন্দির-মেঘে আশ্চর্য ঝংকার-

ফিরে এসো মালবিকা, ইচ্ছে করো, এখনই এসো !”[৪৪]

এরপর উল্লেখ করা হবে জীবনানন্দের ‘আকাশলীনা’ শীর্ষক কবিতাটি। প্রসঙ্গত বলা যায় এটি *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা-

“ সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,

বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে

ফিরে এসো সুরঞ্জনা ;

নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;

ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;

দূর থেকে দূরে- আরো দূরে

যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !

আকাশের আড়ালে আকাশে

মৃত্তিকার মতো তুমি আজ ;

তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,

তোমার হৃদয় আজ ঘাস ;

বাতাসের ওপারে বাতাস

আকাশের ওপারে আকাশ।” [৪৫]

উভয় কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলতে হলে খুব বেশি গভীরে যাবার প্রয়োজন নেই। প্রাথমিকভাবে কবিতাদুটি একসাথে পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যায় শক্তির কবিতাটি জীবনানন্দ দাশ রচিত ‘আকাশলীনা’ কবিতা থেকেই প্রতিগৃহীত হয়েছে। উভয় কবিতাতেই উত্তম পুরুষ বাচনে একজন নারীকে অনুরোধ করা হচ্ছে কোনো এক যুবকের সাথে না যেতে। দুটি কবিতার বক্তব্য থেকেই একথা সুস্পষ্ট যে ঐ নারী কবির প্রাক্তন প্রেমিকা। বর্তমানে তার অন্য এক যুবকের সাথে প্রেম। এই প্রেমিক-যুগলকে অভিসারে যেতে দেখে কবির মন উচাটন হয়ে উঠেছে। কবি নিবিড় নিঃশ্বাসে ফিরে পেতে চাইছেন

তাঁর প্রেমিকাকে। প্রেমিকাকে নতুন প্রেমিকের সাথে দেখে গভীর অসূয়ায় ভরে উঠেছে দুই কবিমন। তাই উভয় কবিতাতেই একটি সাধারণ পঙ্‌ক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে-

"কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে ?"[৪৬]

শুধু তাই নয়, শক্তির কবিতাটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তির সাথে জীবনানন্দের কবিতাটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি প্রায় হুবহু মিলে যায়। শুধু জীবনানন্দের 'সুরঞ্জনা' এখানে হয়েছে 'মালবিকা'। প্রেমিকার নাম বাদ দিলে এই দুই কবিতার মধ্যে এমন আশ্চর্য মিল যে অনায়াসে আন্তর্পাঠের সীমানা অতিক্রম করে শক্তির কবিতা "ফিরে এসো মালবিকা" কে জীবনানন্দের "আকাশলীনা" কবিতার অন্ধ অনুকরণ বলে দাগিয়ে দেওয়াই যেত, যদি না শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার এই অংশটি পাওয়া যেত-

"শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ-

ফিরে এসো মালবিকা,

ও পলাশে তোমাকে সাজাবো ;

রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো ;

ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো। "[৪৭]

এই অংশটি দিয়ে শক্তি জীবনানন্দের কবিতা থেকে সরে এসেছেন। ফিরে গেছেন তার নিজস্ব জগতে। জীবনানন্দের কবিতায় কবি জানেন তাঁর প্রবল আকুতি সত্ত্বেও সুরঞ্জনা ফিরে আসবেন না। তাঁর অনুরোধ একান্তই নিষ্ফলা। তাই তিনি লেখেন-

"সুরঞ্জনা,

তোমার হৃদয় আজ ঘাস ;

বাতাসের ওপারে বাতাস

আকাশের ওপারে আকাশ"[৪৮]

এই পঙ্‌ক্তিগুলি হারিয়ে ফেলা প্রেমের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভরা। চিরবিরহের বেদনা যেন ভরে আছে পঙ্‌ক্তিগুলিতে। কিন্তু তার পাশাপাশি পঙ্‌ক্তিগুলিতে আবেগের আতিশয্য কম বরং সংযম অনেক বেশি। কিন্তু শক্তি সে তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ এবং আশাবাদী। তাই কবিতার শেষে এসেও তিনি মালবিকাকে বলতে পারেন-

"এখানে মন্দির-মেঘে আশ্চর্য ঝংকার-

ফিরে এসো মালবিকা, ইচ্ছে করো, এখনই এসো !"[৪৯]

এইরকম ক্ষীণতর আশাবাদে উত্তরণের মধ্যে দিয়েই যেন শেষ হয় কবিতাটি। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকাকে ফিরে আসার যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন শক্তি, আশা ছাড়ছেন না তার ফিরে আসার। অন্যদিকে জীবনানন্দের "আকাশলীনা" কবিতার শেষে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এক

আশ্চর্য হাহাকারভরা চিরবিরহের বিষণ্ন তান। গভীরতার দিক থেকে তা অনেক বেশি গভীর ও ব্যাকুল। এখানেই শক্তির কবিতাটি জীবনানন্দের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাই 'ফিরে এসো মালবিকা' শীর্ষক কবিতাটিকে 'আকাশলীনা' কবিতার অন্ধ অনুকরণ নয় বরং প্রতিগৃহীত আন্তর্পাঠ বলাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

এরপর আসা যাক অন্য একটি কবিতার উদাহরণে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটিকেও জীবনানন্দের একটি কবিতার প্রত্যক্ষ প্রতিগ্রহণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সরোজিনী বুঝেছিল' শীর্ষক এই কবিতাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল-

" দুপুর আঁধার ঘর- মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ

সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস

হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে

মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?

মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা

সরোজ ঘরেই ছিলো-শুধু তার চোখ মেলে দেখা

এইসব হাঁসেদের- বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে

জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে- ফাঁসে- কাপড়ের প্রেমে

শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়

সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।।”[৫০]

২৭ মার্চ, ১৯৬৫ সালের *দেশ* পত্রিকাতে প্রকাশিত এই কবিতাটির সাথে যদি জীবনানন্দ দাশের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের ‘সপ্তক’ কবিতাটিকে পড়া যায়, তাহলে দেখা যাবে উভয় কবিতার মধ্যে আপাত মিল একটিই। সেটি হল ‘সরোজিনী’ নাম্মী একটি মেয়ে এবং তার মৃত্যুকথা। জীবনানন্দের কবিতায় যেখানে মৃত্যু-পরবর্তী সরোজিনীর সমাধির কথা বলা হচ্ছে সেখানে পরবর্তীকালে লিখিত হলেও শক্তির কবিতায় যেন জীবনানন্দের কবিতার প্রাক-ভাষণ রচিত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে সরোজিনীর মৃত্যু দৃশ্য বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে সরোজিনীর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহননের কাহিনি। আলোচনার সুবিধার্থে জীবনানন্দের কবিতাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল-

“ এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,-জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।

অনেক হয়েছে শোয়া; তারপর একদিন চ’লে গেছে কোন্ দূর মেঘে।

অন্ধকার শেষ হ’লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :

সরোজিনী চ’লে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া-পাখিদের মতো পাখা বিনা ?

হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির

ভূত বলে : আমি তো জানি না।

জাফরান আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :

লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে। ”[৫১]

সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থের অন্য কিছু কবিতার মতো এই কবিতার মধ্যেও একটা পরাবাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, - বিশেষত শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে। যদিও জীবনানন্দের কবিতায় পরাবাস্তব পরিবেশের বিশ্লেষণ করা এই গবেষণাপত্রের কাজ নয়, তবু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শক্তির কবিতার মধ্যে এই পরাবাস্তব পরিবেশের ‘ততদূর উজ্জ্বলতা নেই’। আপাতত এই পরাবাস্তবতাকে যদি দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে দেখব এই কবিতায় সরোজিনীর মৃত্যু বহু আগেই ঘটে গিয়েছে। তার সমাধিতে দাঁড়িয়ে কবির মনে তাই সংশয় জেগেছে যে আদৌ এখনো সরোজিনীর আত্মা এই স্থানেই আটকে আছে কিনা। অনেকদিন পূর্বেই যেহেতু তার মৃত্যু ঘটেছে তাই হয়তো সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে সে মুক্তি লাভ করে চলে গিয়েছে বহুদূর- আরো স্পষ্টভাবে বললে আকাশের অনেক উঁচুতে। গোটা কবিতার মধ্যে কোথাও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে হয় নি। কিন্তু সমগ্র কবিতার ভিতরে কোথায় যেন বহুকাল পূর্বে মৃত সরোজিনীর জন্য এক অনন্ত বেদনার ঘ্রাণ মিশে গেছে।

অপর দিকে শক্তির কবিতাটি যেন এই কবিতাটির পূর্বকথন। ওই কবিতাটির এখানেই অভিনবত্ব যে একটি পঙ্‌ক্তি ছাড়া কোথাও সরোজিনীর মৃত্যুর সামান্যতম ইঙ্গিতও বোঝানো হয়নি।

“ জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে- ফাঁসে- কাপড়ের প্রেমে”[৫২]- এই একটি মাত্র পঙ্‌ক্তির মাধ্যমেই কবি সমগ্র কবিতার আবেদনকেই বদলে দিতে পেরেছেন। এখানেই কবি শক্তির কবিতা নির্মাণের শক্তি। এই পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করার পরে কবিতাটিকে পুনর্বার পড়লেই তখন আরো কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে লুক্কায়িত মৃত্যুর দ্যোতনাকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়। যেমন-

“ মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?”[৫৩]

কিংবা,

“ সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।।”

৫৪

অথচ, ওই পঙ্‌ক্তিটি না থাকলে উপরের শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে মৃত্যুর দৃশ্যকল্প উপস্থিত- একথা ভাবাই দুষ্কর।

সুতরাং বলা যেতে পারে এই কবিতাটিও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনানন্দের কবিতার এক বিশেষ ধারার প্রতিগ্রহণ অর্থাৎ আন্তর্পাঠের একটি আদর্শ উদাহরণ।

এই পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত যে কবিতাগুলি আলোচনা করা হল সেগুলি প্রতিটিই জীবনানন্দের এক একটি নির্দিষ্ট কবিতার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত এবং উভয় কবিতার মধ্যে পঙ্‌ক্তিগত মিল প্রায় অনুকরণের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবু এইসব কবিতায়

শক্তির জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের সংরূপকে শক্তির জীবনানন্দ-অনুকরণ (Imitation) না বলে আন্তর্পাঠ (Intertextuality) বলে চিহ্নিত করায় শ্রেয় বলে মনে হয়েছে কারণ কবিতাজোড়গুলির মধ্যে অর্থাৎ জীবনানন্দের উৎস-কবিতাটির সাথে শক্তির প্রতিগৃহীত কবিতাটির যতই পঙ্ক্তিগত সাদৃশ্য থাকুক না কেন, জীবনানন্দের কবিতাটি থেকে যাত্রা শুরু করে শক্তি থেমেছেন বহুদূরে গিয়ে। উভয় কবিতার মধ্যে দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মতো দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকেনি বরং অধিবৃত্তের মতো সেই ব্যবধান ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে বেড়েই গিয়েছে। জীবনানন্দের পঙ্ক্তি সম্পূর্ণ অবিকৃত বা আংশিক পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েও শক্তির কবিতাটি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রেক্ষিত। এখানেই শক্তির সার্থকতা।

এরপর আলোচনা-কেন্দ্র সরে আসবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এমন কিছু কবিতার উদাহরণে যেগুলির মধ্যে জীবনানন্দের এক বা একাধিক কবিতার এক বা একাধিক পঙ্ক্তি কিংবা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি এমন কিছু শব্দ বা চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি জীবনানন্দের কোনো নির্দিষ্ট কবিতার অংশ হিসেবে পরিচিত না হলেও তাদের প্রসিদ্ধি রয়েছে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের সদস্য হিসেবে। শক্তির কবিতার মধ্যে এই শব্দগুলির অস্তিত্ব নিয়ে বিশ্লেষণের একটা বড় সমস্যা হল এই যে, এই জীবনানন্দীয় শব্দ বা চিত্রকল্পের অস্তিত্বের অবস্থান শক্তির কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট কালানুক্রমিক বা বিষয়ভিত্তিক প্যাটার্ন মেনে চলেনি। ফলে কবির সুবিশাল কাব্যজগতের মধ্য থেকে কিছু উদাহরণ তুলে আনার প্রয়াস একান্তভাবেই বিক্ষিপ্ত ধাঁচানুসারী বলে মনে

হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এব্যাপারে ভিন্ন পথের অনুগমন নিতান্তই অসাধ্য। শক্তি অসংখ্য কবিতায় জীবনানন্দের কবিতার অংশ বিশেষ কিংবা কিছু শব্দ গ্রহণ করলেও নিজের কবিতাকে নিয়ে যেতে পেরেছেন এমন এক ভিন্ন রাস্তায় যে তাকে জীবনানন্দের অনুকরণ বা অনুসরণ নয় বরং প্রতিগ্রহণ বলাটাই যুক্তিসম্মত। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক **১৯৮০** সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *মন্ত্রের মতন আছি স্থির* এর অন্তর্গত নাম-কবিতার কিছু অংশ-

" কমলালেবুর মতো হয়ে আছি রোগীর শিয়রে

আরোগ্যের কথা ভেবে, পরিত্রাণময় যন্ত্রণার

কথা ভেবে কমলার মতো হয়ে রোগীর শিয়রে"[৫৫]

এই পর্যন্ত পড়লেই পাঠকের মনে অবধারিতভাবে স্মৃতিচারণ ঘটবে জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের নিম্নলিখিত 'কমলালেবু' শীর্ষক কবিতাটির কথা-

" একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব

আবার কি ফিরে আসবো না আমি পৃথিবীতে ?

আবার যেন ফিরে আসি

কোনো এক শীতের রাতে

একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে

কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।”[৫৬]

এখানে দেখার বিষয় এই যে দুটি কবিতার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য অনেক। প্রথম কবিতা অর্থাৎ, শক্তি রচিত কবিতাটিতে কবি রোগীর মাথার কাছে কমলালেবু হয়েই আছেন আর দ্বিতীয় কবিতা অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিতাটির মধ্যে রয়েছে যে পুনর্জন্মের প্রত্যাশা, পুনরায় এই মরজগতে ফিরে এসে প্রিয়জনের রোগশয্যার পাশে কমলালেবু হাতে দাঁড়ানোর যে আকুল আকুতি- তা শক্তির কবিতায় অনুপস্থিত। কিন্তু উভয় কবিতার মধ্যে একটা সাধারণ শব্দ রয়ে গেছে। তা হল- কমলালেবু। শুধু শব্দের অভিধার্থে নয় বরং উভয় কবিতাতেই কমলালেবু শব্দের ব্যঞ্জনার্থ একই। বলাই বাহুল্য যে সেই ব্যঞ্জনার্থ ‘কমলালেবু’ শব্দটিকে দান করে প্রিয়জনের আরোগ্য কামনার সক্ষমতা। তাই এক্ষেত্রে শক্তির এই শব্দের প্রয়োগের বিষয়ে যে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ রয়েছে, সে কথা স্পষ্ট। কিন্তু জীবনানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে শক্তি সরে গেছেন জীবনানন্দ থেকে দূরে-

“আছি দীর্ঘকাল ক্ষুব্ধ ডাক্তারের মতো

বৃদ্ধ হয়ে আছি ঐ ডাক্তারের মতো

যুবতীর কাছে আছি ডাক্তারের মতো

-যে কাঁদে কাঁদুক, আমি মন্ত্রের মতন আছি স্থির।”[৫৭]

সুতরাং এক্ষেত্রে একে প্রভাব বা প্রতিগ্রহণ না বলে প্রতিগ্রহণ বলাই যুক্তিযুক্ত। আবার, *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে* কাব্যগ্রন্থের সমনামী একমাত্র দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নিম্মলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, যার মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব বেশ স্পষ্ট-

"কাছে দূরে অবিরাম গ্রামপতনের শব্দ হয়!"[৫৮]

কিংবা,

"গরুর গাড়িটি কার বসে আছে বিষণ্ন বাতাসে?"[৫৯]

অথবা,

"বাংলাদেশ ছেড়ে আমি গিয়েছি নক্ষত্রে বারবার"[৬০]

কিংবা,

"মানুষের বেঁচে থাকা- মানুষের শান্তি পাওয়া শুধু-মনে হয়
মারা গেলে? শান্তি নেই-ক্ষুধাতৃষ্ণা যৌনের অতীত হতে পারে-
হয় নাকি? ভূতের সংযোগ তবে নেই প্রেতিনী নিমার সাথে?
নেই নাকি বিবাহবিচ্ছেদ সেই দেশে? -মানুষেরা জানে।
মানুষের বেঁচে থাকা- মানুষের শান্তি পাওয়া শুধু-মনে হয়
গণ-আন্দোলন করে বাঁচা নাকি সম্ভব বিদেশে !"[৬১]

উপরের চারটি উদাহরণের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। দ্বিতীয় উদাহরণে বাতাসের বিশেষণ হিসেবে 'বিষণ্ন' শব্দের উপস্থিতি পঙ্‌ক্তিটিকে জীবনানন্দীয় করে তুলেছে। আর তৃতীয় উদাহরণে সেই একই ভূমিকা নিয়েছে 'নক্ষত্র' শব্দটি। প্রথম উদাহরণটি তো প্রায় সরাসরি জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তির অনুকরণ। মূল জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিটি হল-

"দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;

গ্রামপতনের শব্দ হয় ;"[৬২]

চতুর্থ উদাহরণটিকে সরাসরি ভাবে কোনো নির্দিষ্ট জীবনানন্দের কবিতার পঙ্‌ক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না একথা সত্য কিন্তু পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে জীবনানন্দের প্রভাব বর্তমান। এর একটি কারণ হল এই যে এখানে বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিবৃতিমূলক বাক্য ব্যবহার করার পর সেই বাক্যস্থিত বিবৃতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য একটা প্রশ্নবোধক বাক্য এমনভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে যার উত্তর প্রশ্নকর্তার জানা। এই বাক্যবিন্যাস তুমুলভাবেই জীবনানন্দীয়। তাই পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করে পাঠকের প্রত্যাশার দিগবলয়ে জীবনানন্দের কাব্যজগত ভেসে আসবে। আর তাছাড়া কাব্যগ্রন্থটির নামটিও জীবনানন্দ দাশের *বেলা অবেলা কালবেলা* কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তির অংশ। মূল কবিতাটি হল-

"হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে

তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।” [৬৩]

এরপর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যজগত থেকে এমন কিছু পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক উদ্ধৃত করা হবে যেগুলির সবকটি যে কোনো না কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবনানন্দের কবিতা থেকেই গৃহীত হয়েছে তা নয় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট একটি জীবনানন্দের কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত না হলেও সেগুলির সবগুলির মধ্যে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণের ছাপ সুস্পষ্ট। নিচে পরপর সেরকম কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হল-

“তোমাকেই মনে পড়ে আজ নীল হেমন্তের রাতে

মাথার উপর

চাঁদের অসংখ্য চালাঘর

তুমি বলেছিলে- ঐ দেশ

একদিন হবে নির্বিশেষ

তব রাজধানী

সেদিনের কথা চাঁদ নিয়ে করে আজো কানাকানি !”[৬৪]

উপরের কবিতাটির সাথে কোনো একটি নির্দিষ্ট জীবনানন্দের কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না, একথা সত্য। কিন্তু কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির ওই “আজ নীল হেমন্তের রাতে”- স্পষ্টতই মনে পড়াচ্ছে জীবনানন্দকে। তার প্রধানত দুটি কারণ- একটি হল ‘হেমন্ত’ আর

অপরটি হল সেই হেমন্তের রাতের বিশেষণ হল ‘নীল’। হেমন্তের প্রতি জীবনানন্দের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা কাব্যপ্রেমীমাত্রেরই জানা। তার ওপর যদি সেই হেমন্তের বিশেষণের কোনো নির্দিষ্ট রঙ থাকে এবং সেই রঙ যদি হয় নীল, তাহলে অবধারিতভাবেই তাকে জীবনানন্দের প্রভাব বলাই যায়। যদিও কবিতাটির পরবর্তী অংশে কবি বিষয়গত ভাবে দূরে সরে গেছেন কিন্তু সংরূপগত ভাবে আবার কাছাকাছি এসেছেন। আরও স্পষ্টভাবে বললে অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রেও কবি এখানে জীবনানন্দ-অনুসারী। একটা ভাব এবং সংরূপগতভাবে কাছাকাছি জীবনানন্দের কবিতা উদাহরণ নেওয়া যাক-

“আজ এই বসন্তের রাতে

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে

ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,

স্কাইলাইট মাথার উপর,

আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।”[৬৫]

উপরের পঙ্‌ক্তিগুলি জীবনানন্দের বিখ্যাত ‘পাখিরা’ কবিতা থেকে গৃহীত। শক্তির কবিতাটির সাথে এর বিষয়গত পার্থক্য থাকলেও কোথাও একটা সংরূপগত সাদৃশ্য রয়ে গেছে। হেমন্ত আর বসন্তের রাতের শাব্দিক সাদৃশ্য হয় তো এর জন্য দায়ী। তার পাশাপাশি অন্ত্যমিল এবং অসম মাত্রার ছত্রের প্রয়োগ উভয় কবিতাকে সদৃশ করে তুলেছে।

এরপর উল্লিখিত হচ্ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পাখি' কবিতাটি-

"বৃষ্টি নেই হাওয়া নেই আপাতত পৃথিবী নীরব।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা
দেয়ালে বিরস নীল গলিত গন্ধের স্রোত, শব
ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমরা বিধবা।
আর কেউ পাশে নেই, বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই ঘরে,
ভালোবাসা নেই তার, সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝরে ঝরে
উজ্জ্বল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেলো, পরে
বৃষ্টি এলো, হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।"[৬৬]

উপরের কবিতাটির মধ্যে একমাত্র 'শঙ্খমালা' ছাড়া আর কোনো শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে জীবনানন্দের কোনো কবিতাকে সম্পর্কিত করা যায় না। আর যদি 'সমুদ্রগ্রীবার' শব্দটিকে কেউ জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার 'উটের গ্রীবার সাথে সদৃশ মনে করেন, তাহলে তালিকাটি সামান্য বেড়ে হবে দুই। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ ভীষণ ভাবেই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে মনে হয় 'পৃথিবী' শব্দটির তিনবার প্রয়োগের ফলে কবিতাটির মধ্যে যে ভাবগত বিশ্বজনীনতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণেই কবিতাটিকে ভাবের দিক থেকে জীবনানন্দীয় কাব্যপরিমন্ডলের অংশ বলে

মনে হচ্ছে। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জীবনানন্দের কোনো কবিতার পঙ্ক্তি এখানে ব্যবহৃত হয় নি।

এছাড়া আরো বেশ কিছু কবিতার উদাহরণ দেওয়া যায়, যার মধ্যে, হয় জীবনানন্দ রচিত কোনো কবিতার পঙ্ক্তির অংশবিশেষ একটু পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়েছে, না হয় জীবনানন্দীয় আঘ্রাণযুক্ত শব্দের ব্যবহারে সমগ্র কবিতাটি জীবনানন্দীয় হয়ে উঠেছে। যেমন-

"সন্ধ্যা হলে চারিদিকে খেলা-করা বিষণ্ন বাতাসে"[৬৭]

এই পঙ্ক্তির সাথে রূপসী বাংলার এই কবিতার প্রথম পঙ্ক্তিটির প্রথম তিনটি শব্দের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়-

" সন্ধ্যা হয়- চারিদিকে শান্ত নীরবতা"[৬৮]

কিংবা, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-র

" আমার হৃদয়ে আজ কোনোরূপ নির্জনতা নেই"[৬৯]

এই পঙ্ক্তিতে 'হৃদয়ে', 'কোনোরূপ' এবং 'নির্জনতা' – এই তিনটি শব্দের সহাবস্থান পঙ্ক্তিটিকে জীবনানন্দীয় করে তুলেছে।

আবার, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*- র ৩১ সংখ্যক কবিতার প্রথম অংশ-

"অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর

দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক

ঝরিতে ঝরিতে পারে দেখে নিক অপাঙ্গে আমার

আমি কোনোদিন কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।”[৭০]

এই কবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি মনে করায় জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-র সেই বিখ্যাত সনেটের প্রথম পঙ্‌ক্তি-

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে”[৭১]

এখানে উল্লেখ্য যে উভয় কবিতার শুরুর বাক্যবিন্যাসে এত সাদৃশ্য থাকলেও দুটি কবিতাই যত এগিয়েছে, একে অপরের থেকে পৃথক করে নিয়েছে পথ। আরো বলা প্রয়োজন যে ‘দেখিয়াছি’ -এই ক্রিয়াপদের সাধু রীতির প্রয়োগও প্রকৃতপক্ষে পাঠককে মনে পড়ায় জীবনানন্দের কথা। শক্তির কবিতায় জীবনানন্দের মতো এইরকম চলিতের মাঝে হঠাৎই সাধু রীতির ব্যবহার প্রায়শই দেখা গেছে। কবিতায় গুরুচন্ডালীর দোষরূপী বৈশিষ্ট্যকে এইরকমভাবে সচেতন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের পরে শক্তিই প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* থেকেই এইরকম আরো দুটি কবিতার উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

“ তাও তো যথেষ্ট হতো, সুন্দরের সকলই অপার

সুষমা বলিয়া বোধ হয়, হায় সুষমা সংগীত-

কোনোদিন শুনিব না, শুনিব না কোনোদিনও আর!”[৭২]

কিংবা,

“তুমি ফিরাবে না জানি, তুমিই গিয়েছো একদিন

হরিণে বসিয়া বহু হৃদয়ের ব্যাপ্তিও অধিক

দূরদেশে-ফিরাবে না। হৃদয়ে কি তুমুল ঝাউবন”[৭৩]

এইভাবে বলা যায়, চিত্রকল্প, উপমা, শব্দচয়ন এবং পঙ্‌ক্তির পূর্ণ বা আংশিক আন্তর্পাঠের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪.১.৩ প্রেম, প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

এই পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনার প্রধান ভিত্তি ছিল জীবনানন্দের কবিতা-পঙ্‌ক্তির প্রতিগ্রহণ কিংবা চিত্রকল্প, উপমা প্রভৃতির মধ্যে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা। এরপর প্রতিগ্রহণের ভিত্তি বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ। তিনটি বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শক্তির জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের সংরূপ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হবে- প্রেম, প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনার মধ্য দিয়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেম, প্রকৃতি এবং মৃত্যু- এই তিনটি কবিতার মধ্যে সর্বদা যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে নিজস্ব বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করে চলে, সে কথা বলা চলে না। এই তিন বিষয়ের

মধ্যে পারস্পরিক সমাপতন অতি স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। সুতরাং আলোচনার সুবিধার্থে বিষয় তিনটিকে আলাদা করলেও অনেক কবিতাই পাওয়া যাবে, যেগুলিতে এই তিনটি কিংবা এদের মধ্যে অন্তত দুটি বিষয়ের সমাপতন ঘটেছে। সেক্ষেত্রে কোনো একটি স্থানেই ওই কবিতা সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনাকে সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মধ্যে প্রথমেই আসা যাক প্রকৃতির বিষয়ে।

কবি মাত্রেরই অনুপ্রেরণার স্থল প্রকৃতি। বোধহয় এমন কোনো কবি পাওয়া সহজ হবে না, যিনি প্রকৃতিকে নিয়ে একটিও কবিতা লেখেন নি। তাই দুই কবির মধ্যে বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে প্রথমেই চলে আসে উভয়ের প্রকৃতি নিয়ে লেখা কবিতাগুলির তুলনা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু যদি বর্ষা ও বসন্ত হয়, তাহলে জীবনানন্দকে অবধারিত ভাবেই হেমন্ত এবং শীতের কবি বলে অভিহিত করা চলে। কারণ, হেমন্ত নিয়ে জীবনানন্দের কবিতা মান ও পরিমাণ- উভয় দিক থেকেই বাংলা কবিতার জগতে বিশেষ স্থানের দাবিদার। সে দিক থেকে বিচার করলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান ঋতু হেমন্ত এবং বর্ষা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর একটি সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যটির সঙ্গে জীবনানন্দকে যুক্ত করা যায়। এই অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় শক্তি এবং জীবনানন্দ এবং শক্তি উভয় কবির কবিতায় হেমন্তের উপস্থিতি।

জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের উপস্থিতি নিয়ে সমালোচকদের মনে কোনো সংশয় নেই। *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকে *বেলা অবেলা কালবেলা* পর্যন্ত- প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই হেমন্তের

উল্লেখ মিলবে এক বা একাধিকবার। তবে *বনলতা সেন* এ এসে হেমন্ত গ্রহণ করেছে প্রেমের সঙ্গে ঘনীভূত রূপ-

কিংবা-

> " ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
> ধানসিড়ি বেয়ে-বেয়ে
> সোনার সিঁড়ির মতো ধানে ধানে
> তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।"[৭৪]

আবার, *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের কবিতায় পাই-

> "ধানের রসের গল্প পৃথিবীর-পৃথিবীর নরম অঘ্রান
> পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই- আর তার প্রেমিকের ম্লান
> নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মত প্রাণ,"[৭৫]

আবার, *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের 'নাবিকী' কবিতায় পাচ্ছি-

> "হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;
> এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে

সময়ের কুয়াশায়;

মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে

তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে

পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে।"[৭৬]

উপরের উদাহরণে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিলে বাকি পাঁচটি পঙ্‌ক্তি বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা। এই উপমার উপমেয় যদি হয় হেমন্তের ফুরিয়ে যাওয়া, তাহলে উপমান হল ফসল ঘরে তোলার আগেই সেগুলির সমুদ্র বন্দরে রপ্তানীর জন্য পৌঁছে যাওয়া। অর্থাৎ হেমন্ত এখানে ফসল ঘরে তোলার মরসুম। একে কিছুটা প্রজননের মরসুমের দ্যোতনা বলে মনে করা যেতে পারে। আবার, *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থে হেমন্তের দ্যোতনা ভিন্ন-

"প্রথম ফসল গেছে ঘরে-

হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে

শুধু শিশিরের জল;

অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে

হিম হ'য়ে আসে

বাঁশপাতা-মরা ঘাস- আকাশের তারা;"[৭৭]

এখানে হেমন্ত শূন্যতার প্রতীক। ফসল কাটার পর শূন্য মাঠের একাকীত্ব যেন কোথাও মিশে গেছে মৃত্যুর নির্জনতার সাথে। আবার কখনো হেমন্ত উৎসবের মরসুম-

"মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে-

শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।"[৭৮]

এইভাবে জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের যে বহুমাত্রিকতার পরিচয় মেলে, শক্তির কবিতায় তার কিয়দংশ বিদ্যমান।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় হেমন্তের কথা উঠলে অবধারিতভাবে সবার আগে যে কবিতার কথা মনে আসে, সেটি হল *হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান* কাব্যগ্রন্থের সমনামী কবিতা। বহু পঠিত এবং চর্চিত কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে-

" হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক

তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন

কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে

অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি"[৭৯]

এখানে হেমন্তের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো পোস্টম্যানদের ঝুলির বর্ণ কবির লেখনীতে পান্ডুবর্ণ ধারণ করা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাকৃতিক ভাবে পাতা ঝরার মরসুম শীতের আগের ঋতু হেমন্তে পাতাগুলির বর্ণ যে হলুদ হয়ে যায়, এখানে তারই ইঙ্গিত করা

হয়েছে। সুতরাং সেই বিবর্ণ ঝুলির পোস্টম্যানদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পাঠকদের মনে একটা নিবিড় ধারণা তৈরি হয়। কিন্তু এর কিছু পরেই সেই প্রাচীনত্বের সাথে যুক্ত হয় রহস্যময়তা এবং হেমন্তের বিবর্ণ পান্ডুরতার সাথে যুক্ত হয় প্রেম-

"আমি দেখছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে

বকের মতো নিভৃতে মাছ

এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের-

আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা

যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের

হারিয়ে যেতে থাকে।"[৮০]

এখানে হেমন্তের অরণ্যের ডাকপিয়নেরা যেন প্রেমের দূত। সুতরাং হেমন্ত একই কবিতায় শক্তির কাছে প্রেম ও বিরহের সমার্থক হয়ে উঠেছে।

আবার অন্য কবিতায় পাচ্ছি-

" বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।"[৮১]

হেমন্ত এখানে পাংশুটে অর্থাৎ বিবর্ণতার প্রতীক। আবার, আরেকটি কবিতায় দেখি-

"জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে-"[৮২]

অর্থাৎ হেমন্ত এখানে অবসরের প্রতীক।

আবার কখনো হেমন্ত পাতাঝরার মরসুম। বিচ্ছেদের কাল-

> "তিরিশ বৎসর পরে- চতুর্দিকে তিরিশ বৎসর
>
> হেমন্তের ঝরাপাতা জ্বলে যায়, জঞ্জাল তোমার"[৮৩]

আবার নিম্মলিখিত কবিতাটিতে হেমন্ত কিছুটা অন্যরকম-

> " হেমন্ত যেখানে থাকে, সেখানে কৌতুক থাকে গাছে
>
> সাড়া থাকে, সচ্ছলতা থাকে।"[৮৪]

কবিতার এই পঙ্‌ক্তিদুটি পড়ে চমকিত হতে হয়। হেমন্তের সাথে ইতিপূর্বে অনেক দ্যোতনাই এসে মিশেছে। প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ, মৃত্যুর অনতিবিলম্বের আভাস- কিন্তু কৌতুক কখনো মিলেছে বলে স্মরণে আসে না। এখানে হেমন্ত কেন কৌতুকের পরিচয় বাহক, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে এগিয়ে যেতে হয় আরও কয়েক পঙ্‌ক্তি-

> " হেমন্ত বার্ধক্য নিতে আসে
>
> খসায় শুকনো ডাল, মরা পাতা, মর্কুটে বাকল
>
> এইসব।
>
> হেমন্ত দরোজা ভেঙে নিয়ে আসে সবুজ নিঃশ্বাস..."[৮৫]

এই পর্যন্ত পড়ে বোঝা যায় আসলে কৌতুক এখানে হয়ে উঠেছে নির্মল আনন্দের সমার্থক। বার্ধ্যকের অবসান ঘটিয়ে সে যেন নবযৌবনেরই ইঙ্গিত বহন করে আনে। তাই নতুন পাতা লাভ করার আশু সম্ভাবনার আনন্দে কৌতুকময় হয়ে ওঠে গাছেরা। আবার, অন্য একটি কবিতায় হেমন্তের রাতের পরিবেশ কবির লেখনীতে হয়ে উঠেছে জীবন্ত-

"গাছের পাতার ছায়া পড়েছে উঠানে

উঠানে পড়েছে এসে ফুল

কার্তিকের শেষ রাতে হয়েছে বিপুল

আয়োজন-আমার বাগানে

আকাশের চাঁদ

তদারক ক'রে গূঢ় ফাঁদ

ঘুমায় আকাশে

শেষ রাত শেষ হয়ে আসে

পুবদিকে আঁধার ভাঙায়

ব্যস্ত লোকজন

সে-সবই নিরীক্ষা করে মন।।"[৮৬]

প্রকৃতপক্ষে শক্তির কবিতায় প্রকৃতি যেভাবে সেজে উঠেছে, তার সঙ্গে জীবনানন্দের পৃথিবীর শুধু হেমন্তই নয় বরং আরো অনেক দিক থেকেই সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্বের উপ-অধ্যায়ে উভয়ের কবিতার পঙ্‌ক্তি, চিত্রকল্প ও উপমাগত সাদৃশ্যের তুলনা আলোচনা করার সময় একাধিক স্থানে তার উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

এরপর আসা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'প্রেম'- এই বিষয়টির উপর জীবনানন্দের প্রভাব প্রসঙ্গে। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে উভয় কবির প্রেম বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে মিলের থেকে অমিলই বেশি। শক্তি প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক বেশি আবেগতাড়িত, অনেক বেশি সোচ্চার তাঁর প্রেমের উচ্চারণ। কখনো তিনি শিশুর সারল্যে প্রেমিকাকে বলতে পারেন-

"দাও, বক্ষ দাও, দুগ্ধ পান করি, বালক তোমার
আমি ছাড়া কেহ নাই; আন্তরিকভাবে সুগঠিত
এমন বাৎসল্য তুমি দেখিবে না অরণ্যে। সোনালি
বাঘের শাবকও চায় রক্তপিত্তকফের সম্ভার!"[৮৭]

বালকের মতো অভিমানী কণ্ঠে বলে ওঠেন-

"যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে"[৮৮]

আবার কখনো ‘পোকায় কাটা কাগজপত্র’ দেখে জেগে ওঠে তাঁর যৌন কামনা-

“ পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে- ফ্যান্‌জোলেঙ্গা

অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত

উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত

হেন্‌ করেঙ্গা তেন্‌ করেঙ্গা!”[৮৯]

কখনো আবার প্রণয়প্রার্থী হয়ে প্রেমিকার কাছে নতজানু-

“ ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের

দয়াময়ি, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও

রাখিও না মানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া

লোলতরবারি...বাহ্যপ্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।”[৯০]

শক্তির কবিতায় ‘প্রেম’ এই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ আলোচনা করা এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়। এই অংশে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু মাত্র শক্তির কবিতায় প্রেমের মধ্যে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণের উপস্থিতি নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সেই *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা যেমন ‘বনলতা সেন’, ‘সুরঞ্জনা’, ‘সবিতা’-এর মধ্যে যে নাম এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নাম ও পদবী সমেত যে নারী চরিত্রের উপস্থিতি পাই, তার রেশ রয়ে গেছে *সাতটি*

তারার তিমির- এ এসেও। সেখানেও আমরা পাচ্ছি সুরঞ্জনা কিংবা সরোজিনীকে। শক্তির কবিতার মধ্যেও এই নামযুক্ত প্রেমিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে দুটি নাম পাওয়া যাচ্ছে একাধিক কবিতায়। এই নামদুটি হল- মালবিকা এবং মণীষা। এছাড়া 'সরোজিনী বুঝেছিল' শীর্ষক কবিতাটির ওপর জীবনানন্দের প্রভাব বিষয়ে সবিস্তারে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হল না। মালবিকাকে নিয়ে একটি কবিতার ওপরেও জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতাটির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ইতিপূর্বেই। এখানে শুধু মণীষাকে নিয়ে রচিত কয়েকটি কবিতার উদাহরণ দেওয়া হল-

" মণীষার ভালবাসা ছিল মাহুতের মতো উঁচু"[৯১]

কিংবা,

"মণীষার সব কাজ ছেলেবেলা থেকে আমি করে দিই

সে পারে না কিছু

সে মূঢ় নিসর্গে ঘুম, ঘুমের আলস্যে মুখ নিচু"[৯২]

এছাড়া শক্তির প্রেমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যৌনতার যে সোচ্চার উচ্চারণ দেখা যায়, তার মধ্যে কোথাও একটা বাৎসল্য রসের ঘ্রাণ লেগে থাকে। প্রেমিকার কাছে অনেক কবিতাতেই তিনি পয়ঃপিয়াসী। প্রেমিকার প্রতি তাঁর কাতর বক্ষ-প্রার্থনা-

"তোমার বুকের পাশে শুয়ে থাকবে বিপুল আক্রোশে,

স্তনদুটি শঙ্খনাদ করে উঠবে ঘুমন্ত কামড়ালে,

নাভিগর্তে আঙুলের রক্ত ও প্রপাত পড়বে ঝরে-

এ-বয়সে সব কাজ করতে পারি প্রেমে ও সম্মোহে।"[৯৩]

কিংবা,

"স্তনদুধ চুঁইয়ে পড়ে মুখটি ভেজায়,

আমি স্তনে মুখ রাখি।"[৯৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জীবনানন্দের কবিতাতেও আমরা পয়োধরা স্তনের উল্লেখ পাই কিন্তু সেখানে অনুপস্থিত এই বাৎসল্য রস। যেমন, জীবনানন্দের 'শঙ্খমালা' শীর্ষক কবিতায় পাচ্ছি-

"স্তন তার

করুণ শঙ্খের মতো- দুধে আর্দ্র- কবেকার শঙ্খিনীমালার;

এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর"[৯৫]

এখানে কোনোভাবেই বাৎসল্য রস উপস্থিত-একথা বলা যাবে না।

এইভাবে বলা যায় শক্তির প্রেমের কিছু বৈশিষ্ট্য জীবনানন্দ থেকে প্রতিগৃহীত বা কিছু প্রেমের কবিতা প্রত্যক্ষভাবে জীবনানন্দের কোনো বিশেষ কবিতার আন্তর্পাঠ হলেও শক্তির কবিতায় প্রেমের প্রকৃতি জীবনানন্দের থেকে পৃথক হতে পেরেছে। এখানেই কবি হিসেবে শক্তির সাফল্য।

এরপর আসা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুভাবনার ওপর জীবনানন্দের প্রভাব বিষয়ক আলোচনায়। জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুচেতনা একটি অত্যন্ত চর্চিত প্রসঙ্গ। প্রদ্যুম্ন মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত *জীবনানন্দের চেতনা জগৎ* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন-

> " তবে কোনও কবিই, যদি তিনি মানবঅভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাঁর প্রেমের কবিতাবলী হতে সম্পূর্ণভাবে হতাশা, বিষাদ ও মৃত্যুর বোধগুলিকে মুছে দিতে পারেন না। তাই বিষাদ ও মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, ব্যর্থতা, আহত বাসনার আর্তি 'বনলতা সেন' গ্রন্থের অনেক কবিতার সুরেই আবর্তিত। তবে সে সব কিছুই আগের মত সংবেদনার প্রবলতায় প্রেমের শুভ প্রেরণাশক্তির নবজাত বোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। "দুজন" বা "অঘ্রাণপ্রান্তরে" কবিতাদুটি পাঠককে ফিরিয়ে আনে 'ধূসর পান্ডুলিপি'র হিমার্ত, মৃত্যুস্পৃষ্ট জগতে। "শঙ্খমালা" কবিতার নারী যেন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় 'ডাকিয়া কহিলা মোরে রাজার দুলাল', কিংবা "পরস্পর" কবিতায় জীবনানন্দীয় নায়িকার অনুসঙ্গে, যাঁকে ঘিরে মৃত্যুর আবহ। তবু তিনি আমাদের হৃদয়-সন্ধানে অব্যর্থ, ঘোর মায়াবিনী নিষ্করুণা এক নারী।"[৯৬]

নায়িকাদের ঘিরে এইরকম মৃত্যুর পরিমন্ডল বা আরও ভালভাবে বললে মৃত প্রেমিকাদের কথা লেখনীতে তুলে আনা জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনার একটি বড় দিক। শুধু শঙ্খমালা-ই নয়, রূপসী বাংলা-র একাধিক কবিতায় উঠে এসেছে মৃত রূপসীদের কথা। কিংবা মনে করা যেতে পারে *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের ‘হাওয়ার রাত’ কবিতার কথা, যেখানে হাজার বছর আগে মরে যাওয়া সুন্দরীরা ফিরে এসেছিল-

“যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম’রে যেতে দেখেছি

কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় -কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক’রে

কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন-

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?

জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?

প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?”[৯৭]

কিন্তু শক্তির কবিতায় এক সরোজিনী ছাড়া এই রকম উদাহরণ খুব একটা পাওয়া যায় না। শক্তির কবিতায় মৃত্যুভাবনা প্রকাশের প্রধান দুটি স্থান হল এলিজি এবং নিজের মৃত্যু বিষয়ক কবিতাগুলি যার মধ্যে এপিটাফও রয়েছে।এলিজি অর্থাৎ

একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে কোনো কবির লেখা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে শক্তি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রচুর সংখ্যক এলিজি তিনি রচনা করেছেন। যেহেতু জীবনানন্দ নিজের প্রথম দিককার কবিতা যেমন-'স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের শ্রাদ্ধবাসরে' ছাড়া খুব একটা এলিজি রচনা করেন নি, তাই শক্তি রচিত এলিজিগুলি এখানকার আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা হল না। এপিটাফ ছাড়া অন্য কবিতার মধ্যেও উঠে এসেছে শক্তির মৃত্যুভাবনা-

"খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।"[৯৮]

অথবা,

"স্পর্ধার মৃত্যুই শ্রেয়, তুমি ভ্রান্ত পুণ্যের কৌতুকে
আমারে নিতেছো টানি, আলিঙ্গনবিহীন দুর্গম...
বামে বা দক্ষিণে আহা প্রেম দুঃস্থ পাংশু রসাতল
উপস্থ ব্যাধির পোকা, কৃমি, পুঁজ, রক্তপাত বুকে

আমারে ভালোই বাসে।” [৯৯]

এইভাবে যে শক্তি প্রথম দিকের কবিতায় অপরিণত বয়সের মৃত্যু চাইছেন, সেই তিনিই পরবর্তীকালে লিখছেন-

“যাবো

কিন্তু, এখনি যাবো না

তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো

একাকী যাবো না অ-সময়ে।” [১০০]

১৯৮২ সালে প্রকাশিত *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* কাব্যগ্রন্থের সমনামী এই কবিতাটির শেষাংশ পড়লে মনে আসে জীবনানন্দ দাশের *মহাপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটির শেষ অংশের সেই জীবনপিয়াসী সোচ্চার ঘোষণা-

“আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো-বুড়ি চাঁদটারে আমি ক’রে দেবো

কালীদহে বেনোজলে পার;

আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক’রে চ’লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।”[১০১]

জীবনকে আশ্লেষে পান করার এই যে বাসনা এর মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় দুটি কবিতায়। *রূপসী বাংলা*- র কবিতাগুলির মধ্যে যে জীবনানন্দ মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং আকস্মিকতাকে

স্বীকার করে নিয়েও প্রার্থনা করছেন মৃত্যুর মুহূর্তে রূপসী বাংলাকে কাছে পাবার, সেই জীবনানন্দের লেখনীতেই প্রায় সমসাময়িক ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থের ‘পাখিরা’ কবিতায় শোনা যায়-

“কোথাও জীবন আছে- জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,”[১০২]

শক্তির কাছে জীবনের এই জয়ধ্বনি করার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অকুতোভয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। তাই ‘স্বেচ্ছাচারী’ যাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন প্রতিস্পর্ধী বয়ান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তি রচিত প্রথম কবিতার নাম ছিল ‘যম’। সুতরাং মৃত্যুচেতনা যে কবিতা রচনার সূচনাকাল থেকেই কবির পিছু ছাড়ে নি, সে কথা স্পষ্ট প্রমাণিত। তাই নিজের ভেসে যাওয়া স্বেচ্ছাচারী শবের দৃশ্য কল্পনা করে অনায়াসে তিনি লিখে ফেলতে পারেন-

“সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে

এভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে

সমাদরণীয়?

কে জানে গরল কি না প্রকৃত পানীয়

অমৃতই বিষ!

মেধার ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।”[১০৩]

মৃত্যুর প্রতি শক্তির এই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন কোথাও গিয়ে যেন জীবনানন্দের ওই জীবনকে ভালোবাসারই সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাই 'শবযাত্রী সন্দিগ্ধ' কবিতায় শক্তি বলে ওঠেন-

> "মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবো না।
> খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
> কালরাতে যে-সাতপহর গাওনা হলো, তর্জা কাপ কবি
> বিলেতবাতি ঝুললো, পোকা, লোকলশকর। কেউ ডেকেছে। কেন।
> আমরা কেউ মরে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটা করবো না।"[১০৪]

এইভাবে শক্তির মৃত্যু বিষয়ক কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে তুচ্ছ করার এক প্রবণতা যা সরাসরি জীবনানন্দীয় না হলেও জীবনানন্দের মৃত্যুর অনিবার্যতাকে সহজভাবে স্বীকার করারই ভিন্ন সংরূপে সমার্থক হয়ে উঠেছে।

এইভাবে দেখা গেল, কবিতার ছন্দ, চিত্রকল্প নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রেম, প্রকৃতি এবং মৃত্যুভাবনার ক্ষেত্রেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব দেখা গিয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্যের পরিভাষায় একে প্রভাব না বলে প্রতিগ্রহণ বলাই শ্রেয় কারণ শক্তি জীবনানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব কাব্যভাষা এবং জগত। এমন কি, কাব্যের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সরাসরিভাবে জীবনানন্দের কোনো কবিতার এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তিকে সামান্য বদলে ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু একে অনুকরণ না বলে আন্তর্পাঠ বলাই শ্রেয় কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কবিতাটি জীবনানন্দের কবিতার প্রেক্ষিত থেকে সরে গিয়ে গড়ে তুলতে পেরেছে ভিন্ন পরিসর। শক্তির জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যেই এই প্রতিগ্রহণের ছাপ সুস্পষ্ট। তারপর সময়ের সাথে সাথে যত পরিণত হয়েছেন শক্তি, এই প্রতিগ্রহণ পরিমাণগত ভাবে কমে যেতে শুরু করেছে । এই প্রবন্ধের অধিকাংশ কবিতাই সংগৃহীত হয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যসমগ্র* থেকে। এর মোট সাতটি খন্ডের মধ্যে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অধিকাংশ কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম খন্ডটি থেকে। এই প্রথম খন্ডে রয়েছে মোট ছয়টি কাব্যগ্রন্থ-

হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য (১৯৬১)

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)

অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে (১৯৬৬)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০)

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯)

উড়ন্ত সিংহাসন (১৯৭৮)

এই কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আবার জীবনানন্দের কবিতার পঙ্‌ক্তির কিংবা শব্দের বা চিত্রকল্পের অধিক ব্যবহার ঘটেছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য* এবং *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*- এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। এই পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির নামের মধ্যেও জীবনানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। এর পরবর্তী পর্যায়ে এসে ক্রমশ কমতে শুরু করলো জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। এই পর্যায়ের শেষ কাব্যগ্রন্থ *উড়ন্ত সিংহাসন* এর কবিতাগুলির মধ্যেও জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ খুবই স্বল্প। কালানুক্রমিকভাবে কবির চতুর্থ গ্রন্থ *সোনার মাছি খুন করেছি* অবশ্য অসাবধানতাবশত পদ্যসমগ্রের প্রথম খন্ড থেকে বাদ পড়ে ঠাঁই পেয়েছিল দ্বিতীয় খন্ডে। এরপর থেকে শক্তির কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের উপস্থিতি খুবই অনিয়মিত। যেমন, *পদ্যসমগ্র-২* এর অন্তর্গত *প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই* কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় পরিলক্ষিত হয় জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের উপস্থিতি। যেমন-

"অঘ্রাণের দুটি তারা তেমন স্বতন্ত্র নয় তারাদের মতো
নয় দূর, ব্যবধানভরা, শূন্য আকাশে, দুদিকে...
পৃথিবীর মধ্যবিত্ত ঘরে শুয়ে তারকা দুজন
কথা বলে, একজন জন্মদাতা অন্যটি জাতক
অঘ্রাণে, হেমন্তসূত্রে এসে খেলা করেছে একদা
একজন, আর বাকি খেলা তুলে দেয় অন্যহাতে।" [১০৫]

আবার, আরও পরের কাব্যগ্রন্থ পদ্যসমগ্র-৪ এর অন্তর্গত *হেমন্ত যেখানে থাকে* কিংবা পদ্যসমগ্র-৫ এর *যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো* (১৯৮২) -এদের মধ্যেও দেখা যায় জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের উপস্থিতি। কিন্তু তার মাত্রা প্রথম কাব্যগ্রন্থ *হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য* (১৯৬১) কিংবা *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৯৭০) এগুলোর থেকে অনেক কম। সুতরাং বলা যায়, সমগ্র কবিজীবনের কোনো সময়েই জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ থেকে মুক্ত না হলেও তার পরিমাণগত মাত্রা কালানুক্রমিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে ক্রমশ। আর এই হ্রাস পাবার ফলেই জীবনানন্দের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে শক্তি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব কাব্যভাষা ও শৈলী। এখানেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সার্থকতা।

৪.২ বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ

১

তুলনামূলক সাহিত্যে বিগত শতকের ছয়ের দশক থেকে প্রভাব চর্চার পরিবর্তে প্রতিগ্রহণ চর্চার গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েছে। কোন নির্দিষ্ট সাহিত্যিকের সাহিত্য নিরীক্ষণ মূলত দুইভাবে সমস্যায়িত। প্রথমত একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম সবসময়েই ক্রমস্থানিকতার অপেক্ষক ফলে দেশ-কালের তুমুল নাড়ীবন্ধন ছিন্ন করে তাকে বিচ্ছিন্ন এক সাহিত্যকর্ম হিসেবে নিরীক্ষণের প্রচেষ্টা নেহাতই অপপ্রচেষ্টা আর দ্বিতীয়ত, ঐ সাহিত্যিকের ঐ নির্দিষ্ট রচনাটি পাঠ করে ঐ একই কিংবা ভিন্ন ভাষাতন্ত্রের অন্য কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টির প্রসঙ্গ পাঠকের 'প্রত্যাশার দিগবলয়'[১০৬] (Horizon of Expectation) এ চলে আসতেই পারে। বিষয়টিকে রেমন্ড উইলিয়মস এর ত্রয়ী পরিভাষা- ডমিনেন্ট, রেসিডিউয়্যাল, ইমারজেন্ট[১০৭] এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যাবে কোনো নতুন সাহিত্যকর্মই কখনো পুরোপুরি 'নতুন' নয়। সর্বদাই তা অতীত থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করছে। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক –উভয় ভাবেই। বলাই বাহুল্য যে এই ডমিনেন্ট, রেসিডিউয়্যাল, ইমারজেন্ট কোনো নিশ্চল ধারণা নয় বরং একটা ঘটমান প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্র অবকল বিশেষ- যা সময়ের সাথে সাথে বদলে যেতে থাকে। এপ্রসঙ্গে ইটামার ইভান জোহারের 'বহুতন্ত্র'[১০৮] তত্ত্বে বর্ণিত গতিময়তার বৈশিষ্ট্য স্মর্তব্য।সব মিলিয়ে বলা যায় যে তুলনামূলক সাহিত্যে প্রতিগ্রহণ চর্চা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আয়ুধ। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬) এর কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এর

প্রতিগ্রহণের মাত্রা নির্ণয় করা। এই প্রতিগ্রহণের স্তরভেদকে মাথায় রেখে বিনয়ের কাব্যযাত্রাপথকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বিনয় জীবনানন্দকে পুরোপুরি অনুসরণ করছেন। কাব্যভাষা, শৈলী, উপমা, কাব্যজগত সবকিছুতেই তিনি জীবনানন্দীয় পথের পথিক। এই পর্ব বিনয়ের কাব্যযাত্রার প্রস্তুতি পর্ব, যাকে হাতমকশো করার অধ্যায়ও বলা যায়। এই পর্বে রচিত কবিতার উদাহরণ পাওয়া যাবে *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮), বইতে, যা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রতিগ্রহণ চর্চার নিরিখে এই পর্বকে অনুকরণ (Imitation)পর্ব বলা যেতে পারে। *গায়ত্রীকে* (১৯৬১) থেকে *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত সময়কে বিনয়ের কাব্যপ্রবাহের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে তিনি জীবনানন্দ অনুকরণের নিশ্চিত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব কাব্যজগত নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন। সেই স্বকীয়তা সৃষ্টির জন্য জীবনানন্দকে তিনি অনুকরণের বদলে প্রতিগ্রহণ করেছেন। এই পর্বেই রচিত হয়েছে বিনয়ের কবিজীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ *ফিরে এসো, চাকা* (১৯৬২) এবং *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (শ্রাবণ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *গায়ত্রীকে* (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে নাম হয় *ফিরে এসো,চাকা* এবং তৃতীয় সংস্করণে আবার তা নাম বদলে হয় *আমার ঈশ্বরীকে* । শেষমেশ বইটির নাম আবার *ফিরে এসো, চাকা* ই রাখা হয়। এই পর্বে রচিত বাকি কাব্যগ্রন্থগুলি হল- *ঈশ্বরীর* (১৯৬৪), *অধিকন্তু* (১৯৬৭), *বাল্মীকির কবিতা* (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া এই পর্বে *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫) নামে বিনয়ের একটি কাব্য সংকলনও প্রকাশিত হয়। বিনয়ের কবিজীবনের এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সৃজনাত্মক অধ্যায়। এই

পর্বটিকে বিনয়ের জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ পর্ব হিসেবে সূচিত করা যেতে পারে। শেষ পর্ব যা শুরু হচ্ছে (*আমাদের বাগানে* (১৩৯১ বঙ্গাব্দ) এবং *আমি এই সভায়* ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) থেকে, তার মধ্যে জীবনানন্দের কোনো প্রতিগ্রহণ নজরে পড়ে না। এই পর্বের বিনয় সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যঞ্জনা, উপমা, সবকিছু বর্জন করে কবি প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু দেখছেন তার সোজাসাপটা বর্ণনা দিচ্ছেন কবিতায়। ব্যতিক্রম শুধু *এক পঙ্‌ক্তির কবিতা* (১৯৮৮) যেখানে গাণিতিক সূত্র বা লৌকিক প্রবচনের মতো এক একটি পঙ্‌ক্তিকে একটি করে কবিতা রচিত হয়েছে এবং *হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ* (২০০৩) এর কবিতাগুলি। এই কাব্যগ্রন্থটির জন্য কবি ২০05 এ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

এইভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে জীবনানন্দের মৃত্যুর চার বছর পর যাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়,সেই কবি বিনয় মজুমদার জীবনানন্দ-ইস্কুলের একজন বাধ্য ছাত্র হিসেবে কবিজীবন শুরু করেও কিভাবে নিজেকে ক্রমশ জীবনানন্দীয় বৃত্তের বাইরে নিয়ে গেলেন তার স্বরূপ। জীবনানন্দরূপী কৃষ্ণগহ্বরের দুর্নিবার অমোঘ টানে প্রথমে ছুটে গিয়েও তিনি কিরূপে করলেন প্রত্যাবর্তন এবং পরিশেষে নির্মাণ করলেন স্বীয় কাব্যজগত, দেখার চেষ্টা করা হবে তাও। একদিকে এটি যেমন প্রতিগ্রহণ চর্চা তেমনই, বলাই বাহুল্য যে এই প্রতিগ্রহণের রূপ স্থাণু নয় বরং জঙ্গম। তাই বিনয়ের জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণের ক্রমপরিবর্তনশীল যাত্রাপথকে পর্যবেক্ষণ করাও এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। উভয় কবির মিথস্ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থের প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করারও প্রচেষ্টা থাকবে এখানে।

২

বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮)। জীবনানন্দের মৃত্যুর চার বছর পর প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের কাব্যজগতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এটা মোটেও কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলা ভাষার তিনের দশকের কবিদের সামনে যেমন প্রধান সমস্যা ছিল রবীন্দ্রনাথ তেমনই পাঁচ ও ছয়ের দশকের কবিদের কাছে ছিল জীবনানন্দকে এড়ানো। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বিভিন্ন কবির রচনায় জীবনানন্দীয় কাব্যশৈলীর প্রভাব কমবেশি বেশ কিছু কবিতায় দেখা গেছে। বিনয়ও তার ব্যতিক্রম নন।তবে মনে রাখতে হবে যে, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছে সেই সময় কবির মতে কবিতা লেখার কৌশল তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর কথায় :

> "১৯৫৯ খৃষ্টাব্দটি কোনো চাকুরি না করে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। এই সময় প্রচুর বিদেশী সাহিত্য পাঠ করি।ধীরে ধীরে আমার মনে কবিতা রচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবির্ভূত হয়।"[১০৯]

নক্ষত্রের আলোয় এই নাম থেকেই কাব্যগ্রন্থটিতে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণের একটা আভাস পাওয়া যায়। 'নক্ষত্র' শব্দটি জীবনানন্দের অসংখ্য কবিতায় শব্দ এবং উপমা হিসেবে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। কাব্যগ্রন্থটির নামোচ্চারণের সাথে সাথে পাঠকের মানসপটে ভেসে ওঠে ভেসে ওঠে ম্লান ধূসরতা মাখানো এক অন্যরকম স্বপ্ন জগৎ-যা একান্তই জীবনানন্দীয়। এপ্রসঙ্গে Iserএর 'Reader Response' তত্ত্বে বর্ণিত mental Image এর কথা স্মর্তব্য:

“A second area that Iser explores in connection with the reading process is the image-making activity of the reader.While we read,we are continuously and unconsciously constructing images in process Iser calls “passive synthesis”. Images should be distinguished from perceptions we have when encountering empirical reality; for the image “transcends” the sensory” [১১০]

শুধু কাব্যগ্রন্থের নামেই নয়, গ্রন্থটির বিভিন্ন কবিতার পঙ্‌ক্তিতেও বার বার উঠে এসেছে নক্ষত্র শব্দটি। এই নক্ষত্র অতি দূরের।এই মাটি পৃথিবীর জগতের চেনা পরিচিত পরিবেশের ভিড় সেখানে নেই।এই জগৎ আকাশের ওপারের আরেক আকাশের জগৎ। যেমন-

“চাঁদ নেই দেখি দূরে নক্ষত্রেরা জ্বলে।

যে নক্ষত্র নীল হয়ে আছে,দেখি তাকে।

কখনো সে পৃথিবীতে আসবে না জানি, তবু

আসতে কি পারে না সে মাঠের নিকটে?

মাঝে মাঝে নক্ষত্র তো চাঁদ হয়ে পৃথিবীর কাছে এসে থাকে”[১১১]

‘নক্ষত্রের আলোয়’ শীর্ষক এই কবিতাতে ‘নক্ষত্র’ শব্দের ব্যবহার হয়েছে তিনবার। শব্দটি হয়ে উঠেছে অতিদূর পরিবেশের দ্যোতক।এই নক্ষত্রের আলোয় ‘জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা

নেই’[১১২], আছে না ঘোচা দূরত্বের বিপন্নতা। না ছুঁতে পারা প্রেমের এক সকরুণ ম্লান বিষণ্নতা যা মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের কাব্য জগতের মায়াবী পরশ লাগা ধূসর জগৎকে।

নক্ষত্রের আলোয় কাব্যগ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় প্রেম, প্রেয়সীর প্রতি প্রেম। কিন্তু এ প্রেমিকাও জীবনানন্দের কাব্য জগতের নারীদের মতোই কোনো এক দূর জগতের বাসিন্দা- চির অধরা। এই নারী একটি নক্ষত্রের মতো আসে, তারপর চলে যায় দূরে। জীবনানন্দের মতই এ কাব্যের কবিও হারিয়ে ফেলেছেন তার নারীকে। সে ‘চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।’ আর কবি পড়ে আছেন একাকী। বিরহকাতর হয়ে তিনি বলছেন-

> “আমি একা পড়ে আছি, তুমি আছো আকাশের সুনীল অতলে। জানি, তুমি এই মাঠে আসবে না দূরাগতা।”[১১৩]

কবি তবু খুঁজে বেড়ান তাকে-

> “তাকাই সামনে সোজাসুজি,
> ব্যাকুল আশায় তাকে খুঁজি,
> বধির আঁধারে করি দু-চোখ ধারালো।
> কোনদিকে –আঁধারের কোন পারে তবে সে হারালো?”[১১৪]

উপরের কবিতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আঁধারের বিশেষণ হিসেবে ‘বধির’ শব্দের প্রয়োগ। সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহারের ফলে একদিকে আঁধারের মধ্যে যেমন প্রাণ তথা মানব সত্তার উদ্ভুত হয়েছে তেমনই আবার শ্রবণশক্তি রহিত করে দিয়ে কবি সেই অন্ধকারকে করে তুলেছেন নিশ্ছিদ্র, গাঢ়, অনতিক্রম্য। আবার একই সঙ্গে সেই অন্ধকার যেন নদী, তাই

তার কোনো এক পারে কবির প্রেমিকার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অন্ধকারের প্রতি দেয় এতখানি মনোযোগ পাঠককে জীবনানন্দের কথাই মনে করায়।

'আর শোনায়োনা' কবিতার প্রথম স্তবকটি পড়লে অনায়াসে পাঠকের মনে যায় জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতাটি-

> "আর শোনায়োনা সুন্দরী, তুমি সিজ্ঘলের ঐ বিষাদবিধুর গান
> কোরো না আহত হৃদয় উন্মূল...
> গানে মনে পড়ে আরেক জীবন,দূর এক উপকূল"[১১৫]

অপরদিকে 'হায় চিল' কবিতায় জীবনানন্দ লিখছেন-

> "হায় চিল, সোনালি ডানার চিল,এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
> তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।"[১১৬]

উভয় কবিতাতেই শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। জীবনানন্দের কবিতাতে যেখানে শেষাংশে প্রথমের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য রয়েছে, সেখানে বিনয়ের কবিতার প্রথম ও শেষাংশ হুবহু এক। বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ এর বদলে এখানে এসেছে 'অভাগা তরুণীর রূপরেখা' এবং সুদূর অতীতচারণায় মগ্ন কবি নিজেকে প্রেতরূপে দেখছেন।এই বৈসাদৃশ্য মধ্য স্তবকে।কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিনয় এখানে জীবনানন্দের একটি গোটা কবিতার ব্যর্থ অনুকরণের প্রচেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জীবনানন্দের এই কবিতাটিকে কোনো কোনো সমালোচক ইয়েটসের একটি কবিতা দ্বারা

প্রভাবিত বলে মনে করেন। কিন্তু ঐ প্রভাব সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতাটি শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তা হারায়নি। এপ্রসঙ্গে মঞ্জুভাস মিত্র লিখছেন-

> "জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা এবং শিল্পসাহিত্য কবিতা থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা এ-দুটির মিলন না ঘটলে কোনো উচ্চাঙ্গের নতুন কবিতার জন্ম হয় না।জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটেছিল, এইজন্য প্রভাব তাঁর কাছে সচেতন আত্মপুষ্টি মাত্র।যেসব কবিতায় তিনি প্রভাবিত হন সেসব কবিতায় তাঁর নিজের সুরটিও তিনি অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করে নেন।অতএব ইয়েটসের He Reproves the Curlew (The wind Among the Reeds) অথবা The Scholars (The Wild Swans al Coole) পাঠ করবার পরেও জীবনানন্দ দাশের হায় চিল (বনলতা সেন) বা সমারূঢ়-র (সাতটি তারার তিমির) মতো কবিতা পড়বার প্রয়োজন অনুভূত হয়।...দুটি কবিতা পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল নয়; প্রভাবিত হয়েও দ্বিতীয় কবিতাটি একটি স্বতন্ত্র কবিতা।"[১১৭]

প্রতিগ্রহণের আলোকে যদি বিষয়টিকে দেখলে একে ওয়াইস্টাইনের ভাষায় 'পরোক্ষ প্রভাব'[১১৮] বলা যেতে পারে-যেখানে প্রতিগৃহিত রচনাটি নিজেই অপর কোনো সাহিত্যকর্মকে প্রতিগ্রহণ করছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি নয়,দু-দুটি প্রতিগ্রহণের ঘটনা ঘটছে। আবার প্রথম প্রতিগ্রহণটি যে শুধু দুটি ভিন্ন ভাষাতন্ত্রের সাহিত্যকর্মের মধ্যে ঘটছে তাই নয় দুটি পৃথক দেশের সাহিত্যকর্মের মধ্যে ঘটছে।আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রচনাদ্বয় একই দেশের একই

ভাষাতন্ত্রের অন্তর্গত।এক্ষেত্রে বিষয়টিকে প্রোফেন[১১৯] ও মেটাফেন[১২০] দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়।

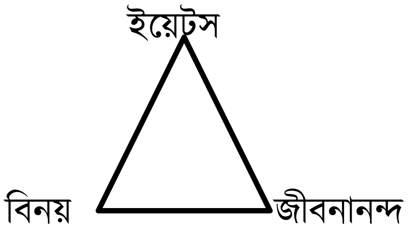

উপরের ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুতে ইয়েটস, জীবনানন্দ এবং বিনয় মজুমদারকে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে জীবনানন্দ ইয়েটসকে প্রতিগ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে বিনয় প্রতিগ্রহণ করেছেন জীবনানন্দকে। অর্থাৎ বিনয় প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের মাধ্যমে প্রতিগ্রহণ করেছেন ইয়েটসকেই, কিন্তু তা পরোক্ষভাবে, সরাসরি নয়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রকার প্রতিগ্রহণকে অর্থাৎ জীবনানন্দের ইয়েটস প্রতিগ্রহণকে প্রোফেন বলা যেতে পারে কারণ বাংলা সাহিত্যে ইয়েটস এর ঐ নির্দিষ্ট কবিতাটির প্রতিগ্রহণ প্রথম জীবনানন্দের হাতেই ঘটছে।আর বিনয়ের দ্বারা জীবনানন্দের ‘হায় চিল’ কবিতাটির প্রতিগ্রহণকে সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে মেটাফেন।

নক্ষত্রের আলোয় কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের আঘ্রাণের আতিশয্য। এপ্রসঙ্গে আরো দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য। ‘কতো রূপকথা’ কবিতাতে কঙ্কাবতী, পদ্মমালা, শঙ্খিনীমালার রূপকথা শুনে ‘সব ব্যথা পেয়ে’ সুখ অনুভব করেন কবি।

‘পৃথিবীর সব স্বপ্ন’ আর ‘পৃথিবীর সব সাধ’এর পরপর দুই পঙ্‌ক্তিতে মিশ্রকলাবৃত্তে প্রয়োগ পাঠককে মনে করিয়ে দেয় *রূপসী বাংলা* র সেই অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলিকে-

“পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;”[১২১]

কঙ্কাবতী, শঙ্খিনীমালার রূপকথার ম্লান বিষণ্ণতা জীবনানন্দের কাব্যজগতের এক অতি পরিচিত বিষয়। সেই কাব্যজগতই প্রায় অবিকৃতভাবে উঠে এসেছে এই কবিতাটির মধ্যে। ‘রৌদ্রে’ কবিতাটির ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধতা, শব্দচয়ন এবং ভাবগত দিক থেকে জীবনানন্দীয় জগতের ছায়া প্রকট হয়ে উঠেছে। শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট-

“পৃথিবীর কাজে ব্যস্ত, ভিজে মুখ দুপুরের ঘামে
আকাশ রয়েছে ভরে নীল রৌদ্রে
শরীরের দীপ্তি তার ক্লান্ত হয়ে আছে।
ক্লান্ত হয়ে অবসরে ক্ষণিক বিশ্রামে
চেয়ে থাকে বহু দূরে বহু দূরে ঘুরে আসে অলস মেঘের কাছে
জেগে থাকা অবসরে নয়-
একদিন চুপিচুপি কাছে যদি যেতে পারি
জ্যোৎস্নার নিচে তার ঘুমের সময়!”[১২২]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই রূপ জীবনানন্দের কবিতায় বহুল ব্যবহৃত। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জীবনানন্দের কবিতায় বারংবার ব্যবহৃত কিছু শব্দ যেমন – ক্লান্ত, অবসর, জ্যোৎস্না, নীল, রৌদ্র, শরীরের, একদিন প্রভৃতি শব্দ এবং এই শব্দগুলির জীবনানন্দীয় স্টাইলে বিন্যাসে জীবনানন্দ সুলভ পুনরাবৃত্তি যার সঙ্গে উদ্দীপক হিসেবে যোগ হয় ভাবগত মিল। এই সমস্ত কারণে কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কানে গুনগুন করে জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে এর শ্রুতিগত সাদৃশ্য। প্রকৃতপক্ষে *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যগ্রন্থের যে ক'টি কবিতা বিনয়ের প্রথম দিকের কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে তার সবকটির মধ্যেই জীবনানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রকরণ এবং ভাব উভয় দিক থেকেই এই কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দকে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অনুকরণের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

৩

বিনয় মজুমদারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *গায়ত্রীকে* (১ম সংস্করণ মার্চ ১৯৬১) ২য় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পরিণত হয় *ফিরে এসো, চাকা* (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) তে। তৃতীয় সংস্করণে তা হয়ে যায় আমার ঈশ্বরীকে (১৩ জুন, ১৯৬৪)। শেষে তা আবার হয়ে ওঠে *ফিরে এসো, চাকা* (প্রথম অরুণা সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। *নক্ষত্রের আলোয়* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে বিনয়ের নিজস্ব শৈলী, কাব্যভাষা প্রায় দানা বাঁধেনি কিন্তু *ফিরে এসো, চাকা* তে সেই আয়োজন সম্পূর্ণ। *নক্ষত্রের আলোয়* –এর কবিতাগুলিতে বিনয় যে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়েও সাবলীলভাবে বলতে পারেননি,

নিজস্ব কাব্যভাষা খুঁজে না পেয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন জীবনানন্দের কাব্যভাষার কাছে, *ফিরে এসো, চাকা* -র কবি সেই আড়ষ্টতাকে বিসর্জন দিয়ে, জীবনানন্দের কাব্যভাষার অধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ কাব্যভাষা ও শৈলীকে ব্যবহার করে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ভাষা ও শৈলী। জীবনানন্দের ভূমিকা এখানে অনুঘটকের যার সাহায্যে বিনয় ত্বরান্বিত করতে পেরেছেন নিজস্ব কাব্যজগতের নির্মাণকে। জীবনানন্দীয় শৈলীকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে তিনি সুনিয়ন্ত্রিত। *নক্ষত্রের আলোয়* -এর মতো *ফিরে এসো, চাকা* তেও কবি তার প্রেমকে পেয়েও হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই প্রেমিকা জীবনানন্দীয় চেতনাজগতের বাসিন্দা হয়েও আলো পেয়েছেন বিনয়ের নিজস্ব অনুভূতিদেশ থেকে। এখানেই *নক্ষত্রের আলোয়* এর সাথে *ফিরে এসো,চাকা* -র পার্থক্য। *ফিরে এসো, চাকা* –র '২২ জুন, ১৯৬২' শীর্ষক কবিতায় বিনয়ের প্রেমিকা মনোলীনা-যা মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের 'আকাশলীনা'কে। কিন্তু কবিতাতে সেই প্রেমিকাকে 'মনোলীনা' বলে ডাকার পাশাপাশি তিনি সম্বোধন করেন 'চাকা' বলে-

"কেন, মনোলীনা, কেন বলো চাকা, কী হেতু তাকাবো?"[১২৩]

ঐ গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠার সম শিরোনামের পরবর্তী কবিতায় তিনি লিখছেন-

"আজো তা-ই মনে হয়; তবু তুমি পৃথিবীতে আছো।"[১২৪]

শেষ পঙ্ক্তিটি যতনা জীবনানন্দের 'শঙ্খমালা' কবিতাকে মনে পড়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ে যায় জীবনানন্দের সুরঞ্জনা' কবিতার সেই পঙ্ক্তির কাছে-

"সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো।"[১২৫]

অর্থাৎ, *ফিরে এসো, চাকা* -র কবিতাগুলোতে জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণের বিষয়টি *নক্ষত্রের আলোয়* -এর মতো অত সরাসরি, স্পষ্ট নয় বরং অনেক বেশি জটিল। বিনয়ের নিজস্ব কাব্যভাষা এই গ্রন্থে অনেক বেশি মাত্রায় পরিণত। যদিও তা তখনো স্বমহিমায় পুরোপুরি ভাস্বর হয়নি, তার জন্য পাঠককে পৌঁছাতে হবে *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -এর কবিতাগুলির দুয়ারে। তবু, পূর্বের তুলনায় অনেক সফলভাবে এক্ষেত্রে বিনয় জীবনানন্দের কাব্যভাষা, শৈলী, উপমা, শব্দ, ভাবকে নিজের করে তুলতে পেরেছেন। তাই 'মনোলীনা' সম্বোধনের পাশে অনায়াসে তিনি রাখতে পারেন 'চাকা' সম্বোধনকে। এর পাশাপাশি এখানে এই প্রথম পাওয়া গেল বিশেষ শৈলী, উপমা সমৃদ্ধ কিছু অবিস্মরণীয় পঙ্ক্তি যা 'প্রকৃত প্রস্তাবে' 'বিনয়ীয়' হবার দাবি রাখে। যেমন-

> "তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে
> চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।"[১২৬]

উপরের পঙ্ক্তিগুলি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল-

> "বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে দূরে (দাঁড়িয়ে) চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা এই অবাক এবং ধর্মপ্রাণ বক্তব্য দিয়ে 'গায়ত্রীকে' লিখিত।"[১২৭]

আলোচ্য পঙ্ক্তির মধ্যে বিষাদের যে আবহমানতা রয়েছে তাকে বিনয় প্রকৃতির রূপকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে শাশ্বত ট্র্যাজিক পরিণতির সম্ভাবনার কথা ভেবে

শিহরিত হতে হয় পাঠককে। এ প্রসঙ্গে মনে আসে ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের সে অবিস্মরণীয় কথাগুলি-

> “কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হতে চাহি সে আপনার মানস সরোবরে অগম তীরে বাস করিতেছে।”[১২৮]

ঐ একই প্রবন্ধের অনত্র তিনি লিখছেন-

> “আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দন্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি; মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা-যাহাতে মনে করাইয়া দেয়,কাছে আসিতে দেয় না- আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর ![১২৯]

মানব-মানবীর প্রেমের চিরকালীন বিরহের এই চিত্র বিনয়ের কবিতায় বৃক্ষের রূপকে বর্ণিত হয়েছে। মিলনের নিমিত্ত বৃক্ষের কাছে আশার উপায় নেই। মানুষ গমনে সক্ষম হয়েও কখনো কখনো পরিস্থিতি স্তব্ধ করে দেয় তার গমনোদ্যোগকে। মিলনের কথা তার কাছে হয়ে ওঠে শ্বাসরোধী। এই বিশেষণটির প্রয়োগ দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত যেহেতু মিলন অসম্ভব, তাই মিলনের কথা ভাবলে দুঃখে বেদনায় বৃক্ষের শ্বাস যেন রোধ হয়ে আসছে। তাই মিলনের কথা শ্বাসরোধী। দ্বিতীয়ত মিলনের শরীরী প্রক্রিয়া রুদ্ধশ্বাস বা রোমাঞ্চকর বলে সেই মিলনের কথা বৃক্ষ রুদ্ধশ্বাস হয়ে কল্পনা করছে। বিনয়ের কবিতায় শরীরী রূপকের ব্যবহার মোটেও অপ্রতুল নয়। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যেও এই ধরনের

রূপকের ব্যবহার করা হয়ছে। 'হরিতকী ফল' কিংবা 'মলিনবর্ণ ফল' এর মতো শব্দ এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় উঠে এসেছে পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রতীক হিসেবে। যেমন-

"আমিও হতাশাবোধে,অবক্ষয়ে ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে

মাটিতে শুয়েছি একা- কীটদ্রষ্ট, নষ্ট খোসা,শাঁস।

হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো, কী মলিনবর্ণ ফল।"[১৩০]

ফিরে এসো, চাকা -র '৩ মার্চ ১৯৬২' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তু স্বয়ং জীবনানন্দ। এই কবিতাটি থেকে বিনয়ের জীবনানন্দ সম্পর্কিত বোধের স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে-

"ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে

কতিপয় চিল শুধু বলেছিল, 'এই জন্মদিন'।

এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ

দর্শনে বিফল ব'লে, ভেবেছিল,অক্ষমের গান"[১৩১]

চিলের দৃষ্টিশক্তি সুতীক্ষ্ণ। অনেক উচ্চতা থেকে সে দর্শনে সক্ষম। কিন্তু পায়রার সে ক্ষমতা নেই। যদিও চিলের সংখ্যা কম, পায়রা সংখ্যা অগণন। অর্থাৎ, জীবনানন্দ সম্পর্কে বিনয়ের প্রাথমিক বক্তব্য এই যে, কবিজীবনের প্রথম পর্বে সামান্য কয়েকজন প্রকৃত বোদ্ধা সমালোচক ছাড়া কেউই তার কবিত্বশক্তিকে চিনতে পারেনি। প্রাথমিকভাবে স্বীকৃতি পাননি তিনি।

জীবনানন্দ সম্পর্কে বিনয়ের এই বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকভাবে মোটেও অসত্য নয়। প্রথম জীবনে বুদ্ধদেব বসু কিংবা পরবর্তীকালে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আরো পরে ভূমেন্দ্র গুহ কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই রকম গুটিকতক মানুষ ছাড়া কেউই তাঁর কবিকৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি বরং আক্রমণকারীরা দলে অনেক বেশি ভারী ছিলেন। সজনীকান্ত দাশের কথা চেড়ে দিলেও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো অনুজ কবিরাও তাঁর কবিতাকে 'আত্মঘাতী ক্লান্তিযুক্ত' বলে সমালোচনা করেছেন। সব মিলিয়ে শুধু সূচনাপর্বেই নয়, পরবর্তীকালেও বহু দিনই তাঁর কবিতা উপেক্ষিতই থেকে গেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমালোচকের কাছে।

ঐ কবিতার পরবর্তী অংশে বিনয় বলছেন-

"মেঘমালা ভিতরে জটিল
পুঞ্জীভূত বাষ্পময়, তবুও দৃশ্যত শান্ত, শ্বেত,
বৃষ্টির নিমিত্ত ছিলো, এখনো রয়েছে, চিরকাল
রয়ে যাবে।"[১৩২]

এক্ষেত্রে বিনয়ের বক্তব্য হলো জীবনানন্দের কবিতার আপাত বাহ্যিক শান্ততার ভিতরে রয়েছে এক প্রবল জটিল আলোড়ন, এক চিরস্থায়ী শান্তিহীনতা। সেই কাব্যকে দেখে প্রাথমিকভাবে প্রশান্তির কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আধুনিক মানুষের সংশয়ী বোধের দ্বিধাদ্বন্দ্বে সদাই অশান্ত। কারণ সময়ের মধ্যেও অনুপস্থিত সেই শান্তি। এই কারণেই হয়ত দীপ্তি ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছিলেন- "এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ।"[১৩৩] বিনয়ের

জীবনানন্দ "সংশয়ে দুলে দুলে একই রূপ বিভিন্ন আলোকে/ দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ।"[১৩৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন জীবনানন্দের কবিতা পড়ার পর রবীন্দ্রনাথের জীবনানন্দকে লেখা চিঠির অংশ, যেখানে তিনি লিখছেন-" বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।"[১৩৫] অর্থাৎ বলাই যায় যে বিনয়ের মতো রবীন্দ্রনাথও জীবনানন্দের কবিতার মধ্যের সংশয়ী রূপটিকে অনুধাবন করেছিলেন। তফাৎ শুধু এই যে বিনয় যেখানে এই রূপকে প্রশংস দৃষ্টিতে দেখছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্যকে সমালোচনা করছেন।ঐ পত্রের জবাবে জীবনানন্দ লিখেছেন-

> "পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসচে।অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই।... প্রাচীন গ্রীকেরা *Serenity* জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন।তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে । কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের *divine Comedy*-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর *serenity* বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না।"[১৩৬]

বিনয় জীবনানন্দের কাব্যে আপাত শান্ততার ভেতরে যে তুমুল সংশয়ী দ্বন্দ্ব খুঁজে পেয়েছেন, যাকে জীবনানন্দের ভাষায় 'অন্য ধরনের সুর' বলা যায়, *ফিরে এসো, চাকা* -র অধিকাংশ

কবিতাতেই শোনা যায় তার অনুরণন। জীবনানন্দের মতো মিশ্রকলাবৃত্তের গুরু নিতম্বিনী কায়ার গজেন্দ্র গমনে বিনয়ের কবিতার শরীর যতই শ্লথ অভিজাত শান্ততার আবরণ লাভ করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে সেই কবিতার রমণোম্মুখ হৃদয় আবেগের উচ্ছ্বাসে ভরপুর। আর এই রমণোন্মুখিনতা আরো বেশি করে প্রকট হয়েছে বিনয়ের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে যার নাম - *ঈশ্বরীর* (১৯৬৪)।

৪

প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত বিনয়ের কাব্যসমগ্র ১ ও ২ এর সম্পাদক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় *কাব্যসমগ্র -১* এ লিখছেন-

> "ঈশ্বরীর কাব্যগ্রন্থ পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে বিনয় এই গ্রন্থে নিজেকেই ঈশ্বর ভাবছেন এবং তাঁর অন্বিষ্ঠ 'ঈশ্বরী'কে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন ...নিজেকে ঈশ্বর ভেবে বা ঈশ্বরীকে নিজের মধ্যে কল্পনা করে মহৎ কবিতাও হয়তো রচনা করা যায়, কিন্তু *ঈশ্বরীর* গ্রন্থের কবিতার পর কবিতায় দেখি বিনয় তাঁর নিজেরই মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে মানস-সঙ্গমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন... ফিরে এসো,চাকা-র অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন কবির কোনো চিহ্নই *ঈশ্বরীর* গ্রন্থে পাওয়া যাবে না"[১৩৭]

উপরের মন্তব্যটিকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করলে দেখা যাবে এর প্রথম অংশটি কিছুটা পরস্পর বিরোধী। বিনয় যদি নিজেকেই ঈশ্বর ভাবেন তাহলে নিজের মধ্যে ঈশ্বরীকে

সন্ধান করতে যাবেন কেন? আর কোনো গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে।কাব্যগ্রন্থ কোনও উপন্যাস নয় এবং তার মধ্যের কবিতাগুলি কোনো পরিচ্ছেদ নয় যে ‘শেষ পর্যন্ত’ তার মধ্যে কবির কিছু খুঁজে বের করার দায় থাকবে।মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশে ‘কিন্তু’ অব্যয় ব্যবহার করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন মহৎ কবিতা এবং সঙ্গম বর্ণনার মধ্যে, যদিও সে সঙ্গম তার নিজের মতেই ‘মানস-সঙ্গম’।কবিতায় সঙ্গমের বর্ণনা থাকলে যে তা কবিতার মহত্ব সৃষ্টিতে কোনো বাধা উৎপন্ন করতে পারে, আধুনিক পাঠক তা মনে করে না। পরিচয় পত্রিকার মাঘ ১৩৩৮ সংখ্যায় জীবনানন্দের ‘ক্যাম্পে’ কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর তাকে অশ্লীলতার দায়ে দুষ্ট করে শনিবারের চিঠিতে সমালোচনা করেন সজনীকান্ত দাস।এর বিরোধিতায় ১৩৩৯ এ জীবনানন্দ লেখেন-

> “ Prurient মন যাদের সবসময়ই সব জায়গায়ই সব কিছুর ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করার অবাধ শক্তি তাদের রয়েছে; এই তাদের একমাত্র শক্তি।”[১৩৮]

আর শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের শেষাংশ নিয়ে বলা যায় যে বিনয়ের কি প্রতিভা ফিরে এসো, চাকা-য় মোটেই অলৌকিক হয়ে ওঠেনি বরং ওই কাব্যগ্রন্থে তার নিজস্ব কাব্যভাষা সবে গঠনের পথে। ঈশ্বরীর গ্রন্থে এসে সেই গঠন আরো সুগঠিত হয়েছে।সুতরাং মানসী কিংবা মানুষী যার সঙ্গমই এর বিষয়বস্তু হোক না কেন, এই কাব্যগ্রন্থটিকে পাঠক কখনোই অস্বীকার করতে পারেনা।

বিনয়ের পরবর্তী স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ *অধিকন্তু* (১৯৬৭)। কবির মতে "অধিকন্তু বইখানি আসলে ছন্দে লেখা প্রবন্ধ।"[১৩৯] কিন্তু পাঠকের মনে হয় শুধু কালগত দিক থেকেই নয় বরং বিষয় ও শৈলীর দিক থেকেও পূর্ববর্তী *ঈশ্বরীর* এবং পরবর্তী *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (শ্রাবণ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ) –এর মধ্যে *অধিকন্তু* (১৯৬৭) একটি সেতুর কাজ করেছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭ পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় জুড়ে এর কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। ফলে এর প্রথম দিকের কবিতাগুলোর মধ্যে যেমন পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের ঈশ্বরীকে পাওয়া যায়, তেমনি আবার শেষার্ধের কবিতা মনে করায় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ এবং পরবর্তী *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -কে। এগুলি যেন *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -র সমুজ্জ্বল বিনয়ীয় শৈলীতে লেখা দীর্ঘ কবিতাগুলির পূর্ব প্রস্তুতি। আবার প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় ঈশ্বরীর উল্লেখ মিললেও সেগুলিতে *ঈশ্বরীর* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মতো ঈশ্বরীর সাথে সঙ্গমলিপ্সা ও যৌনতা অনুপস্থিত। বরং গণিত ও বস্তুজগতের বিভিন্ন নিয়ম ও জীব প্রকৃতিকে বিনয় এই কাব্যগ্রন্থে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। কখনো প্রকৃতির কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানে ব্যস্ত তিনি ও ঈশ্বরী-

> "আমার ও ঈশ্বরীর প্রায়াবচেতনা আর অতিচেতনার
> ক্ষণিক চিন্তার ফলে, দীর্ঘস্থায়ী কামনার ফলে উভয়েই
> বস্তুকে বিলীন হতে এবং বস্তুকে জাত-আবির্ভূত হতে
> দেখেছি অনেকবার,..." [১৪০]

কিংবা কবিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে গাণিতিক দর্শনের উপস্থিতি-

"সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী
পৃথকতা থেকে এসে একীভূত হবার নিয়মে
কিছু পরিবর্তীদের বহিষ্কারে শেষে নিয়ে আসে
সম্ভব স্বাধীনতার রূপতল, আকার, প্রকৃতি-"[১৪১]

বিনয়ের কাব্যশৈলীর যাত্রা শুরু হচ্ছে জীবনানন্দকে অনুসরণ এবং স্থানে স্থানে অনুকরণের মাধ্যমে।তারপর সেই জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ ক্রমশ ধূসর থেকে ধূসরতর হতে লাগলো আর সেই সঙ্গে একটু একটু করে উজ্জ্বল হতে থাকলো গণিতের উপস্থিতি।গণিত দর্শন, গাণিতিক উপমার সাহায্যে জীবনানন্দীয় শৈলীর অধঃক্ষেপ (residual)কে ব্যবহার করে বিনয় সৃষ্টি করলেন তার নিজস্ব কাব্যভাষা ও শৈলী।এইভাবে উভয়ের বিক্রিয়ায় জাত এই শৈলীর উৎকর্ষের উজ্জ্বলতম উদাহরণ পাওয়া যাবে বিনয়ের বহু আলোচিত এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -র কবিতায়।

৫

অঘ্রানের অনুভূতিমালা -এর প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ। প্রকাশক অরুণা প্রকাশনী। এই গ্রন্থে বিনয়ের কাব্যভাষা সুপরিণত। ছ'টি সুদীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়ে বিনয়ের জীবনদর্শন, কাব্যদর্শন, বিশ্ব চরাচর আর প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ তথা সংযোগহীনতার অব্যক্ত কথা এখানে সুনিপূণ শৈলীতে পরিস্ফুট হয়েছে। কোনো কবিতারই নামকরণ করা হয়নি। কবির দাবি অনুসারে এর কবিতাগুলি নারী ভূমিকা বর্জিত। একথা অবশ্য সত্য যে ফিরে এসো,

চাকা -র মতো এ গ্রন্থের কবিতাগুলি কোনো নারীকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়নি এবং *ঈশ্বরীর* গ্রন্থের মতো বিনয় এখানে কোনো নারীর হাতে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণও করেননি। কিন্তু নারীর অস্তিত্ব এ গ্রন্থে পুরোপুরি বর্জিত হয়েছে একথাও মেনে নেওয়া চলে না কারণ প্রথম কবিতাতেই কবি বলে ওঠেন-

"...বাস্তব বিশ্বের মতো হয়ে আমাদের

মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে, মানসের বিশ্বও বাস্তব।

সকল মানসী তাই নির্ভুল অস্তিত্বময়ী.."[১৪২].

কিংবা ঐ একই কবিতায় তিনি বলেন-

"সেই হেতু এ অঘ্রান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।

মানস সুন্দরীগুলি এ প্রকারে সুখ পায়, ব্যথা পেতে পারে;"[১৪৩]

জননের প্রক্রিয়া যে কোনোভাবেই নারীভূমিকা বর্জিত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এই গ্রন্থের ৩ সংখ্যক কবিতায় সরাসরি উঠে আসে শঙ্খমালার কথা- জীবনানন্দের সেই শঙ্খমালা যার রূপকথার জগতকে বিনয় উপভোগ করেছিলেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮) এর কবিতাতে। তারপর ফিরে এসো, চাকা-র মধ্যেও উল্লেখ মিলেছে এই নারীর। *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -র এই কবিতায় সেই নারী একই সঙ্গে শঙ্খমালা এবং বকুল-

"বকুলের আকারের মতো এক নারী আছে- শঙ্খমালা আছে,

জীবন রয়েছে তার, উড়ে উড়ে নেচে- নেচে কত গান গায়,

কত রূপকথা করে, শরমে রঙিন হয়ে হয়তো বা বলে,

'তুমি কি ভেবেছো আমি এই মেয়েটির দেহে – শরীরের ফাঁকে

ফুটে থাকা ফুল শুধু, হতে পারে,ঠিক কথা হতে পারে তাও;

তাহলেও আমি এক আলাদা রমণী,একা একাই বকুল"[১৪৪]

সুতরাং একথা এখন স্পষ্ট যে গ্রন্থটি নারীভূমিকা বর্জিত তো নয়ই, বরং *ঈশ্বরীর* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কিংবা পরবর্তীকালের *বাল্মীকির কবিতা* -য় আরো বেশি করে যেভাবে নারীদেহ ও যৌনতা সোচ্চারে প্রচারিত হয়েছে,এই গ্রন্থে সবচেয়ে ভালভাবে তাকে গণিত দর্শন ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপকের সাহায্যে কাব্যিক মোড়কে ঢেকে দিতে পেরেছেন বিনয়।

৬

হেমন্ত জীবনানন্দের এক অতি প্রিয় ঋতু। তার কাছে হেমন্ত প্রেম, প্রজনন, পরিপক্কতার দ্যোতক হয়ে ওঠার পাশাপাশি বয়ে আনে মৃত্যুভয়-

"অঘ্রান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে,

সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে

হেমন্ত এসেছে তবু;..."[১৪৫]

এখানে হেমন্ত যেন প্রেম বা প্রজনন ঋতু। আবার *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থেরই 'দুজন' কবিতাতে তিনি লিখছেন-

"হেমন্ত আসিয়া গেছে;-চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে-শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে"[১৪৬]

আবার 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনানন্দের হেমন্তের রূপ ভিন্ন-

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা।"[১৪৭]

শেষ দুটি কবিতায় হেমন্ত আবার ক্ষয়, মৃত্যু, শূন্যতার প্রতীক হয়ে গেছে। এইভাবে জীবনানন্দের বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় হেমন্তের বহুবিধ রূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বর্ণিত হলেও তা শেষমেশ মানব জীবনকেই ইঙ্গিত করেছে। প্রাকৃতিক বিবরণের হৈমন্তিক অনুভূতিমালা মানবজীবনের প্রেম, প্রজনন,পরিবেশকে উপলব্ধি করেছে বারংবার বিভিন্ন ভাবে। বিনয়ের হৈমন্তী অনুভূতি সকল একটিমাত্র গ্রন্থের ছয়টি সুদীর্ঘ কবিতায় বর্ণিত হলেও তার মধ্যেও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বর্ণনার মাধ্যমে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, শরীরী অনুভূতি প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত

হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী শরীরের রূপকাশ্রিত বর্ণনা এবং দেহজ কামনার সুতীব্র বাসনাবলী। দু-একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে-

“বলেছি দিনের বেলা চূড়ান্ত উপরে উঠে হাত বোলাবার ইচ্ছা হয়
চূড়ার উপরে হাত বোলাবার ইচ্ছা হয় খুব নেড়ে দিতে,
লতাপাতা ঘাসগুলি নিয়ে সারাদিন ব’সে দুই হাতে আনমনে খেলা ক’রে যেতে”[১৪৮]

কিংবা-

“দরকারি বকুলের কুঁড়িগুলি শাদা শাদা গোল –গোল কুঁড়ি-
এই কথা বকুলের কাছে আমি চোখ বুজে ব’লে ফেললামঃ
বলি, ও বকুল, তুমি বোঝো নাকি কুঁড়িগুলি খুব বেশি ছোটো,
আরো ঢের বড়ো –বড়ো নরম-নরম গোল হবার কথা না?”[১৪৯]

এইসব উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে জীবনানন্দের হেমন্তের মতো বিনয়ের হেমন্তানুভূতিও প্রকৃতির রূপকের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের দিকে যাত্রা করেছে। কিন্তু জীবনানন্দের থেকে বিনয়ের অনুভূতিমালা অনেক বেশি ইন্দ্রিয়ঘন এবং যৌন শরীরময়তায় সার্দ্র। গণিত দর্শন প্রয়োগের দিক থেকেও বিনয় স্বতন্ত্র। আর মৃত্যুচেতনা বিনয়ের এই গ্রন্থের কবিতায় যে একেবারে অনুপস্থিত তা নয় কিন্তু তার পরিমাণ জীবনানন্দের থেকে অনেক কম। এ বিষয়ে সামান্য দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে-

“মৃতদেহে মন থাকে,খুব কম কম মন সকল মৃতের দেহে থাকে।” [১৫০]

কিংবা,

“পুরোপুরি ম’রে গেছি, নিস্পন্দ নিথর হয়ে এ-সকল সত্য কথা ভাবি।”[১৫১]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে বিনয়ের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের কবিতাতেও জীবনানন্দীয় চেতনার আত্তীকরণ ঘটেছে। একে প্রভাব না বলে প্রতিগ্রহণ বলাই শ্রেয়। কারণ বিনয় একে নিজস্ব গণিত দর্শন এবং শরীরময়তা দিয়ে নিয়ে গেছেন এক অন্যজগতে,যোগ করেছেন বিনয়ীয় মাত্রা।

৭

অঘ্রানের অনুভূতিমালা প্রকাশের ঠিক দু’বছর পরে প্রকাশিত হয় বিনয়ের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি উত্তম পুরুষে রচিত এবং কবি স্বয়ং যৌনসংসর্গকারী হিসেবে নিজের ও তার যৌনসঙ্গিনীর বিবরণ দিচ্ছেন। এই ধরনের বিষয় নিয়ে কবিতা বিনয় ঈশ্বরীর গ্রন্থ থেকেই শুরু করেছিলেন। *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -র মধ্যেও যৌনতা ছিল কিন্তু তার তীব্র রৌদ্রকরকে ঢেকে রেখেছিল কাব্যিক মোড়ক। *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩) এ এসে সেই মোড়ক গেল সরে। প্রকাশিত হবার পর অশ্লীলতার দায়ে পুলিশি হস্তক্ষেপে বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।এই কাব্যগ্রন্থের চাঁদ ও ভুট্টা সিরিজের কিছু কবিতাতে আদিরসের বাড়াবাড়ি রয়েছে এবং কাব্যগুণ প্রায় অনুপস্থিত একথা স্বীকার করে নিলেও বলা যায় যে এই গ্রন্থের অন্তত চল্লিশটি কবিতা কাব্যগুণ সম্পন্ন এবং অশ্লীলতার দোষমুক্ত। যেমন- ‘টেবিলে রোদের ফোঁটা’, ‘মহাচীনের ঘোড়া ও আরও তিনটি’, ‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা’, ‘কবিতার খসড়া/১’, ‘কবিতার খসড়া/২’, ‘জলপিপি’, ‘গমত্ত্ব’, এবং আরো অনেক। জীবনানন্দীয় শৈলী, ভাষা, উপমা, চিত্রকল্পের যে

ব্যবহার *ফিরে এসো,চাকা* -র কবিতায় দেখা গিয়েছিল, তা পুনরায় এইসব কবিতার মধ্যে ফিরে এসেছে-

“সেই বহুদিনব্যাপী বিপন্ন মরালটির দেহ থেকে মাংস আর মেদ
কখন গিয়েছে ঝ’রে প’ড়ে আছে সে তো প্রায় ওড়ায় অক্ষম
বিশুষ্ক হবার আগে রসাবিষ্ট হরীতকী ফল”[১৫২]

কিংবা,

“একে একে নিভে যাবে আমাদের সাদামাটা রঙ
আমরা সকলে মিলে হবো সেই মেয়েটির খয়েরি হৃদয়
কারণ সত্যি সবে সেই মেয়েটির মন অন্য কিছু নয়।”[১৫৩]

খয়েরি যখন হৃদয়ের রঙ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে বলতে হয় ইন্দ্রিয়-বিপর্যাস আর তাই পাঠকের মনে পড়ে জীবনানন্দের কথা-শালিখের হৃদয়ের কথা। এখানে ‘খয়েরি’ যেমন একদিকে মলিনতার প্রতীক-যা আসছে জীবনানন্দ থেকে, তেমনই আবার মলিন হলেও খয়েরি সমস্ত রঙ ক্ষয়ে যাবার পর অবশিষ্ট পরিবর্তিত বিশেষ রঙ যা পাওয়া যাচ্ছে ‘সাদামাটা রঙ’ হারিয়ে যাবার পর। এখানেই বিনয়ের স্বকীয়তা। খয়েরি যেন এখানে শাশ্বত-র প্রতীক-যা একান্তভাবেই বিনয়ীয়। আবার , ‘মহাচীনের ঘোড়া ও আরও তিনটি’ কবিতাতে –

“ঘোড়াগুলি উড়িতেছে এইখানে এশিয়ার উপরে অথবা
আমরাই উড়িয়েছি, ঘোড়া, ঘোড়া, জানো নাকি এইখানে

ঝ'রে গেছে অনেক নৃপতি

দূর সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে ইয়াংসির জলে স্নান সেরে

ফের ফিরে যেতো তারা অর্থাৎ আসিত তারা সিন্ধুতেই নিজেদের স্নাননীয় রতি"[১৫৪]

কবিতাটির শুরুর দিকটি মনে পড়ায় জীবনানন্দের 'শকুন' কবিতাটিকে-

"মাঠ থেকে মাঠে মাঠে, এশিয়ার আকাশে আকাশে

শকুনেরা চরিতেছে..."[১৫৫]

পঙ্‌ক্তিটি শৈলীর দিক থেকে বহন করছে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। 'শকুন' এখানে হয়েছে 'ঘোড়া'। একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতেও জীবনানন্দীয় শৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'ঝ'রে গেছে', 'দূর সিন্ধু' প্রভৃতি শব্দচয়ন জীবনানন্দকেই মনে পড়ায়। তাছাড়া কবিতাটির ভাবের মধ্যে জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনার সন্ধান মেলে। তার ওপর ঘোড়ার ঐতিহাসিকতা স্মরণ করায় জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের 'ঘোড়া' কবিতাকে প্রস্তরযুগের ঘোড়ারা মহীনের ঘোড়া হয়ে আজও "ঘাসের লোভে চরে/পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর' পরে।"[১৫৬] এ প্রসঙ্গে মহীনের ঘোড়ার সাথে মহাচীনের ঘোড়ার শব্দগত সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য। এইভাবে বলা যায়, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের যে সংরূপটি ধরা পড়ে তার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ব্যবহার *ফিরে এসো, চাকা* পর্বের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের।

প্রকৃতপক্ষে *বাল্মীকির কবিতা* পর্যন্তই বিনয়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের সুস্পষ্ট স্তর হিসেবে ধরা যায়। *নক্ষত্রের আলোয়* -কে যদি জীবনানন্দ-অনুকরণের পর্যায় বলে ভাবা যায় তাহলে বলা যায় যে, বিনয় *গায়ত্রীকে* থেকে *বাল্মীকির কবিতা* পর্যন্ত জীবনানন্দকে আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা করেছেন। বিনয়ের পরবর্তী মৌলিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাঝের সময়টা বেশ দীর্ঘ-প্রায় আট বছর. ১৩৯১ বঙ্গাব্দের ১ লা মাঘ *আমাদের বাগানে* এবং *আমি এই সভায়* নামে বিনয়ের একই সঙ্গে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সময় থেকে শুরু হচ্ছে এক অন্য বিনয়ের যাত্রা। এই নতুন কবি *এক পঙ্‌ক্তির কবিতা* (১৯৮৮) এবং *হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ* (২০০৩) ছাড়া অন্য সব কাব্যগ্রন্থে লিখতে চেয়েছেন উপমা, অলংকার বর্জিত দৈনন্দিন জীবনের অনাড়ম্বর বর্ণনা। তার কবিতা হয়ে উঠছে দিনলিপি। এই পর্বে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ একেবারেই অনুপস্থিত বলা চলে। এই কবিতাগুলির মধ্যে এবার গণিত মিশে যাচ্ছে ওতোপ্রোতভাবে। শুধু উপমা বর্জনই নয়, শেষ দিকের কবিতাগুলি অক্ষরবৃত্তেরও বন্ধন কাটিয়ে পরিণত হচ্ছে ছন্দবিহীন গদ্যকবিতায়। এগুলি শুধুই নতুন কবিতা লেখার পরীক্ষামূলক শৈলী নাকি কবির মানসিক অসুস্থতার কারণে লিখে ফেলা কিছু না-কবিতা, সে বিষয়ে অবশ্য প্রশ্ন থেকেই যায়। শুধু এটুকুই বলা যায় যে এই পর্বে জীবনানন্দের শিকড় ছেড়ে বিনয় প্রবেশ করেছেন এক নতুন স্বনির্মিত জগতে।

৮

ছন্দের বারান্দা গ্রন্থে শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দের কবিতার ছন্দ সম্পর্কে বলছেন

"এখনও পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে ধরা আছে জীবনানন্দের যে কবিতাগুলি, তার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। হিসেব নিলে দেখা যাবে এর অন্তর্গত ২৭৫ টি কবিতাই অক্ষরবৃত্তে লেখা, আর অন্যগুলি ছড়ানো আছে গদ্যছন্দে বা স্বরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে।"[১৫৭]

অপরদিকে 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে বিনয় লিখছেন-

"১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি।তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিইনি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারেই লিখি।"[১৫৮]

বিনয়ের এই বক্তব্যটি সম্পর্কে সম্পাদক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষটীকায় মন্তব্য করেছেন-

"এখানে 'পয়ার' বলতে বিনয় নিশ্চিতভাবেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বোঝাতে চাইছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে অনেকেই ভুল ক'রে 'পয়ার' বলে থাকেন। কিন্তু ৮+৬ মাত্রা (অর্থাৎ ৪+৪+৪+২ মাত্রা) চালের ছন্দকেই পয়ার বলা হয়। পয়ার অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত –এই ছন্দতেই লেখা যায়"[১৫৯]

বিনয় এবং জীবনানন্দ এই দুই অক্ষরবৃত্তপ্রেমিক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ভরে আছে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের নমুনাতে। তারপর কাব্যরচনা যত সাবালকত্বে পৌঁছেছে, বর্জিত হয়েছে এই ছন্দদ্বয় এবং উভয় কবিই কাছে টেনে নিয়েছেন অক্ষরবৃত্তকে। শেষের দিকে জীবনানন্দ যদিও স্বরবৃত্তে বেশ কিছু কবিতা লিখছেন *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থে কিন্তু সেই স্বরবৃত্তের প্রকৃতি একেবারেই আলাদা। বরং তাকে অক্ষরবৃত্তের মুখোশধারী

বললেও অত্যুক্তি হয়না। আর বিনয় *বাল্মীকির কবিতা* পরবর্তী পর্বে আশ্রয় নিচ্ছেন গদ্য কবিতার- কিন্তু সেই কবিতাগুলি কতটা কবিতা হয়ে উঠেছে তা নিয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অন্তত এটা বলা যায় যে উভয় কবিই নিজেদের সেরা সময়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্তের। তাছাড়া 'আমার ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিনয় যেভাবে শব্দের মাত্রা গণনা করেছেন তা কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রেই খাটে।যেমন- 'কঙ্কাল', 'খদ্যোৎ', 'পংকজ' প্রভৃতি দুটি রুদ্ধদল বিশিষ্ট শব্দে বিনয় তিনমাত্রা ধরেছেন। শুধু অক্ষরবৃত্তেই এগুলি তিনমাত্রা পাবে। (কারণ শব্দের আদির রুদ্ধদল ১ মাত্রা আর অন্তের ২ মাত্রা।মোট ১+২=৩ মাত্রা)। স্বরবৃত্তে এগুলির মাত্রা হবে ১+১=২ আর মাত্রাবৃত্তে ২+২=৪।সুতরাং বিনয়ের কাছে তাঁর কবিতার ছন্দ মানেই তাঁর ভাষায় 'পয়ার' অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র গ্রন্থে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় লিখছেন-

> "পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ। পয়ারের রীতিতে কোন কবিতা পাঠ করার সময়ে শুদ্ধ অক্ষরধ্বনি ছাড়াও একটা টানা সুর আসে। এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব।এই টানটুকুকে সংস্কৃত 'তান' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি (ইংরেজীতে Vocal drawl)। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে,কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে এবং স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়।উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার জাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ।"[১৬০]

অমূল্যধন যে ‘টান’ বা ‘তান’ বা ‘একটা টানা সুর’-এর কথা বলছেন, সেই ‘তান’ প্রয়োজন ছিল *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ও তৎপরবর্তী জীবনানন্দীয় কাব্যজগতের ধূসর শ্রান্ত আলস্যকে অনুভব করানোর জন্য। প্রয়োজন ছিল মৃত্যুচেতনার গভীর গভীরতর যন্ত্রণাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করানোর জন্য। প্রয়োজন ছিল প্রত্নপ্রেমিকাকে না পাওয়ার বিরহবেদনাকে বুকের ভিতরে পাথরের মতো লুকিয়ে রেখে ধ্বনি দিয়ে প্রতিধ্বনি শোনানোর জন্য। প্রয়োজন ছিল একটা টানা দীর্ঘ ধীর লয়ের সুরমূর্ছনার মধ্য দিয়ে এক সুদূরের রহস্যময় জগতকে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য। জীবনানন্দের অনেক পরিশ্রম ও সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তোলা এক সযত্নলালিত আলগা অলস আপাত অসতর্ক কাব্যপ্রকরণ যেন স্বমহিমায় বিকশিত হতে পারলো অক্ষরবৃত্তের এই ধীর লয়তা এই তানপ্রাধান্যের জন্যই। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন-

> “তখন আমরা লক্ষ করি যে জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত প্রথম থেকেই টেনে আনতে চায় এমন একটা আবহ, এমন একটা একটানা সুর, বাংলা কবিতায় যা নূতন। বৃত্তে তিনি সবার সঙ্গে সমান, কিন্তু তার স্পন্দনে নয়। একসময়ে কবিতার ছিল একটা আঁটোগড়ন, সমান মাপের পঙ্‌ক্তিবন্ধনে তার ভাস্কর্য ছিল স্থির, সহজ ছিল কবিতার একটা ভারী আর জমকালো আওয়াজ তৈরি করে তোলা। রবীন্দ্রনাথের হাতে একদিন অক্ষরবৃত্তের সে বন্ধন গেল খুলে। কিন্তু তখনও সেখানে যুক্তব্যঞ্জনের সংঘাতময় শব্দবিন্যাসে অথবা তার পঙ্‌ক্তিমাপের দ্রুতবদলে রয়ে গেল উত্থানপতনময় এক বন্ধুরতা। জীবনানন্দ তাঁর অক্ষরবৃত্ত থেকে সরিয়ে নিলেন এই

উত্থানপতন, এই ব্যঞ্জন সংঘাতের প্রবলতা, এই জমকালো আওয়াজ। তাই তাঁর কবিতার ছন্দ থেকে বুদ্ধদেব বসুর মতো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে হঠাৎ, এ যেন 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।'

কূলভাঙা কোনো প্রবল জলোচ্ছ্বাস নয়, টলমলে জলের এই নিরর্গল প্রবাহ জীবনানন্দের কবিতাকে সবসময়ে ভিতরদিক থেকে টেনে নিয়ে যায়। তাই তাঁর অক্ষরবৃত্তের একটা লক্ষণ হয়ে ওঠে প্রসারণ, দীর্ঘ বিসর্পণ। চোদ্দ বা আঠারো মাত্রায় আর তিনি বেঁধে রাখেন না নিজেকে, তাঁর অক্ষরবৃত্তের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বাইশ থেকে ছাব্বিশ, ছাব্বিশ থেকে তিরিশে।"[১৬১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত কিভাবে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল, কিভাবেই বা তা বইতে পারলো জীবনানন্দীয় কাব্যভাবের ভার। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত হয়ে উঠেছিল একাধারে শান্তবৃত্ত, করুণবৃত্ত, অলসবৃত্ত এবং বিষাদবৃত্ত।

গায়ত্রীকে (১৯৬১) থেকে বিনয়ও জীবনানন্দের এই নবরূপের অক্ষরবৃত্তকে গ্রহণ করলেন। আর এই অক্ষরবৃত্ত তার দীর্ঘতম পঙ্‌ক্তিগুলি লাভ করলো *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -তে এসে। *গায়ত্রীকে* –এর বিরহবেদনাকে সুচারুভাবে বহন করলো জীবনানন্দীয় উত্থানপতন রহিত শান্ত সরলরৈখিক অক্ষরবৃত্ত। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ-

"তবুও কেন যে আজো,/হায় হাসি হায় দেবদারু
মানুষ নিকটে গেলে/প্রকৃত সারস উড়ে যায়।"[১৬২]

এগুলি ১৮ মাত্রার পঙ্‌ক্তির উদাহরণ।পদের মাত্রা বিন্যাস – ৮+১০=১৮

আরেকটি উদাহরণ-

"বর্ণাবলেপনগুলি/কাছে গেলে অতি স্থুল,/অর্থহীন বলে মনে হয়

অথচ আলেখ্যশ্রেণী/কিছুটা দূরত্ব হেতু/ মনোলোভা হয়ে ফুটে ওঠে।"[১৬৩]

এটি ২৬ মাত্রার উদাহরণ। প্রতিটি পর্বের মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+১০=২৬।

অঘ্রানের অনুভূতিমালা -তে বিনয়ের দীর্ঘ অক্ষরবৃত্তের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন-

"না নেড়ে ডানা নেড়ে/তোমারি কোলের ঊর্ধ্বে/উপরে আকাশে একা/উড়ে নিতে হয় [১৬৪]

এই পঙ্‌ক্তির মাত্রা সংখ্যা ৩০। ৩০ মাত্রার পঙ্‌ক্তিই সম্ভবত বিনয়ের দীর্ঘতম অক্ষরবৃত্তের উদাহরণ। এর পর্বের মাত্রাবিন্যাস-৮+৮+৮+৬=৩০। এই রকম আরো একটি ৩০ মাত্রার পঙ্‌ক্তির উদাহরণ-

"আমার কাছে এ তুমি/গোপন করো না,আমি/খতিয়ে খতিয়ে সব/অনেক দেখেছি।"[১৬৫]

এক্ষেত্রেও মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+৮+৬=৩০

জীবনানন্দের তুলনায় বিনয়ের অক্ষরবৃত্ত অনেকাংশেই একস্তরী, একমুখিন কিন্তু জীবনানন্দের মতো বিনয়ও মুক্তকের প্রবহমানতাকে ব্যবহার করে কাব্যে আনতে চেয়েছেন একটা শ্লথ মৃদুমন্দভাব। কাব্যের বিরহভাবকে প্রস্ফুটিত করার আর পাঠকের কাছে সেই ভাব বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই যেন বিনয়ের মুক্তক প্রধানত অন্ত্যমিল বর্জিত, অমিল মুক্তক।

এখানেই জীবনানন্দের সাথে তার প্রধান পার্থক্য কারণ জীবনানন্দ প্রধানত সমিল মুক্তকের কবি। অন্যদিকে বিনয়ের ক্ষেত্রে *নক্ষত্রের আলোয়* -কে বাদ দিলে একমাত্র *বাল্মীকির কবিতা* -র কয়েকটি কবিতায় অন্ত্যমিলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেমন- ‘জলপিপি’, ‘টেবিলে রোদের ফোঁটা’ ইত্যাদি। এই অমিল মুক্তকের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কোথাও যেন জীবনানন্দের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষের দিকে জীবনানন্দ যখন স্বরবৃত্ত নিয়ে নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, দামাল দলবৃত্তের গায়ে পরাতে চাইছেন অক্ষরবৃত্তের আঁটোসাটো পোশাক, বিনয় সেখানে *বাল্মীকির কবিতা* পরবর্তী সময়ে অক্ষরবৃত্তের হাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন গদ্যকবিতার ছন্দহীন জগতে। এখানেই উভয়ের পার্থক্য।

৯

কাব্যদর্শনের ক্ষেত্রেও বিনয়ের মধ্যে জীবনানন্দীয় চেতনাবোধের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে। শুধু কল্পনার আতিশয্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে যেমন কবিতা লেখা সম্ভবপর নয় তেমনি শুধু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিছক বিবরণকেই কবিতা বলা যায় না-এ দুই-এর উপরিপাত এবং মিথস্ক্রিয়াতেই যথার্থ কবিতার জন্ম হয়,-এ ব্যাপারে দুই কবিই একমত। জীবনানন্দের কাব্যে ‘আত্ম’র সঙ্গে ‘পর’ এর ,বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে নিজের যে অবিচ্ছেদ্য দূরত্ব তা থেকে জন্ম নেওয়া দুঃখ, বিরহ, হতাশাবোধ,নিজেকে অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে মেলাতে না পারার ক্লান্তি,প্রবল জীবনতৃষ্ণাকে বিনয় আত্মস্থ করেছে *গায়ত্রীকে (১৯৬১)* থেকে *বাল্মীকির কবিতা* পর্যন্ত। *নক্ষত্রের আলোয়* -কে গণ্য করা হচ্ছে না কারণ তা

পরিণত বিনয়ের জগৎ নয় বরং দ্বিতীয় জীবনানন্দের জগৎ। মনোলীনা তথা চাকার বিরহ বিনয় ভুলতে চাইছেন ঈশ্বরীর সঙ্গে প্রবল যৌনসঙ্গমের দ্বারা-যার পরিচয় পাওয়া যায় *ঈশ্বরীর* কাব্যগ্রন্থে। পরবর্তী গ্রন্থ *অধিকন্তু*-তে এসে যৌনবাসনা কিছুটা কমে গেলেও তা ফিরে আসছে *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -তে। প্রকৃতি, বিরহ,যৌনতা সেখানে এক অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর আবার *বাল্মীকির কবিতা* -র মধ্যে আবার কবিত্বকে ছাপিয়ে যাচ্ছে যৌনতা। আসলে চাকার বিরহবেদনা প্রশমিত করবার জন্যই বিনয়*ঈশ্বরীর* কাব্যগ্রন্থে। ঈশ্বরীর সঙ্গে যৌনমিলনের আশ্রয় নিচ্ছেন।কিন্তু কবি যেন সেই মানস-মিলনে তৃপ্ত নন তাই *অধিকন্তু*-তে যৌনতা কমে যাচ্ছে আর *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* -তে যৌনতার সঙ্গে অধিক সংযুক্ত হচ্ছে বিরহবোধ। কিন্তু সেখানেও অতৃপ্ত থেকে *বাল্মীকির কবিতা* -তে এসে বিনয় খুঁজছেন প্রায় কবিত্ব বর্জিত সোচ্চার যৌনমিলনের তৃপ্তি। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও *ধূসর পাণ্ডুলিপি* থেকে এই বিরহবোধের হতাশাকে জাগ্রত হতে দেখা যায়। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে জীবনানন্দের পার্থক্য এইখানেই যে তিনি বিনয়ের মতো বিরহবোধ ঘোচাতে যৌনমিলনের মতো সহজতম রাস্তায় হাঁটেননি বরং তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রকৃতি, ইতিহাস ও মৃত্যু চেতনার মধ্যে। বিরহকে দিয়েছেন ব্যাপ্তি,প্রসারতা, বহুস্তর। সে তুলনায় বিনয়ের বিরহ অনেক বেশি একমুখী সংকীর্ণ। জীবনানন্দের মতো প্রকৃতির মধ্যে বিরহকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রচুর অমোঘ পঙ্‌ক্তি রচনা করে *গায়ত্রীকে* বা *ফিরে এসো, চাকা* সৃষ্টি করলেও *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* ছাড়া এই বিরহী প্রকৃতির অসাধারণ জারণ আর দেখা গেল না। এখানে বিনয়ের সীমাবদ্ধতা।

জীবনানন্দের হেমন্ত বহুমাত্রিক। কখনো তা প্রেম, মিলন, প্রজনন ও যৌবনের ঋতু আবার কখনো তা বিরহের বিচ্ছেদের ঝ'রে যাবার কাল। কিন্তু বিনয়ের হেমন্ত এত ব্যাপক বহুস্তরী নয়। তা শুধুই "আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়'[১৬৬], ফলে বিনয়ের অঘ্রানে জাত সমস্ত অনুভূতিই যৌনানুভূতি। তাই হেমন্তের অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বিনয় প্রকৃতির মধ্যেও আবিষ্কার করেন যৌনচেতনা।বকুলের কুঁড়িও বয়ে আনে নারী শরীরের দ্যোতনা। জীবনানন্দের হেমন্ত প্রেমিকের চোখে দেখা প্রকৃতি প্রেমিকা কিন্তু বিনয়ের হেমন্ত কাম-জর্জর মিলন-লালায়িত পুরুষের চোখে দেখা প্রকৃতির নারী শরীর। তবু এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে জীবনানন্দের অনুকরণ দিয়ে কবিজীবন শুরু করেও শেষ পর্যন্ত যে তিনি কবি হিসেবে স্বতন্ত্র হতে পেরেছেন এবং নির্মাণ করতে পেরেছেন নিজস্ব কাব্যভাষা ও শৈলী সেটাই তার সার্থকতা। 'গণনাতীত পারাবত'[১৬৭] নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসের ধারায় তিনি হয়ে উঠেছেন একটি 'প্রকৃত সারস'[১৬৮]।

৪.৩ আরো তিনজন কবির কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

৪.৩.১ আলোক সরকারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে আলোক সরকার(১৯৩১) অন্যতম অগ্রজ কবি। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

> " পঞ্চাশ-দশকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ আলোক সরকারের 'উতল নির্জন' (মে ১৯৫০)। চল্লিশের কবিদের পাশে চোখে পড়ে তার একলার পৃথিবী :'নিঃসঙ্গ দুপুরে/বাগানে ধূসরবর্ণ ধুলো ওড়ে, শব্দ করে পাতা বলে ওঠে,' সে যেন মনের কথা পাতাদের- ফুটে উঠছে নির্জন আবেগে, 'মধ্যাহ্নে নিঝুম ছিঁড়ে শালিক বা দোয়েলের শিস'- প্রায় অছোঁয়া জগৎ যার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে 'নির্জন' 'নিঃসঙ্গ' আর 'একাকী' এই তিন শব্দ-মর্মর, প্রকৃতির সেই 'ঘরকরনার ভেতরে' বসে সবটুকু ভালোবাসা আর ভালোলাগা নিয়ে মাটির পুতুল গড়ছে কিশোর বালক, কবি লিখছেন, 'পড়ন্ত বেলার রোদে/ একাকী শালিক এক/দৃষ্টির বিস্ময় নিয়ে দিগন্তের সোনারঙ দেখে'।"[১৬৯]

উপরের উদ্ধৃতির শেষ অংশটির মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে আলোক সরকার পাঁচের সেইসব কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যাঁদের কবিতার মধ্যে 'নির্জনতা আছে।'[১৭০] কয়েকজনের মধ্যে থেকেও একাকিত্ব বোধ করা কবি তাই বলে ওঠেন-

> "অনেক দিন যেন একলা আছি

এখানে। হঠাৎ মনে হলো যখন হাওয়ার সময়

হলুদ পাতা জানলা দিয়ে উড়ে উদাস ঘরে এলো”[১৭১]

এই একাকিত্ব এবং নির্জনতার বোধ আলোক সরকারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের একটি প্রধান দিক। তাঁর কবিতার মধ্যে যে আপাত শান্ত নিসর্গের বর্ণনা ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে রয়ে গেছে এক গাঢ় বিষণ্নতার ছাপ- যার সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি-রূপসী বাংলা* পর্বের কবিতাগুলি। আলোকের একাকিত্বের বোধ মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতার সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তিগুলি-

“সকল লোকের মাঝে ব’সে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা ?

আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?

আমার পথেই শুধু বাধা ?”[১৭২]

কিংবা, ওই একই কবিতার-

“-তবু কেন এমন একাকী ?

তবু আমি এমন একাকী।”[১৭৩]

শুধু একাকিত্বের বোধেই নয়, আলোক সরকারের কবিতায় জীবনানন্দীয় পঙ্‌ক্তি কিংবা শব্দবন্ধের প্রয়োগ মোটেই বিরল নয়। দু-একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

> "আশ্চর্য হাওয়ার হাত সবুজ তরুণ আচ্ছাদন"[১৭৪]

উপরের উদাহরণে "হাওয়ার হাত" শব্দবন্ধটি মনে করায় জীবনানন্দের *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের "হাওয়ার রাত" কবিতাটির শিরোনামকে[১৭৫]। উভয় শব্দবন্ধের মধ্যে এমন সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে সর্বানুপ্রাসের আবহ। পরবর্তী উদাহরণে দেখি-

> "আমি তা নেব না কেন আমার যা নয়?
>
> রাত্রির নির্জনে নেমে অন্ধকারে মেঘেদের বনে
>
> হাজার কান্নার স্বর শুনিনি কি? বৈশাখের বিষণ্ন দুপুরে
>
> পথে পথে বাতাসের বিলাপের ধ্বনি?"[১৭৬]

নঞর্থক প্রশ্নবোধক বাক্য প্রয়োগ করে প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় বিবৃতিকেই প্রতিষ্ঠা প্রদানের এই কৌশলটি প্রকৃত প্রস্তাবেই জীবনানন্দীয়। বিশেষ করে উপরের উদ্ধৃতির তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটির প্রথম বাক্যাংশটি মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের "বোধ" কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি-

> "হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
>
> বাল্‌টিতে টানিনি কি জল?

কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে?"[১৭৭]

আলোক সরকারের প্রকৃতি চেতনার একটা অংশ জুড়ে আছেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতায় গাছ, নিঃসঙ্গতা আর প্রকৃতির বুকে লেগে থাকা বেদনার জীবনানন্দীয় জগত নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এবার আসা যাক হেমন্তের প্রসঙ্গে। জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের উপস্থিতির গভীর গভীরতর প্রভাব এড়াতে পারেন নি আলোক। তাই তাঁর কবিতাতেও বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে হেমন্তের কথা। কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

আলোকিত সমন্বয় গ্রন্থের একটি কবিতার শিরোনাম "হেমন্ত"। কবিতাটির শুরুতেই পাওয়া যাচ্ছে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণে ভরপুর এই নিম্মলিখিত পঙ্ক্তিগুলি-

"পথে নেমে দেখেছিলে দূরে-দূরে ছড়ানো নীল গাছ

ফুল ঝরছে ঘুঘুর ডাকের মতো।

নির্জনতা কখনো নয় সংহতির আতত উচ্ছ্বাস।

এবং বড়ো আকাশ যেন প্রতিশ্রুতি, উন্মোচিত যেন অন্ধকার

বনের ভিতর সহসা ঘন বিরলতায় উষ্ণ পরিণত"[১৭৮]

আবার, *অন্ধকার উৎসব* কাব্যগ্রন্থের "সঙ্গত নিরালা" কবিতায় কবি লিখছেন-

" হেমন্তের ঘাসে ঘাসে সচ্ছল শিশির। মেঘ নেই, সংহত আকাশ

যেন সেই বিকেলবেলা জানালায় ছড়িয়ে-দেওয়া চুল”[১৭৯]

উপরের উদ্ধৃতির প্রথমাংশের মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবু পঙ্‌ক্তিটি জীবনানন্দের প্রভাবে হারিয়ে যায় নি। জীবনানন্দকে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রতিগ্রহণ করে আলোক বজায় রাখতে পেরেছেন তাঁর স্বকীয়তা। উদ্ধৃতির প্রথম অংশে শিশিরের বিশেষণ হিসেবে “সচ্ছল” শব্দের প্রয়োগই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। আবার, ওই একই কাব্যগ্রন্থের “শিল্পীর আঙুল” কবিতায় পাচ্ছি-

“হেমন্তের নির্জন মহিমা সাদা কখনো মানিনি। কুঁড়ির স্পন্দন

রোজ ভোরবেলা দেখি।”[১৮০]

এইভাবে, এই কবিতাতেও জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণে সফল হয়েছেন কবি।

সুতরাং, দেখা গেল, এইভাবে, আলোক সরকারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে। এই প্রতিগ্রহণ যতটা বাহ্যিক, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। আলোকের কবিতার নৈসর্গিক পরিবেশ নির্মাণে জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পর্বের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু, আলোকের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের বিশেষত্ব এখানেই যে আলোক কখনোই জীবনানন্দকে অনুকরণ করেন নি। তাঁর কবিতায় সামগ্রিকভাবে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের মাত্রা শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা বিনয় মজুমদারের থেকে অনেক কম। জীবনানন্দের কবিতার পঙ্‌ক্তি বা শব্দবন্ধের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের চেয়ে তিনি জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার দ্বারা অধিক প্রভাবিত

হয়েছিলেন। তবে, তাঁর কবিজীবনের শুরুর দিক বাদ দিলে এই প্রভাবের মাত্রা ক্রমশ কমে আসে। এমনকি *উতল নির্জন* (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থেও তিনি জীবনানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন নিজস্ব কাব্যভাষা। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

৪.৩.২ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত র কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় যদি কোনো কবির ওপর জীবনানন্দের প্রভাব অত্যন্ত সুপ্ত অথচ গভীর হয়ে থাকে, তবে সেই কবির নাম প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬)। অনুচ্চ উচ্চারণের প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী প্রণবেন্দু কবিতার মধ্যে যেমন সৃষ্টি করেন নি অকারণ জটিলতা, তেমনি কবিতাকে করে তুলতে পারেন নি অকারণ লঘু। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে একটা আপাত সরল কিন্তু চটুল উদ্দামতাবিহীন মধ্যগতি চোখে পড়ে। এইখানেই তাঁর সংযোগ জীবনানন্দের সাথে। নিজের কবিজীবনের কথা বলতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন-

> "আমি খুব নিচু গলায় কথা বলি। জীবনে তো বটেই, কবিতাতেও। উচ্চরোল কবিতা আমি লিখতেও পারি না, চাইও না। সেজন্যে সমসাময়িক অন্যান্য অনেক কবিতার তুলনায় আমার অধিকাংশ কবিতাই (হয়তো সব কবিতা নয়) আপাত-নিস্তরঙ্গ, শান্ত।[১৮১]"

এই আপাত শান্ততা অথচ ভাষার ব্যবহারে সহজ সরলতা যে কবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তিনি নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ দাশ। তিনের দশকের অন্য কবিদের তুলনায় কবিতার ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহজ হয়েও জীবনানন্দের কবিতা ছিল কিছুটা দূরের বস্তু। পরিচিত

হয়েও যেন পাঠকের সঙ্গে তার রয়ে যেত এক অগম্য দূরত্ব। প্রণবেন্দুর কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায় সেই ঘষা কাচের ব্যবধান-সুলভ অগম্যতার ছোঁয়াচ-

"বৃষ্টি আসে, যেন আমার প্রতিটি সংশয়

ফোঁটা ফোঁটা...শব্দে তৈরি হয়,

আমি বলতে চাই না, আমি

দেখতে চাই না আর,

তবু এমন তরল অন্ধকার-

তোমার মুখ ছাড়াও, আরও মুখের ভিড় জমে।"[১৮২]

উপরের কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের কবিতাশৈলীর একটা আভাস দেখা যায়। উদ্ধৃতির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দীয় পুনরাবৃত্তির প্রবণতা। আর শেষ পঙ্‌ক্তিতে এসে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের "নগ্ন নির্জন হাত" কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

"তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না,

খুঁজি না।"[১৮৩]

প্রণবেন্দুর কবিতার মধ্যে এইরকম জীবনানন্দীয় আঘ্রাণের উদাহরণ খুব একটা বিরল নয়। “পূর্বাপর” শীর্ষক একটি কবিতায় পাই-

“ প্রথমে কিছুই নেই; অনুজ্জ্বল রাত্রি ভরে আছে

নক্ষত্রবিহীন স্বপ্নে। মৃতবৎসা গাভীটির ডাকে

দয়ার্দ্র হয়েছে কেউ। আর আনাচে কানাচে

নির্ভয়ে জেগেছে নারী হাত-বদলের কোনো ফাঁকে;

সবাই সন্তুষ্ট, সুখী, বড়জোর ব্যর্থপ্রেমে গাঢ়,

রেস্তোরাঁয় কীর্তিমান, উপলক্ষে জ্যোতির্ময় নেতা-

কিন্তু তাতে কতটুকু! তুমি হারো অথবা না হারো

কোথায়, কখন কেন-কেউ আর খোঁজে না প্রণেতা।”[১৮৪]

উপরের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে জীবনানন্দের পরিবেশের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে একাধিক স্তরে। প্রথমত, ৮+১০ মাত্রার মহাপয়ার ছন্দোবন্ধ বিশিষ্ট দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রণবেন্দু নিজেই তাঁর কবিতার প্রধান ছন্দোবন্ধ হিসেবে পয়ারকে স্বীকার করে নিয়েছেন গদ্যছন্দের পাশাপাশি। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন-

" আমি মূলত পয়ারে ও গদ্যছন্দেই কবিতা লিখি, পয়ারকে কখনও ঈষৎ ভেঙে দিই, এই পর্যন্ত। আমি যা বলতে চাই বা যেভাবে বলতে চাই তার জন্যে এই ছন্দোবন্ধটিই আমার কাছে সবচেয়ে স্বস্তির মনে হয়। স্বরবৃত্তে একদা অনেক কবিতা লিখেছি (এখনও মাঝে মাঝে লিখি), লিখেছি মাত্রাবৃত্তেও। তবে তিন চারটি ছাড়া দীর্ঘ কবিতা প্রায় লিখিইনি।"[১৮৫]

প্রণবেন্দুর কবিতার ছন্দোবন্ধে এই পয়ার এবং মহাপয়ারের আধিপত্য এবং পয়ারকে ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ অসম মাত্রার পংক্তির ব্যবহার আবার মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দকে। মহাপয়ারের দীর্ঘতা এবং মুক্তকের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত জীবনানন্দ এক্ষেত্রে প্রণবেন্দুর পূর্বসূরী। কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রে এইভাবেই তিনি জীবনানন্দকে প্রতিগ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, "নক্ষত্র", "নারী" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার। তৃতীয়ত, রাতের নাগরিক পরিবেশের বর্ণনা- যা মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের "রাত্রি", "লঘুমুহূর্ত", কিংবা *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের "ভিখিরী" কবিতার কথা- যেখানে উঠে এসেছে রাতের শহুরে জীবনের কথকতা। রাতের কলকাতার কথা অবশ্য প্রণবেন্দুর অন্য কবিতাতেও এসেছে। যেমন-

" রাস্তায় দশটি লোক শুয়ে আছে।

আমি ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়াতে পারিনি।

খুব বেশিক্ষণ আমি আলো দিতে শিখিনি এখনো-

আমার নিজের কিছু অন্ধকার আছে,

কিছু দ্বিধা, কিছু অসুবিধা।

রাস্তায় দশটি লোক শুয়ে আছে।

আমি একাদশ ব্যক্তি; কলকাতা,

শুতে জায়গা দাও।।"[১৮৬]

এইভাবে, প্রণবেন্দুর কবিতার বহিরঙ্গেও জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ দেখা যায়। তবে সেই প্রতিগ্রহণের মাত্রা খুব বেশি প্রকট নয়। প্রণবেন্দুর জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের প্রকৃত স্তর রয়েছে কবিতার অন্তরঙ্গে। একটি প্রবন্ধে প্রণবেন্দু লিখছেন-

"...আমি বিশ্বাস করি যে, এক ধরনের আধ্যাত্মিক আয়তন আমাদের জীবনে আস্তীর্ণ হয়ে থাকে, যে বিষয়ে আমরা মাঝে মাঝে অনবহিত হবার ভাণ করি। আধ্যাত্মিক আয়তন বলতে আমি গুরুগম্ভীর কোনো বিষয় বোঝাতে চাইছি না। খুব ছোট ছোট বিষয়েও এই আয়তন আকীর্ণ হয়ে থাকে। সন্ধেবেলার কাক আমার ছাদের কার্নিসে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তারপর নিস্তব্ধ নিরুদ্দেশের দিকে হঠাৎ ডানা মেলে দিলো, শীতের দুপুরে একটা বেড়াল চকিতে পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো...- এই সমস্ত আপাত-তুচ্ছ ছোটো ছোটো ঘটনায় কম্পমান হয়ে ওঠে অন্য একটি যবনিকা, আবরণ-যার আড়াল থেকে নির্গত হয় এক ধরনের রহস্যানুভূতি। একেই

আমি আধ্যাত্মিক আয়তন বলতে চাইছি। এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আমি 'জীবনবোধের' কথা বা মানবভাবনার বিষয়ে আগে যা উল্লেখ করেছি তার আদৌ কোনো বিরোধিতা নেই। যুক্তিচর্চিত আধুনিকতার সঙ্গেও নেই।" [১৮৭]

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে প্রণবেন্দু যেভাবে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হবার অভিজ্ঞতার পর্দা উন্মোচনের মধ্যে থেকে রহস্যানুভূতি নির্গমনের কথা উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে উল্লিখিত জীবনানন্দের নিম্মলিখিত কথাগুলির সংযোগ পাওয়া যায়-

"কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খন্ড-বিখন্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,- একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়"[১৮৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ এবং প্রণবেন্দু উভয়েই জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তের অভিজ্ঞতাকে কবিতা সৃজনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, উভয় কবিই কবিতা রচনাকে কোনো না কোনো ভাবে অনুভূতি এবং বোধের স্বরলিপি বলে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তাই, নিজের কবিতা প্রসঙ্গে প্রণবেন্দু বলেন-

“আমার কাছে, কোনো কবিতার কবিতা হয়ে ওঠার প্রধানতম শর্ত তার অনুভূতিগ্রাহ্যতা। আবেগ, মনন, দক্ষতা, কোনো কিছুকেই আমি অস্বীকার করছি না- কিন্তু কোনো শব্দপুঞ্জ যদি অনুভূতিগ্রাহ্য না-হয়, তাকে আমি কবিতা বলতে রাজী নই। কবিতা নিঃসন্দেহে আবেগ ও মননের মিশ্রণ- মনন বেশি হলে কবিতা মননধর্মী হয়, আবেগের মাত্রা চড়লে তা হয় আবেগপ্রধান কবিতা। কিন্তু তা যদি আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করতে না পারে, তাকে সঞ্জীবিত করতে না-পারে তাহলে তা, আর যাই হোক, কবিতা নয়। অন্তত আমার তাই ধারণা।”[১৮৯]

কবিতাকে প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠার জন্য প্রণবেন্দু অনুভূতিগ্রাহ্যতাকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা পড়লে স্মরণে আসে জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬-৪৭ কবিতার সেই পঙ্‌ক্তিগুলি-

“মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।”[১৯০]

সুতরাং এইভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রণবেন্দুর কবিতার শরীর নির্মাণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের যতটা না প্রতিগ্রহণ ঘটেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছে কবিতার আত্মায়। ফলে, আপাত দৃষ্টিতে প্রণবেন্দুর কবিতা জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের বাইরে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কবিতায় আত্তীকরণ ঘটেছে জীবনানন্দের। এখানেই প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের বিশেষত্ব।

৪.৩.৩ উৎপল কুমার বসুর কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় উৎপল কুমার বসু(১৯৩৭) একটি স্বতন্ত্র নাম। জীবনানন্দ দাশের কাব্যধারার সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদারের পাশাপাশি উচ্চারিত হতো তাঁর নাম। শৈলেশ্বর ঘোষ লিখছেন-

> "পঞ্চাশের দশকে এলেন একদল কবি। এঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনানন্দকে নিয়ে উত্তেজিত ছিলেন। স্বভাবিক ছিল সে-উত্তেজনা। এঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার এবং উৎপল কুমার বসু জীবনানন্দের ভাবনাচেতনা-পরিমন্ডলের মধ্যেই কবিতা লিখতে চাইলেন। জীবনানন্দকে আরো যতটা টেনে নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করলেন তাঁরা।"[১৯১]

যদিও শৈলেশ্বর পাঁচের দশকের কবিদের জীবনানন্দ-অনুপ্রেরণা নিয়ে লিখতে গিয়ে বিনয় এবং শক্তির সঙ্গে উৎপল কুমারকেও একই সারিতে রেখেছেন, তবু একথা বলতেই হয় যে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের মাত্রার বিচারে বিনয় মজুমদার এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তুলনায় উৎপল কুমার বসুকে এক সারিতে রাখা যায় না। শক্তি এবং বিনয়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের পরিমাণগত মাত্রা উৎপল কুমারের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের তুলনায় অনেক বেশি। কাব্যভাষার বিচারে জীবনানন্দকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন বিনয় মজুমদার আর সবচেয়ে কম উৎপল কুমার বসু। উৎপল জীবনানন্দকে অধিক প্রতিগ্রহণ করেছেন

তাঁর কবিতার অন্দরমহলে। বহিরঙ্গে সেই গ্রহণের ছাপ খুব একটা প্রকট না হলেও একেবারে অপ্রতুলও নয়। দু-একটি উদাহরণ এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন-

"এখন আকাশ নীল। অর্জুনগাছের মতো সমুদ্রছায়ায়
বসে আছি। বহু সিগারেট টিন নিয়ে উড়োপাতা, বালি
ছেঁড়া খবরকাগজ সমেত তোমাদের হৃদয়বত্তা নেড়ে
লাখো লাখো গুণ্ঠনমিছিল এই নীল ঢেউ।" [১৯২]

কবির বিখ্যাত গ্রন্থ *পুরী সিরিজ* (১৯৬৪) এর সমনামী ১ শীর্ষক কবিতাটির প্রথম বাক্যটি মনে পড়ায় জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিকে-

"এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশ জূড়ে সজিনার ফুল"[১৯৩]

উভয় পঙ্‌ক্তির প্রথম অংশের মধ্যে শুধু এটুকুই তফাত যে জীবনানন্দের "এখানে"[১৯৪] উৎপলের কলমে হয়ে গেছে "এখন"[১৯৫]।

কিংবা,

"কার্তিক জ্যোৎস্নায় আজ ওড়ে ঐ বিশাল বেলুন।"[১৯৬]

এই পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ায় জীবনানন্দের "ঘোড়া" কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-

"মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;"[১৯৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উৎপল কুমারের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের আর একটি বিশেষ দিক হল বিষয়গতভাবে ‘হেমন্ত’-এর ব্যবহার। জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের অংশ হিসেবে ‘হেমন্ত’ এর এই ভাবগত ব্যবহার শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদারের কবিতাতেও দেখা যায়। স্বল্প মাত্রায় হলেও আলোক সরকারও এর ব্যতিক্রম নন। উৎপলের কবিতায় হেমন্তের ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

“উঠেছি নক্ষত্রহীন গম্বুজে ও সমুদ্রবাতাসে
দূর হতে দেখা যায় অপসর হেমন্তের দিনও
হেমন্তের দিনে আর ফাঁক নেই। পাতা হতে পাতার তরল
উচ্ছ্বাস ধাবিত দেখে, হে জীবপালিনি, ঐ অনন্ত শীতল
বাহুবন্ধে ছিঁড়ে পড়ে দেখেছি একাকী”[১৯৮]

আক্ষরিক অর্থেই কবিতাই যোগ্য নাম “আরো প্রকৃতির ছবি”। তবে শুধু প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির উপমার আড়ালে কোথায় যেন মানব-মানবীর হৃদয়ের গভীর গহ্বরের কথা বলা হয়েছে। সমাসোক্তি অলংকারের সঠিক প্রয়োগে কবি উৎপল তাঁর কবিতাকে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের কাছে নিয়ে গিয়েও আবার গতিমুখ পেরেছেন পরিবর্তন করতে। অন্য একটি উদাহরণ দেখা যাক-

“হেমন্তে আগুন জ্বলে। এবারের শীত দ্রুতগামী

বসেছি অগ্নিকুন্ডে, আমাদের লৌকিক গ্রাম

তোমারই পায়ের কাছে, ও আগুন, ওগো গৃহস্বামী,

বিপর্যস্ত হয়ে আছে, ঝরছে বাদাম-”[১৯৯]

এখানে হেমন্ত যেন শৈত্যের পূর্বাভাস। তাই এই সময়ে আকাঙ্ক্ষিত উত্তাপ। উষ্ণতার এই চাহিদা যেন কবি-পথিকের মনের কাছেও। তাই গৃহস্থের কাছে নতজানু হয়ে আছে গোটা গ্রাম। আবার অন্য কবিতায় দেখি-

“ হে সত্তা, হেমন্তলীন, পাতার ঔরসে

নির্বেদ শূন্যতায় ঝরে যাওয়া ত্যক্ত বিপুলতা,

পাটল খড়ের স্তুপ, অপরাহ্ন হতে টানা মেদুর কম্বল,

হে সত্তা, কুয়াশালীন, খিন্ন প্রাণীর মর্মে পৌঁছে দাও ভাষা-”[২০০]

এখানে আবার হেমন্ত পাতা ঝরার মরসুম- শূন্যতার প্রতীক। এই হেমন্ত একান্ত ভাবেই জীবনানন্দের। জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে-

“হেমন্ত আসিয়া গেছে;-চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;

ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে-শালিকের নেই আর দেরি,

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে।”[২০১]

এখানেও হেমন্ত শূন্যতার দ্যোতক। সুতরাং উৎপল কুমারের এই হেমন্ত একান্তভাবেই জীবনানন্দীয়। হেমন্তের প্রসঙ্গ বাদ দিলে উৎপল কুমারের উদ্ধৃত কবিতায় আরো একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে একান্তভাবেই জীবনানন্দীয় বলা যেতে পারে। সেই শব্দটি হল "খিন্ন"[২০২]। উৎপলের কবিতায় ব্যবহৃত এই শব্দটি শুনলে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের "জর্নাল: ১৩৪৬" কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি-

"পৃথিবীর ভিড়ে তুমি-' ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে;"[২০৩]

সুতরাং, এক্ষেত্রেও উৎপল কুমার বসুর কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ স্পষ্ট হয়েছে।

শুধু হেমন্ত নয়, উৎপলের কবিতায় 'নক্ষত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার। কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

"হৃদয়ের থেকে আজ সৌন্দর্য উঠেছে জেগে মেরুদূরাতীত
রোহিণী নক্ষত্র ক্রমে কোলিয়ারী অঞ্চলের শেষাশেষি চলে যায়"[২০৪]

অথবা, আরেকটি কবিতায়-

"হে রাত্রি, আঁধারমথ, এসো কিছুক্ষণ নক্ষত্রের দেখাশোনা করি।"[২০৫]

কিংবা, অন্য কবিতায়-

“হে সূর্য, নাক্ষত্রতন্তু ছিঁড়ে তুমি বারবার

ক্ষীরে, ফলে, দুধের প্রবাহে

পৌষে, শীতের রাতে, মাংসে, ত্বকে, উচ্ছ্বসিত রোমে”[২০৬]

এইভাবে, দেখা যাচ্ছে, ‘নক্ষত্র’ শব্দের একাধিকবার ব্যবহারের মধ্য দিয়েও উৎপল কুমার বসুর কবিতাতে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই জীবনানন্দীয় ‘নক্ষত্র’ থিমের ব্যবহার উৎপল ছাড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদারের কবিতাতেও ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। এই থিমের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উৎপল তাঁর কবিতায় জীবনানন্দের মতো শাশ্বত সময় চেতনাকে ধরতে চেয়েছেন। যদিও উৎপলের ক্ষেত্রে এই শাশ্বত সময়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার পথ সৃজিত হয়েছে বিশেষ মৌহর্তিক সময়ের সরণি বেয়েই। এখানেই উৎপল জীবনানন্দকে গ্রহণ করেও হয়ে পড়েছেন পৃথক। নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব কাব্যশৈলী। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

শুধু কবিতার বহিরঙ্গে নয়, উৎপল কুমার বসু জীবনানন্দকে আত্তীকরণ করেছেন তাঁর কাব্যধারার অন্তরে। সমাজ সচেতন কোনো রাজনৈতিক নীতি আদর্শের কবিতা নয়, বরং চিরপথিক উৎপলের কবিতা যেন তাঁর আত্ম-অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নয় বরং জীবনানন্দের মতোই তাঁর কবিতা ক্লাসিক। হাল্কা রসে না মজে, যৌনতা, প্রকৃতি এবং বেদনার চিরন্তন অবিচ্ছেদ্য

মিলনের করুণ কাহিনি জীবনানন্দ-উত্তর সময়ে উৎপলের মতো আধুনিক করে প্রথম আর কে-ই বা বলতে পেরেছেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, শুধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা বিনয় মজুমদারই নন, পাঁচের দশকের অন্যান্য কবির কবিতাতেও ঘটেছে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ। এঁদের মধ্যে প্রতিগ্রহণের পরিমাণগত বিচারে খুবই নগণ্য হওয়ায় অনেক কবিকেই যেমন আলোচনায় টেনে আনা প্রাসঙ্গিক মনে হয় নি, তেমনি জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের মাত্রা অধিক হলেও সেই প্রভাব অতিক্রম করে কবি হিসেবে স্বকীয়তা বজায় রেখে তেমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে অসফল কবিদেরও এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। সেই হিসেবে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদার ছাড়া আরো তিনজন কবি উঠে এসেছেন যাঁদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ স্বল্প হলেও নগণ্য নয়। এঁরা হলেন আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং উৎপল কুমার বসু। এঁদের কবিতায় জীবনানদের প্রতিগ্রহণ কিছুটা প্রচ্ছন্ন। আলোক যেমন প্রকৃতিচেতনায় গ্রহণ করেছেন জীবনানন্দকে, উৎপল সেখানে প্রকৃতি চেতনার পাশাপাশি সামগ্রিকতার অন্দরে আত্তীকরণ ঘটাতে চেয়েছেন জীবনানন্দকে। আবার প্রণবেন্দুর ক্ষেত্রে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ রচনা করেছে বোধের স্বরলিপি। সব মিলিয়ে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের ছাপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

[১] মীনাক্ষী, চট্টোপাধ্যায়, "গ্রন্থপরিচয়", শক্তিচট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৭* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১২), ৩৭৯।

[২] শ্লোক কবিতাপত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পাদনা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (কলকাতাঃ বেহালা, ২০০৪-০৫), ৭৯।

[৩] তদেব, ১৮১।

[৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ২১।

[৫] তদেব, ২৪।

[৬] তদেব।

[৭] তদেব, ৫৬।

[৮] তদেব, ২৯।

[৯] তদেব, ২৭।

[১০] প্রবোধচন্দ্র সেন, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১৪), ১৭৫।

[১১] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র -৫* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০০৯), ৫৩-৫৪।

[১২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'এলেজিঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' ,*পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ১৪১৮-বঙ্গাব্দ), ৩৫।

[১৩] তদেব।

[১৪] তদেব।

[১৫] তদেব।

[১৬] তদেব, ৩৭।

[১৭] শক্তি, চট্টোপাধ্যায়। *পদ্যসমগ্র-৩* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ২৪।

[১৮] তদেব।

[১৯] জীবনানন্দ, দাশ, 'ক্যাম্পে', *ধূসর পাণ্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৩২।

[২০] তদেব।

[২১] বিনয় মজুমদার, '২৬ অগাস্ট, ১৯৬০', *ফিরে এসো, চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১০।

[২২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৪* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১০), ৪৫।

[২৩] তদেব, ৪৬।

[২৪] তদেব, ৪৬।

[২৫] শক্তিচট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৬* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ২৬৩-২৬৪।

[২৬] মীনাক্ষী, চট্টোপাধ্যায়, "গ্রন্থপরিচয়", শক্তিচট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৬* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ২৬৩-২৬৪।

[২৭] তদেব, ২৬৪।

[২৮] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৬১।

[২৯] তদেব, ১৬৬।

[৩০] তদেব, ১৮২।

[৩১] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র -৫* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯), ২০৯

[৩২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র (*কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৬১।

[৩৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৭ (*কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২), ১৫।

[৩৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭০।

[৩৫] জীবনানন্দ দাশ, *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ১২৬।

[৩৬] তদেব, ১২৩।

[৩৭] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭৬।

[৩৮] জীবনানন্দ দাশ, 'ঘোড়া', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ২০৬।

[৩৯] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭৬।

[৪০] তদেব।

[৪১] তদেব।

[৪২] জীবনানন্দ দাশ, 'ঘোড়া', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ২০৬।

[৪৩] তদেব।

[৪৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'ফিরে এসো মালবিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৬), ২৫২।

[৪৫] জীবনানন্দ দাশ, 'আকাশলীনা', *সাতটি তারার তিমির, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ২০৫।

[৪৬] তদেব।

[৪৭] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'ফিরে এসো মালবিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৬), ২৫২।

[৪৮] জীবনানন্দ দাশ, 'আকাশলীনা', *সাতটি তারার তিমির, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ২০৫।

[৪৯] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'ফিরে এসো মালবিকা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৬), ২৫২।

[৫০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'সরোজিনী বুঝেছিল', *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১০৩।

[৫১] জীবনানন্দ দাশ, 'সপ্তক', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ২০৯।

[৫২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'সরোজিনী বুঝেছিল', *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১০৩।

[৫৩] তদেব।

[৫৪] তদেব।

[৫৫] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির', *পদ্যসমগ্র-৪* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১০), ১১৭।

[৫৬] জীবনানন্দ দাশ, 'কমলালেবু', *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ১৬৪।

[৫৭] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'মন্ত্রের মতন আছি স্থির', *পদ্যসমগ্র-৪* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১০), ১১৭।

[৫৮] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি,অন্ধকারে, পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৩৭।

[৫৯] তদেব, ১৩৬।

[৬০] তদেব, ১৩৯।

[৬১] তদেব, ১৪১।

[৬২] জীবনানন্দ দাশ, 'পৃথিবীলোক', *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৮৩।

[৬৩] জীবনানন্দ দাশ, 'মাঘসংক্রান্তির রাতে', *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ১১৭।

[৬৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'তোমাকেই মনে পড়ে', *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১০১।

[৬৫] জীবনানন্দ দাশ, 'পাখিরা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৪২।

[৬৬] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'পাখি', *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ৪৬।

[৬৭] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ‘রাতের নির্জনে’, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১০৬।

[৬৮] জীবনানন্দ দাশ, ‘সন্ধ্যা হয়- চারিদিকে শান্ত নীরবতা’, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৪৯।

[৬৯] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ৫৮ সংখ্যক কবিতা, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৮৬।

[৭০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ৩১ সংখ্যক কবিতা, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭৩-৭৪।

[৭১] জীবনানন্দ দাশ, ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৪৬।

[৭২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ৩২সংখ্যক কবিতা, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭৪।

[৭৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ৪২ সংখ্যক কবিতা, *চতুর্দশপদী কবিতাবলী পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৭৯।

[৭৪] [৭৪] জীবনানন্দ দাশ, ‘শঙ্খমালা’, *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর ২০০৫), ১৫৮।

[৭৫] জীবনানন্দ দাশ, ‘সিন্ধুসারস’, *মহাপৃথিবী, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৬৮।

[৭৬] জীবনানন্দ দাশ, ‘নাবিকী’, *সাতটি তারার তিমির, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ১০১।

[৭৭] জীবনানন্দ দাশ, ‘মাঠের গল্প’, *ধূসর পাণ্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৩৬।

[৭৮] জীবনানন্দ দাশ, ‘অবসরের গান’, *ধূসর পাণ্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ২৭।

[৭৯] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৬), ৫০।

[৮০] তদেব।

[৮১] তদেব, ৬৩।

[৮২] তদেব।

[৮৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১৬৮।

[৮৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৪* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০), ৪৫।

[৮৫] তদেব।

[৮৬] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ১০৬।

[৮৭] তদেব, ১৯৯।

[৮৮] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৬), ১৯।

[৮৯] তদেব, ৬৮।

[৯০] তদেব, ৬৯।

[৯১] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স,   ২০১১), ৪১।

[৯২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-৩* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ১১৫।

[৯৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়। *পদ্যসমগ্র-৬* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ৪৬।

[৯৪] তদেব।

[৯৫] জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৭২।

[৯৬] প্রদ্যুম্ন মিত্র, *জীবনানন্দের চেতনা জগৎ* (কলকাতাঃ দে'জপাবলিশিং ১৯৯০), ৬৪।

[৯৭] জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৭১।

[৯৮] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ২৯।

[৯৯] তদেব, ২৭।

[১০০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা (*কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৬), ২১৪।

[১০১] জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলিকাতাঃ ভারবি ১৯৮৮), ৮০।

[১০২] তদেব, ৪২।

[১০৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স ২০১১), ৮২।

[১০৪] তদেব, ৩১।

[১০৫] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮বঙ্গাব্দ), ১০২।

[১০৬] Robert C Holub, *Reception Theory: A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), 90.

[১০৭] Raymond Williams, 'Dominant, Residual, Emergent'. *Marxism and Literature* (New York: Oxford University Press, 1985), 121.

[১০৮] Susan Bassnett, *Introduction to Comparative Literature: A Critical Introduction* (Oxford: Blackwell, 1993), 10.

[১০৯] বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয়':প্রথম পর্ব' *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০২), ৫৮।

[১১০] Robert C Holub, *Reception Theory: A Critical Introduction* (London and New York: Methuen, 1984), 90.

[১১১] বিনয় মজুমদার, 'নক্ষত্রের আলোয়', *নক্ষত্রের আলোয়, কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ২৯।

[১১২] বিনয় মজুমদার, 'চিরদিন একা একা', *নক্ষত্রেরআলোয় , কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ২৯।

[১১৩] তদেব,২৮।

[১১৪] বিনয় মজুমদার 'আর শোনায়োনা', *নক্ষত্রেরআলোয় , কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ২৯।

[১১৫] তদেব।

[১১৬] জীবনানন্দ দাশ, 'হায় চিল', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৫৭।

[১১৭] মঞ্জুভাষ মিত্র, *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইওরোপীয় প্রভাব* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০২), ৭৫-৭৬।

[১১৮] Ulrich Weisstein, *Comparative Literature and Literary Theory* (Bloomington: Indiana University Press 1973), 35।

[১১৯] Soma Mukherjee (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* (Kolkata: Jadavpur University, 2015), 65.

[১২০] তদেব।

[১২১] জীবনানন্দ দাশ, 'সন্ধ্যা –হয়-চারিদিকে',*রূপসী বাংলা, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৪৮।

[১২২] বিনয় মজুমদার, 'রৌদ্রে', *নক্ষত্রেরআলোয় ,কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস,২০০৬), ৩৪।

[১২৩]বিনয় মজুমদার, '২২ জুন,১৯৬২', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা,১৪১১ বঙ্গাব্দ), ৫০।

[১২৪] তদেব, ৫১।

[১২৫] জীবনানন্দ দাশ, 'সুরঞ্জনা', *বনলতা সেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতাঃ ভারবি, ১৯৮৮), ৫৬।

[১২৬] বিনয় মজুমদার, '৮ মার্চ,১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ৯।

[১২৭] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'প্রসঙ্গঃ গায়ত্রীকে', *সম্প্রতি* ৩য় সংকলন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৪৪।

[১২৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত',*প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ত্রয়োদশ খন্ড (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), ৬৬২(৮)।

[১২৯] তদেব, ৬৬২(৯)।

[১৩০] বিনয় মজুমদার, '২১ সেপ্টেম্বর,১৯৬০', *ফিরে এসো, চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১০।

[১৩১] বিনয় মজুমদার, ৩মার্চ,১৯৬২', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ৩০।

[১৩২] তদেব।

[১৩৩] দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* (কলকাতাঃ দে'জ, ১৯৫৮), ১১৭।

[১৩৪] বিনয় মজুমদার, ৩মার্চ,১৯৬২', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ৩০।

[১৩৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনানন্দ কে লেখা পত্র ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২', *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত,* সম্পাঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ দে'জ, ১৯৮৬), ৯৪।

[১৩৬] জীবনানন্দ দাশ, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্র ৩ রা পৌষ ১৩৩৭ (?), *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত,* সম্পাঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ দে'জ, ১৯৮৬), ৮৩।

[১৩৭] তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থ পরিচয়', বিনয় মজুমদার, ,*কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০২), ১৬৩।

[১৩৮] জীবনানন্দ দাশ, ''ক্যাম্পে' প্রসঙ্গে', *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত,* সম্পাঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ দে'জ, ১৯৮৬), ৯৪।

[১৩৯] বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয়':প্রথম পর্ব', *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস,২০০২), ৬৭।

[১৪০] বিনয় মজুমদার, '৬নং কবিতা', *অধিকন্তু, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৭৫।

[১৪১] বিনয় মজুমদার, '৯নং কবিতা', *অধিকন্তু, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ *কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৭৬।

[১৪২] বিনয় মজুমদার, '১নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৮৩।

[১৪৩] তদেব।

[১৪৪] বিনয় মজুমদার, '৪নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৯৪।

[১৪৫] জীবনানন্দ দাশ, 'অঘ্রান প্রান্তরে', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৭৩।

[১৪৬] জীবনানন্দ দাশ, 'দুজন', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৬৫।

[১৪৭] জীবনানন্দ দাশ, 'মৃত্যুর আগে', *ধূসর পাণ্ডুলিপি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১১২।

[১৪৮] বিনয় মজুমদার, '৪নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ১০০।

[১৪৯] তদেব, ৯৩।

[১৫০] তদেব, ১০৬।

[১৫১] তদেব।

[১৫২] বিনয় মজুমদার, 'কবিতার খসড়া/৬', *বাল্মীকির কবিতা , কাব্যসমগ্র-২,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৭), ৪৬।

[১৫৩] বিনয় মজুমদার, 'জলপিপি', *বাল্মীকির কবিতা, কাব্যসমগ্র-২,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৭), ৪৩।

[১৫৪] বিনয় মজুমদার, 'মহাচীনের ঘোড়া ও আরও তিনটি', *বাল্মীকির কবিতা , কাব্যসমগ্র-২,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৭), ৪০।

[১৫৫] জীবনানন্দ দাশ, 'শকুন', *ধূসর পান্ডুলিপি, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১১১।

[১৫৬] জীবনানন্দ দাশ, 'ঘোড়া',*সাতটি তারার তিমির, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ২০৫।

[১৫৭] শঙ্খ ঘোষ, 'শত জল ঝরণার ধ্বনি',*ছন্দের বারান্দা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), ৬৭।

[১৫৮] বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয়':প্রথম পর্ব', *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০২), ৫৬।

[১৫৯] তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থ পরিচয়',মজুমদার,বিনয়, *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য,* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০২), ৯৮।

[১৬০] অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* (কলকাতাঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬২), ৯৭-৯৮।

[১৬১] শঙ্খ ঘোষ, 'শত জল ঝরণার ধ্বনি',*ছন্দের বারান্দা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), ৭০।

[১৬২] বিনয় মজুমদার, '২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১০।

[১৬৩] বিনয় মজুমদার, '১৪ অক্টোবর,১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১২।

[১৬৪] বিনয় মজুমদার, '৪নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৯২।

[১৬৫] তদেব, ৯৯।

[১৬৬] বিনয় মজুমদার, '১নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস২০০৬), ৮৩।

[১৬৭] বিনয় মজুমদার, ৩মার্চ,১৯৬২', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ৩০।

[১৬৮] বিনয় মজুমদার, '২১ সেপ্টেম্বর,১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১০।

[১৬৯] দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পঞ্চাশ', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* সম্পাঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ ভারত বুক এজেন্সি ২০০৩), ১৫৮।

[১৭০] জীবনানন্দ দাশ, "সুচেতনা", *বনলতা সেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ৫৮।

[১৭১] আলোক সরকার, "বর্ষশেষ", *আলোকিত সমন্বয়, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে'জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩০।

[১৭২] জীবনানন্দ দাশ, "বোধ", *ধূসর পাণ্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ২০।

[১৭৩] তদেব, ২০।

[১৭৪] আলোক সরকার,“বিস্ময়”, *উতল নির্জন, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে’জ পাবলিশিং ২০০৫), ১৩।

[১৭৫] জীবনানন্দ দাশ, “হাওয়ার রাত”, *বনলতা সেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ৭০।

[১৭৬] আলোক সরকার,“স্বজ্ঞা”, *উতল নির্জন, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে’জ পাবলিশিং ২০০৫), ১৩।

[১৭৭] জীবনানন্দ দাশ, “বোধ”, *ধূসর পান্ডুলিপি, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ২০।

[১৭৮] আলোক সরকার ,“হেমন্ত”,*আলোকিত সমন্বয়, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে’জ পাবলিশিং ২০০৫), ২৫।

[১৭৯] আলোক সরকার, “সঙ্গত নিরালা”, *অন্ধকার উৎসব, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে’জ পাবলিশিং ২০০৫), ৩৫।

[১৮০] আলোক সরকার, “শিল্পীর আঙুল”,*অন্ধকার উৎসব, শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃদে’জ পাবলিশিং ২০০৫), ৫৬।

[১৮১] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, “কবিতা ও আমি”, *নিজের জীবন, বীজের জীবন,* সম্পাঃ গৌতম ঘোষদস্তিদার, (হাওড়াঃ রক্তমাংস ২০০১), ৯২।

[১৮২] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "অন্ধ হবার জন্য প্রার্থনা", *কবিতা সমগ্র প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃপ্রমা প্রকাশনী ২০০৯), ৫৪।

[১৮৩] জীবনানন্দ দাশ, "নগ্ন নির্জন হাত",*মহাপৃথিবী, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ৭৬।

[১৮৪] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "পূর্বাপর", *কবিতা সমগ্র প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃপ্রমা প্রকাশনী ২০০৯), ৮৫।

[১৮৫] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "কবিতা ও আমি", *নিজের জীবন, বীজের জীবন,* সম্পাঃ গৌতম ঘোষদস্তিদার, (হাওড়াঃ রক্তমাংস ২০০১), ৯৩।

[১৮৬] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "কলকাতা ও আমি", *কবিতা সমগ্র প্রথম খন্ড,* (কলকাতাঃপ্রমা প্রকাশনী ২০০৯), ১৫১।

[১৮৭] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "কবিতা ও আমি", *নিজের জীবন, বীজের জীবন,* সম্পাঃ গৌতম ঘোষদস্তিদার, (হাওড়াঃ রক্তমাংস ২০০১), ৯২।

[১৮৮] জীবনানন্দ দাশ, "কবিতার কথা", *কবিতার কথা,*(কলকাতাঃসিগনেট প্রেস ১৪১৩ বঙ্গাব্দ), ৭-৮।

[১৮৯] প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, "কবিতা ও আমি", *নিজের জীবন, বীজের জীবন,* সম্পাঃ গৌতম ঘোষদস্তিদার, (হাওড়াঃ রক্তমাংস ২০০১), ৯১-৯২।

[১৯০] জীবনানন্দ দাশ, "১৯৪৬-৪৭", *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ১৩৮-৩৯।

[১৯১] শৈলেশ্বর ঘোষ, "জীবনানন্দ ও উত্তরকাল", *এই সময় ও জীবনানন্দ,* সম্পাঃ শঙ্খ ঘোষ, (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০১), ২৫।

[১৯২] উৎপল কুমার বসু, "পুরী সিরিজ ১", *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৫৭।

[১৯৩] জীবনানন্দ দাশ,"এখানে আকাশ নীল", *রূপসী বাংলা, শ্রেষ্ঠ কবিতা* , (কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ৪৮।

[১৯৪] তদেব,৪৮।

[১৯৫] উৎপল কুমার বসু, "পুরী সিরিজ ১", *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৫৭।

[১৯৬] উৎপল কুমার বসু, "মধু ও রেজিন", *আবার পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৯১।

[১৯৭] জীবনানন্দ দাশ, "ঘোড়া", *সাতটি তারার তিমির, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র,* সম্পাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ২০৬।

[১৯৮] উৎপল কুমার বসু, "আরো প্রকৃতির ছবি",*পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৬৫।

[১৯৯] উৎপল কুমার বসু, "বিদায়, বিষণ্ন সন্ধ্যা",*পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৬৬।

[২০০] উৎপল কুমার বসু, "ফেরীঘাট", *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৭১।

[২০১] জীবনানন্দ দাশ, 'দুজন', *বনলতা সেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র,* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান (ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫), ১৬৫।

[২০২] উৎপল কুমার বসু, "ফেরীঘাট", *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৭১।

[২০৩] জীবনানন্দ দাশ, "জর্নাল: ১৩৪৬", *মহাপৃথিবী, শ্রেষ্ঠ কবিতা* ,(কলকাতাঃভারবি ১৯৮৮), ৮৩।

[২০৪] উৎপল কুমার বসু, "তেরজা রীমা", *আবার পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৯৯।

[২০৫] উৎপল কুমার বসু, "হে রাত্রি, আঁধারমথ", *আবার পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৯৯।

[২০৬] উৎপল কুমার বসু, "ফেরীঘাট", *পুরী সিরিজ, কবিতা সংগ্রহ* , (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬), ৬৯।

অবশেষে

“পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ”- এই শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। পরপর ধাপে ধাপে অধ্যায় ধরে ধরে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে।

অভিসন্দর্ভের শুরুতে ভূমিকা অংশেই প্রতিটি অধ্যায়ের আশু লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়েছিল। ওই অংশে আমরা স্থির করে নিয়েছি এই অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য বাংলা কবিতার ইতিহাসের একটি প্রতিগ্রহণের ঘটনার বিচার ও বিশ্লেষণ। এই প্রতিগ্রহণচর্চার উদ্দেশ্যে বাংলা কবিতার দুটি পর্যায় প্রাথমিক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল-একটি হল তিনের দশক এবং অন্যটি পাঁচের দশক। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে এক্ষেত্রে প্রতিগ্রহণের যে উদাহরণটি গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হল পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যপ্রতিভার প্রতিগ্রহণ। এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করার পূর্বে প্রয়োজন ছিল বাংলা কবিতার কবিদের দশক বিভাজনের কিছু নির্দিষ্ট ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ভূমিকা অংশেই। আমরা স্থির করে নিয়েছি যে একজন কবি যে দশকে লেখা শুরু করছেন, তাঁকে সেই দশকের কবি হিসেবেই চিহ্নিত করা হবে। সেই হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদার- উভয় কবিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে পাঁচের দশকের কবি হিসেবে। প্রধানত এই দুইজন কবি এবং পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের রচনায় জীবনানন্দের কাব্যজগত কীভাবে প্রতিগৃহীত হয়েছে, তারই দেখার প্রচেষ্টা ছিল এই অভিসন্দর্ভে। এই নিরীক্ষণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে মোট চারটি

মূল অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ে প্রতিগ্রহণ সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক ধারণা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে পাঁচের দশক পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার কথা। এ প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা পর্ব সহ তিনের দশকের কবি ও কবিতার কথা-কাহিনি এবং সেই সঙ্গে চারের দশকের কবিদের কথাও বলা হয়েছে দুটি পৃথক উপ অধ্যায়ে। এইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে বিবৃত করা হয়েছে পাঁচের দশক-পূর্ববর্তী বাংলা আধুনিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে এসে আলোচনার মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় যে প্রতিগ্রহণ চর্চা, তার দুই প্রধান অংশ জীবনানন্দ দাশ এবং পাঁচের দশকের কবিকুল। এর মধ্যে, বলাই বাহুল্য, উৎস হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন জীবনানন্দ এবং গ্রাহক হিসেবে পাঁচের দশকের কবিরা। প্রতিগ্রহণের এই দুই উপাদানের সাথে পরিচিতি ঘটানো হয়েছে এই অধ্যায়ে এসে। সুতরাং অভিসন্দর্ভের দিক থেকে এই অধ্যায়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর, চতুর্থ অধ্যায়ে এসে উৎস এবং প্রেরকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অভিসন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয়টি অর্থাৎ পাঁচের দশকের কবিদের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ। এইবার প্রতিটি অধ্যায় ধরে তাদের সংক্ষিপ্তসার এবং তাদের মধ্যে থেকে উঠে আসা মূল বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রথমেই আসা যাক প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ "প্রতিগ্রহণঃ হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না" -র প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়টি সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক কাঠামো।

যেহেতু এই অভিসন্দর্ভটি তুলনামূলক সাহিত্যের একটি গবেষণার কাজ, তাই এই গবেষণায় তুলনামূলক সাহিত্য নিরীক্ষণের কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হবে, তা আলোচনার শুরুতেই স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রথম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সেই প্রয়াসই করা হয়েছে। দুটি সাহিত্যকর্ম কিংবা একজন সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে পরবর্তীকালের এক বা একাধিক সাহিত্যিকের রচনার সাদৃশ্যকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করার সময় যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, যেমন- প্রভাব, অভিঘাত, অনুকরণ, অনুসরণ, প্রতিগ্রহণ, ইত্যাদি- সেগুলোর পরিধি নির্ধারণ এবং একটির সাথে অপরটির পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে এই অংশে। এই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা যায় যে অনেক সময়ে প্রভাব, প্রতিগ্রহণ, অভিঘাত- এই শব্দগুলি প্রায় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্ন স্বর উপস্থিত। পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গবেষণার মূল বিষয়কে মাথায় রেখে অধিকাংশ উদাহরণই দেওয়া হয়েছে বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য-কবিতা থেকে। যদিও স্বীকার করে নিলে অত্যুক্তি হবে না যে প্রতিগ্রহণ চর্চা পরিভাষাগত ভাবে জন্ম নিয়েছে পাশ্চাত্যে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে জার্মানিতে। সময়কাল গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষভাগ। তার আগে ছিল প্রভাব চর্চা।

এই অধ্যায়ের প্রথমে প্রভাব চর্চা বিষয়ে আলোচনা করে তারপর তার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই শ্রেণিবিভাগের মধ্যে একাধিক পরিভাষা রয়েছে, যেগুলিকে সাধারণ অর্থে প্রায় সমার্থক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে

থাকে। যেমন অভিঘাত, অনুসরণ, অনুকরণ প্রভৃতি। প্রভাব চর্চা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে ‘প্রভাব’ এর যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে এসেছে, সেগুলি হল-

প্রথমত, প্রভাব চর্চা প্রকৃত অর্থে একটি বিপরীত যুগ্মক (binary) প্রক্রিয়া। এর উপাদান দুটি। একটি হল উৎস বা প্রেরক এবং অন্যটি গ্রাহক।

দ্বিতীয়ত, প্রভাব চর্চায় গ্রহীতার বদলে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় উৎস বা প্রেরকের ওপর। উৎস সাহিত্যকর্মটির কী কী বৈশিষ্ট্য গ্রহীতা সাহিত্যকর্মে গৃহীত হয়েছে তার বিশ্লেষণই করা হয় প্রভাব চর্চায়। ফলে বিশ্লেষণের অভিমুখ থাকে উৎসের দিকে। এর ফলে সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন সাহিত্যকর্মটির স্বকীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভবপর হয় না। এখানেই প্রভাব চর্চার সীমাবদ্ধতা।

তৃতীয়ত, দুটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্মের উপরই প্রভাব চর্চা করা সম্ভবপর হয়। ফলে সাহিত্য বিশ্লেষণের পরিসর হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। একটি সাহিত্যকর্ম নির্মিত হবার পথে যে যে পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন হয়, সেই পরিবর্তনগুলিকে ধরার জন্য প্রভাব চর্চা যথেষ্ট নয়।

চতুর্থত, প্রভাব চর্চার মধ্যে একটা সুপ্ত ক্ষমতা পিরামিড রয়েছে। প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েই ক্ষমতার নিরিখে একই স্তরে অবস্থান করে না। প্রেরক সর্বদাই গ্রাহকের তুলনায় উচ্চ স্তরে অবস্থান করে। প্রভাব চর্চার ক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যে দাতা-গ্রহীতার রসায়ন কাজ করে তা সর্বদাই গ্রহীতা সাহিত্যিক বা সাহিত্যকর্মকে উৎস বা প্রেরকের তুলনায় হীনতর হিসেবে দেখা হয়। উপনিবেশিত দেশের সাহিত্যিক যদি গ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সে ক্ষেত্রে তাকে ঔপনিবেশিক উৎস সাহিত্যিকের

নামে ডাকা হয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে এক সময়ে 'বাংলার স্কট' অভিধায় ভূষিত করা হতো।

প্রভাব চর্চার যে যে সীমাবদ্ধতাগুলি উপরে উল্লেখ করা হল তার অধিকাংশই প্রতিগ্রহণ চর্চায় অনুপস্থিত। প্রভাবে বিশ্লেষণের অভিমুখ থাকে প্রেরকের দিকে কিন্তু প্রতিগ্রহণে এই অভিমুখ থাকে গ্রাহকের দিকে। ফলে বিশ্লেষণে গুরুত্ব পায় অনুজ সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যকর্মটি। এখানে উৎস ও গ্রাহকের মধ্যে থাকে না কোনো ক্ষমতা-পিরামিডের উচ্চ-নীচ ভেদ। ফলে উভয় সাহিত্যকর্মই সমান মর্যাদা পায় বিশ্লেষকের কাছে। সর্বোপরি প্রভাব চর্চার মতো প্রতিগ্রহণ চর্চা কেবলমাত্র দুটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। একটি সাহিত্যকর্মের সাথে পাঠক, প্রকাশক থেকে শুরু করে অন্য সাহিত্য কর্ম বা কোনো অ-সাহিত্য শিল্পকর্মের সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিশ্লেষণ করা হয় প্রতিগ্রহণ চর্চায়। ফলে এর বিস্তার প্রভাব চর্চার তুলনায় অনেক বেশি।

এইভাবে এই অধ্যায়ে প্রতিগ্রহণ চর্চার শুধু গুরুত্বই প্রতিষ্ঠা করা হয় নি, তার পাশাপাশি প্রতিগ্রহণের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে এখানে। ইটামার ইভান জোহারের "বহুতন্ত্র" (polysystem)[১] থেকে শুরু করে ইয়াযুসের "প্রত্যাশার দিগ্‌বলয়" (Horizon of Expectation)[২] কিংবা আইসারের "পাঠক প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব" (Reader response criticism)[৩]- এই সবই আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এইভাবে প্রথম অধ্যায়ে সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছে।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়ে পাঁচের দশক পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপ-অধ্যায় দুটি- একটি হল তিনের দশকের কবি ও কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা আর অপরটি চারের দশকের কবি ও কবিতার সংক্ষিপ্ত কথা। পাঁচের দশকের কবিদের আলোচনায় পৌঁছানোর পূর্বে এই অধ্যায়ে আলোচিত প্রাক্-পঞ্চাশ বাংলা কবিতার কাহিনির তাৎপর্য মূলত দুটি। প্রথমত প্রতিগ্রহণ চর্চার তত্ত্বানুসারে, প্রতিগ্রহণের দুটি মূল উপাদান হল উৎস এবং গ্রাহক। কোনো সাহিত্যিক প্রতিগ্রহণের ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য উৎস এবং গ্রাহক- উভয় উপাদানেরই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই অভিসন্দর্ভে বর্ণিত প্রতিগ্রহণের ঘটনাটির মধ্যে উৎস হিসাবে কাজ করেছে জীবনানন্দ দাশের কবিতা । বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দের স্থান তিনের দশকের কবিদের মধ্যে। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথক ভাবে জীবনানন্দের কবিপ্রতিভা আলোচিত হলেও জীবনানন্দের সম সাময়িক অন্যান্য কবি এবং কবিতাকে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক ছিল। এই অধ্যায়ের প্রথম উপঅধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম উপ-অধ্যায় থেকে উঠে এসেছে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্নের কথা। ‘আধুনিক’ শব্দটির বহুস্বরের বাচনও ব্যক্ত হয়েছে এই প্রথম উপ অধ্যায়ে। এখানে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা পর্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে *কল্লোল* (১৯২৩) এর নাম। মূলত এই কল্লোল এবং সমসাময়িক অন্য কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা যেমন- *কালিকলম, পরিচয়, প্রগতি, কবিতা,* প্রভৃতিকে ঘিরে যেসব কবিরা তাঁদের কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন বা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, মূলত

তাঁদের হাত ধরেই পথ চলা শুরু হয় আধুনিক বাংলা কবিতার। আর এই সূচনাপর্বকে মতান্তরে তিনের দশক বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এইসব কবিদের প্রায় সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, ফলে বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে তাঁদের অনেকের কবিতার মধ্যেই একটা অভিনবত্ব দেখা গেল, যে অভিনবত্বগুলির মধ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে 'আধুনিক কবিতা'-র বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। রবীন্দ্র-অতিক্রমের প্রয়াস যে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রবণতা ছিল, সেই বিষয়টিও উঠে এসেছে এই উপ অধ্যায়ে। আধুনিক বাংলা কবিতার এই পর্বটি যেহেতু ইতিমধ্যেই বহু আলোচিত এবং জীবনানন্দ দাশ ব্যতীত এই সময়ের অন্য কোনো কবি এই অভিসন্দর্ভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত নয়, তাই বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী- কারুর কথাই বিশদে আলোচনা করা হয়নি এই অভিসন্দর্ভে। জীবনানন্দ দাশ যেহেতু এই গবেষণার একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, তাই তাঁর বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা না করে পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই উপ অধ্যায়টি থেকে আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্বকে চিহ্নিত করতে পারি।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়টি থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ চারের দশকের কবি ও কবিতা সম্পর্কে জানা যায়। কবিতার সাধারণ প্রবণতার বিচারে এই দশকের কবিতাগুলির মূল ভাব তিনের দশকের কবিতার থেকে পৃথক। তিনের কবিতায় প্রধান ভাব হিসেবে যদি উঠে আসে আত্মনিমগ্নতা, তাহলে চারের

কবিদের কবিতার প্রধান ঝোঁক রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গের প্রতি। আত্মের পরিবর্তে 'অপর'-ই তাঁদের কবিতার মূল ভাব। প্রধানত, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই কবিতা লিখেছেন এই দশকের কবিরা। এঁদের অধিকাংশ জনেরই আস্থা ছিল বামপন্থী ধারার রাজনীতির প্রতি। ফলে কবিতাগুলির মধ্যেও পড়েছিল তার প্রতিফলন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই উপ-অধ্যায় থেকে বোঝা যায় যে সূচনাপর্বের পরবর্তীকালে চারের দশকে এসে প্রথম বার বাঁক নিচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতা। আত্মকথনের জায়গায় উঠে আসছে দেশ-কাল-মানুষ। সমকালীন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে এই বাঁকের জন্য প্রধানত দায়ী, সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এই অংশে। এই উপ-অধ্যায় থেকে বোঝা যায় যে তিন ও চারের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান ধারাগুলির মধ্যে মূলভাবগত পার্থক্য রয়েছে। তিনের প্রবণতা যদি ব্যক্তিমনের অনুভূতির প্রকাশ হয়, চার সেখানে মুখ ফিরিয়েছে বাইরের দিকে। যূথচারী হৃদয়ের গাঢ় নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবার বদলে তার কাছে গুরুত্ব পেয়েছে এই মরপৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা বেদনা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, পাঁচের দশক পূর্ববর্তী বাংলা কবিতার দুটি প্রধান প্রবণতা দুই দশকে উঠে এসেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং সমাজকেন্দ্রিকতা।

এরপর আসা যাক তৃতীয় অধ্যায় প্রসঙ্গে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম "জীবনানন্দ দাশ এবং পাঁচের দশকের কবিরা"। এই অধ্যায়ে মোট দুটি উপ অধ্যায় রয়েছে। প্রথমটিতে আলোচিত হয়েছে জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একটি অভিসন্দর্ভের একটি অধ্যায়ের মধ্যের কোনো উপ-অধ্যায়ে জীবনানন্দ দাশের মতো

একজন কবির সমগ্র কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা নেহাতই বাতুলতা মাত্র। তাই এখানে জীবনানন্দ দাশের কাব্যের কিছু বৈশিষ্ট্যই কেবলমাত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। *ঝরা পালক* (১৯২৭)কে কবির প্রথম অপরিণত প্রচেষ্টা হিসেবে সরিয়ে রাখলে সমগ্র জীবনানন্দ দাশের কাব্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) পর্যায় যার মধ্যে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬) ছাড়া রাখা যেতে পারে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭) কে-কারণ এর রচনাকাল ধূসর পাণ্ডুলিপির কাছাকাছি সময়ে। এই দুই কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয় প্রকৃতি চেতনা। যদিও তার পাশাপাশি প্রেম ও মৃত্যুচেতনাও বিশেষ স্থান লাভ করেছে এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। বিশেষত *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলির মধ্যে মৃত্যুচেতনা একটি প্রধান ভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে। *বনলতা সেন* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে এসে প্রকৃতি ও মৃত্যুচেতনার প্রাধান্যকে খর্ব করে প্রধান ভাবের স্থান লাভ করেছে প্রেম।

বনলতা সেন (১৯৪২) পরবর্তীকালে প্রেম-প্রকৃতি-মৃত্যু এইসব ভাব এবং আত্মনিমগ্নতার আধিপত্যকে খর্ব করে উঠে এসেছে সমাজচেতনা। এর সূচনা *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪) এর হাত ধরে এবং পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ যেমন- *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮), *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১) এবং *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৫৪) এ প্রথম বার প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যেও দেখা যায়। এই পর্যায়ের জীবনানন্দ সেই অর্থে পাঠকের কাছে ‘জনপ্রিয়’ নন। সাধারণ পাঠক এখনো জীবনানন্দ বলতে প্রকৃতি-প্রেম-মৃত্যু অর্থাৎ *বনলতা সেন* কিংবা *রূপসী বাংলা*-ই বোঝেন। যদিও *মহাপৃথিবী* এবং *সাতটি তারার তিমির*-এর কিছু কবিতা আলাদা করে জনপ্রিয়, যেমন- ‘আট বছর

আগের একদিন', কিংবা 'আকাশলীনা'। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলি *বনলতা সেন* কিংবা *রূপসী বাংলা* -র মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *বনলতা সেন* গ্রন্থটি প্রথমে যখন ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের বই হিসেবে প্রকাশিত হয়, তখন মোটেও তা বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে সিগনেট প্রেস থেকে নবকলেবরে প্রকাশিত সত্যজিত রায়ের প্রচ্ছদ সম্বন্বিত *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থটিই লাভ করে জনপ্রিয়তা। সেই অর্থে দেখতে গেলে জীবনানন্দের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভের সূচনাকাল এই পাঁচের দশকই। তাই পাঁচের দশকের কবিদের দ্বারা জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ একটি সহজাত প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতেই পারে।

গবেষণা-প্রণালীর দিক থেকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিক প্রতিগ্রহণচর্চার অন্তর্গত। এই তত্ত্বের নিরিখে জীবনানন্দ দাশের কবিতা এখানে প্রেরক বা উৎসের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই প্রতিগ্রহণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পূর্বে প্রেরকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল আর এই অধ্যায়ের প্রথম উপ-অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শিরোনাম "জীবনানন্দ দাশ এবং পাঁচের দশকের কবিরা"। শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট যে, অধ্যায়ের প্রথম অংশের আলোচনা যদি প্রতিগ্রহণ চর্চার প্রেরক অংশ অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে হয়, তাহলে দ্বিতীয় অংশে অবশ্যই স্থান লাভ করবে প্রতিগ্রহণ চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রাহক। এই অভিসন্দর্ভে

গ্রাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে পাঁচের দশকের কবিকুল। তাই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে তাঁরাই।

এই দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে পাঁচের দশকের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এই কবিদের তালিকার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম - আলোক সরকার (১৯৩১), শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩১), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩), অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪), বিনয় মজুমদার(১৯৩৪), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬), তারাপদ রায় (১৯৩৬), উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭), প্রমুখ। এই উপ-অধ্যায়টি থেকে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতার সামান্য লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মূলত *কৃত্তিবাস* (১৯৫৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এঁদের অধিকাংশের উত্থান এবং অধিকাংশ কবির অধিকাংশ কবিতার মূল ভাব আত্মনিমগ্নতা। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* গ্রন্থে “পঞ্চাশ” শীর্ষক প্রবন্ধে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন-

“পঞ্চাশের শুরু থেকে খানিক দূর তাকালে দেখা যায় কেবল একলার স্বগতাচারে কবি নিরত হয়েছেন প্রকৃতি-ভালোবাসার নবপত্রস্ফুট নিরালাতে, ‘নিসর্গের লতাফুলপাতার আড়ালে আড়ালে সোনার ফল’- এমনই সদ্যজায়মান যে তাতে পূর্বজ কবির পুরাণ-লোকায়তের ছায়ালেশ নেই। পূরক হয়ে আছে প্রেম আর প্রকৃতি পরস্পরে”[৪]

ওই একই প্রবন্ধে কিছুদূর এগিয়ে তিনি বলছেন-

"ভুল হয়ে যায় মাত্র কতক দিন আগে মারী আর রক্ত-স্নান সেরে উঠেছে এই শহর, সাতচল্লিশের পরে উৎখাত হয়ে যেতে বসেছে রাজনীতি-অর্থনীতির নতুন অনিশ্চয়ে, দেশভাগের ভার একটু একটু চাপ কেটে বসছে সর্বত্র-সমাজে।"[৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে পাঁচের দশককে কোনোভাবেই শান্ত নিরুপদ্রব সুখের বা আনন্দের সময় বলা যায় না, যেমন যায় নি তিনের দশকেও। সেখানেও দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝে যেন সামান্য একটু বিরতিমাত্র। তাই মূল ভাবের দিক থেকে প্রধানত প্রকৃতি ও প্রেমের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চাওয়া এই দশকের কবি ও কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হয়েছে বেঁচে থাকার গান। একথাও কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এই ব্যাপারে শঙ্খ ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্যযোগ্য। তাই অলোকরঞ্জন শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে যুগপৎ 'আত্মগত ও সম্মেলক' বলে অভিহিত করেছেন।[৬]

আত্মনিমগ্নতা কিংবা সমাজমুখিনতা- এর কোনোটাই যে এই অভিসন্দর্ভের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিগ্রহণ চর্চায় যেহেতু উৎস বা প্রেরকের থেকে গ্রাহককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তার নিরিখেই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা হয়, তাই পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রাহকের থেকে প্রেরকের দিকে যাত্রা করার পূর্বে এই অধ্যায়ে প্রেরক এবং গ্রাহকের সাথে পরিচিতিকরণ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই এই তৃতীয় অধ্যায়ের দুটি উপ-অধ্যায়ে উৎস এবং প্রেরক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এরপর আসা যাক চতুর্থ অধ্যায় প্রসঙ্গে। গুরুত্বের বিচারে অভিসন্দর্ভের এই অংশটি সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিগ্রহণ চর্চার প্রধান দুটি উপাদান অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রাহকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রাহক অংশের বিবরণ দিতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল যে পাঁচের দশকের বেশ কয়েকজন কবির কবিতাতে জীবনানন্দের প্রভাব রয়েছে। সেই প্রভাবের পরিমাণগত ও গুণগত মান যাচাই এর পর এই অধ্যায়ে এসে , মোট পাঁচজন কবিকে চিহ্নিত করা হল যাদের মধ্যে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের স্বরূপ অনেকখানি স্পষ্ট। এঁরা হলেন-

আলোক সরকার (১৯৩১), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩), বিনয় মজুমদার(১৯৩৪), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬), উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭), প্রমুখ।

এই পাঁচজন কবির মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩) এবং বিনয় মজুমদার(১৯৩৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নাম। কারণ জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে এই দুই কবির রচনায়। তাই এই দুই কবির জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ পৃথকভাবে দুটি উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আর শেষ অর্থাৎ তৃতীয় উপ-অধ্যায়টিতে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে অবশিষ্ট তিন কবি অর্থাৎ আলোক সরকার (১৯৩১), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬) এবং উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭) র জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ। কারণ অন্য দুই কবির নিরিখে এই তিন কবির কবিতায় জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ পরিমাণগত ভাবে খুবই কম।

প্রথমেই আসা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ প্রসঙ্গে। জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম শক্তি

চট্টোপাধ্যায়। গদ্যরচনা দিয়ে সাহিত্যিক জীবন শুরু করে পরে 'পদ্য' রচনায় উৎসাহী হয়ে পড়া শক্তি জীবনানন্দকে সারাজীবন ধরেই প্রতিগ্রহণ করেছেন। যদিও কবিজীবনের শুরুতে এই প্রতিগ্রহণের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। তারপর সময় যত এগিয়েছে, আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে কবির নিজস্ব কাব্যভাষা। শব্দ আর ছন্দ নিয়ে যেন খেলাচ্ছলে যা ইচ্ছে তাই করেছেন। কিন্তু পরিণত কবিজীবনে এসেও একেবারে সরে আসেন নি জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ থেকে। যদিও কমেছে প্রতিগ্রহণের পরিমাণগত মাত্রা।

শক্তির কবিতায় জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণকে যে যে ক্ষেত্রে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি হল-

প্রথমত, কবিতার ছন্দ বিশেষত মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

দ্বিতীয়ত, শব্দ, চিত্রকল্প ও কাব্যভাষায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

তৃতীয়ত, নিজের কবিতায় ভিন্ন প্রেক্ষিতে জীবনানন্দের কবিতার এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তির পুনর্ব্যবহার

চতুর্থত, শক্তির প্রকৃতিচেতনায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

পঞ্চমত, শক্তির মৃত্যুচেতনায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

ষষ্ঠত, প্রেমের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ

উপরের ছটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে আসা যাক ছন্দের প্রসঙ্গে। শক্তি এবং জীবনানন্দ- উভয়েই মিশ্রবৃত্ত রীতির সুদক্ষ শিল্পী। নিজের প্রথম এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ ছাড়া জীবনানন্দ যেমন অন্য কোথাও মিশ্রবৃত্ত রীতির বাইরে অন্য কোনো ছন্দ প্রায় ব্যবহারই করেন নি[৭], শক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি সেরকম নয়। মিশ্রবৃত্তের পাশাপাশি সরলবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দেও তিনি যথেষ্ট দক্ষ। এ প্রসঙ্গে ছান্দসিক নীলরতন সেন দেখিয়েছেন সরলকলাবৃত্তের চেয়ে মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্তে তিনি অনেক বেশি কবিতা লিখেছেন।[৮] এই আলোচনায় যেহেতু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ প্রাসঙ্গিক, তাই এখানে শুধু মাত্র শক্তির মিশ্রবৃত্তে রচিত কবিতার ওপরেরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্তে রচিত কবিতাগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। শক্তি এবং জীবনানন্দ- উভয় কবির মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দ ব্যবহারে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও মিশ্রবৃত্ত রীতির কবিতাতে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশেষত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য-* তে ২৮ কিংবা ৩০ মাত্রার পঙ্‌ক্তির উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। শক্তির পূর্বে এই দীর্ঘ মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির প্রয়োগ যাঁর কলমে জনপ্রিয় হয়েছিল, তিনি জীবনানন্দ। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ তো গেল ছন্দোরীতির কথা। ছন্দোবন্ধের ক্ষেত্রেও শক্তি জীবনানন্দ-পন্থী। ১০+৮ অর্থাৎ ১৮ মাত্রার মহাপয়ারকে ২২, ২৪ কিংবা ২৮ মাত্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে মৃদুমন্দ গজগামিনী চলনের যে সূত্রপাত জীবনানন্দ করেছিলেন[৯], তাকে সফলভাবে প্রতিগ্রহণ করে করে শক্তি করেছেন মহাপয়ারের নবনির্মাণ। কখনো ১৮ মাত্রার সাথে একটি

অতিরিক্ত ১০ মাত্রার পদ যুক্ত করে পঙ্‌ক্তিকে করেছেন ২৮ মাত্রার[১০], কখনো আবার সেই পঙ্‌ক্তি ৩০ মাত্রার।[১১] সুতরাং মহাপয়ারের এই প্রসারের ক্ষেত্রেও শক্তি সফল ভাবে প্রতিগ্রহণ করেছেন জীবনানন্দকে। এছাড়া, জীবনানন্দের কবিতার ছন্দের অপর যে বৈশিষ্ট্যটি শক্তির কবিতায় প্রকট, সেটি হল অসম পঙ্‌ক্তির ব্যবহার। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত একাধিক কবিতায় এই অসম পঙ্‌ক্তির ব্যবহার দেখা যায়।[১২] সুতরাং বলা যেতে পারে কলাবৃত্ত কিংবা দলবৃত্তের সুদক্ষ শিল্পী শক্তি চট্টোপাধ্যায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দে দীর্ঘ পংক্তি রচনা করে জীবনানন্দ-সুলভ তানপ্রবণতায় মজে গিয়েছিলেন। আরও দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ-প্রভাবিত এই ছন্দ-মেদুরতা নির্মাণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি ছিল তাঁর কবি জীবনের শুরুর দিকেই । এ কথা স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই যে সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তকেই। যদিও মাঝে মাঝেই ফিরে গেছেন মিশ্রবৃত্তের আশ্রয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে *হেমন্ত যেখানে থাকে* (১৯৭৭) র মতো কাব্যগ্রন্থের কথা যার বেশিরভাগ কবিতাই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত এবং সেগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দীয় দীর্ঘ পংক্তি রচনার প্রবণতা। চতুর্দশপদী কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও রচনাকালের দিক থেকে এগুলি কবির কাব্যজীবনের প্রথম দিকেরই লেখা। অবশ্য অধিকাংশ সময়ে জীবনানন্দের অন্ত্যমিলের প্রবণতাকে তিনি গ্রহণ করেন নি । এইভাবে বলা যায়, বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছন্দোশিল্পী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মিশ্রবৃত্তে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ বহুলাংশেই পড়েছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের আরেকটি প্রধান দিক হল নিজের কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে জীবনানন্দের কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তির পূর্ণ বা আংশিক পুনর্ব্যবহার। প্রতিগ্রহণের পরিভাষায় একে আন্তর্পাঠ বলা যেতে পারে। শুধু পঙ্‌ক্তি নয়, অনেক সময়ে জীবনানন্দের কবিতার কোনো চরিত্রকেও শক্তি ব্যবহার করেছেন নিজের কবিতায়। এ প্রসঙ্গে ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’ এবং ‘সুরঞ্জনা’- বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু তা-ই নয়, জীবনানন্দীয় কিছু শব্দ, শব্দগুচ্ছ, চিত্রকল্প- বারবার উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। এ প্রসঙ্গে সত্রাজিৎ দত্ত লিখেছেন-

“...শুধুমাত্র তাঁর কাব্যমানসই নয়, তাঁর বাক্‌ভঙ্গি, শব্দ ও ভাষাব্যবহারেও যে-প্রবণতা লক্ষণীয়, তা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন এক জগতের কবি হিসেবে চিহ্নিত করে।...শব্দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে আপাত-অব্যবহার্য যে-সব নির্ভেজাল ভাবে অকাব্যিক, দেশজ, কথ্য, কখনো-কখনো নিঃসন্দেহে অশালীন শব্দকে তিনি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন, তা...তাঁর জীবনানন্দীয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কাব্যধারণাকেই সূচিত করে।”[১৩]

কিন্তু জীবনানন্দীয় পঙ্‌ক্তি, শব্দ, সাধু-চলিত মিশ্রিত কাব্যভাষা- সব মিলিয়ে তাঁর কবিতার স্থানে স্থানে জীবনানন্দীয় বাতাবরণ তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত কবি বজায় রাখতে পেরেছেন স্বকীয়তা। তাই জীবনানন্দের অনুকরণ না হয়ে এগুলি হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানেই কবি শক্তির কবিশক্তি।

শুধু পঙ্‌ক্তির ব্যবহার নয়, শক্তির কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম এবং মৃত্যুচেতনার মধ্যেও বিশেষ ভাবে মিশে আছে জীবনানন্দীয় আঘ্রাণ। শক্তি এবং জীবনানন্দ- উভয়

কবির কবিতাতেই হেমন্তের বহুমাত্রিক রূপ দেখা যায়। বাংলার খুব কম কবির লেখনীতেই হেমন্তের ছবি ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দ-পরবর্তী সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেইসব হেমন্তপ্রেমী কবিদের মধ্যে প্রধানতম। শক্তির হেমন্তের প্রতি আকর্ষণ তাঁর জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবির প্রেম ও মৃত্যুচেতনার ক্ষেত্রেও স্থানে স্থানে প্রকট হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের প্রভাব। এ প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত *ধর্মে আছো জিরাফেও আছো* (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থের ‘সরোজিনী বুঝেছিল’ শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করা যায় যাকে জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* কাব্যগ্রন্থের ‘সপ্তক’ কবিতার প্রত্যক্ষ প্রতিগ্রহণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে দেখা গেল, কবিতার ছন্দ, ভাষা, চিত্রকল্প নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রেম, প্রকৃতি এবং মৃত্যুভাবনার ক্ষেত্রেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের চেতনাজগতের ছাপ দেখা গিয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্যের পরিভাষায় একে অনুকরণ, অনুসরণ কিংবা প্রভাব না বলে প্রতিগ্রহণ বলাই শ্রেয় কারণ একটা সময় পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে জীবনানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব শৈলী, ভাষা এবং কাব্যজগত। এমন কি, কাব্যের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সরাসরিভাবে জীবনানন্দের কোনো কবিতার এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তিকে সামান্য বদলে ব্যবহার করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কবিতাটিকে জীবনানন্দের কবিতার প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্মাণ করেছেন ভিন্ন পরিসর। শক্তির জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যেই এই প্রতিগ্রহণের ছাপ যতখানি সুস্পষ্ট, পরবর্তী সময়ে ততখানি নয়। শুধু শক্তি নয়, যেকোনো বড় কবিই তাঁর কবিজীবনের শুরুতে আকর সংগ্রহ করেন পূর্বসূরীদের থেকে, পরিণত হবার পর ক্রমশ কমে যায় সেই ঋণকৃত্য ভাব-ভাষা-শৈলীর পরিমাণ। নির্মিত হয় তাঁর নিজের কাব্যভাষা। শক্তির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এরপর আসা যাক বিনয় মজুমদারের প্রসঙ্গে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়া পাঁচের দশকের যে কবির কবির কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি মেলে, তিনি হলেন বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬)। তাঁর জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের স্বরূপ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের থেকে কিছুটা আলাদা। শক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রথম কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ *হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য* (১৯৬১) এর মধ্যে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থাকলেও তা কখনোই তুলনামূলক সাহিত্যের পরিভাষায় “অনুকরণ” ছিল না। বরং তা ‘অনুকরণ’ এর পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে পৌঁছাতে পেরেছিল “প্রতিগ্রহণ” এর স্তরে। কিন্তু এর ঠিক তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হওয়া বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দ-অনুকরণের স্তরেই আটকে ছিল। বিনয়ের নিজস্ব কাব্যভাষা তখনো নির্মিত হয় নি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *গায়ত্রীকে* (১৯৬১) যা পরবর্তীকালে *ফিরে এসো, চাকা* নামেই অধিক প্রসিদ্ধ- সেখানে প্রথম পাওয়া গেল বিনয়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত। সেখান থেকে শুরু করে ১৯৭৬ সালে *বাল্মীকির কবিতা* পর্যন্ত বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হয়। এরপর থেকে বিনয়ের কবিতা

বাঁক নেয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। উপমা, চিত্রকল্প, কাব্যময়তা সব কিছুকে বর্জন করে বিনয় গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যভাষা- যেখানে কাব্যহীনতাই কাব্য। জাগতিক সব কিছুর প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক, অকাব্যিক বিবরণ প্রদানকেই তিনি কবিতার বিষয় বস্তু করে তোলেন। ফলে জীবনানন্দীয় জগত চলে যায় অন্তরালে। সুতরাং, জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রাভেদকে মাথায় রেখে বিনয় মজুমদারের কবিজীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

অনুকরণ পর্ব

প্রতিগ্রহণ পর্ব

এবং জীবনানন্দের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত শেষ পর্ব।

অনুকরণ পর্বের মধ্যে রাখা যায় শুধুমাত্র তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮) কে। এই পর্বে কাব্যভাষা, শৈলী, উপমা, কাব্যজগত সবকিছুতেই বিনয় জীবনানন্দকে পুরোপুরি অনুসরণ করছেন।

এরপর *গায়ত্রীকে* (১৯৬১) বা *ফিরে এসো,চাকা* (১৯৬২) থেকে *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত সময়কে বিনয়ের কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই পর্যায়ে তিনি জীবনানন্দ অনুকরণের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে নির্মাণ করছেন নিজস্ব কাব্যভাষা। জীবনানন্দকে এই পর্বে তাঁর পথ নয়, পাথেয়। এই পর্বেই রচিত হয়েছে বিনয়ের কবিজীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ *ফিরে এসো, চাকা* (১৯৬২) এবং *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (শ্রাবণ, ১৩৮১বঙ্গাব্দ)। এই পর্যায়ে রচিত বাকি কাব্যগ্রন্থগুলি হল-

ঈশ্বরীর (১৯৬৪), *অধিকন্তু* (১৯৬৭), *বাল্মীকির কবিতা* (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া এই পর্বে *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫) নামে বিনয়ের একটি কাব্য সংকলনও প্রকাশিত হয়। বিনয়ের কবিজীবনের এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সৃজনাত্মক অধ্যায়।এই পর্বটিকে বিনয়ের জীবনানন্দ প্রতিগ্রহণ পর্ব হিসেবে সূচিত করা যেতে পারে।

বিনয় মজুমদারের জীবনানন্দের প্রভাব-মুক্ত শেষ পর্ব যা শুরু হচ্ছে (*আমাদের বাগানে* (১৩৯১ বঙ্গাব্দ) এবং *আমি এই সভায়* ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) থেকে, তার মধ্যে জীবনানন্দের কোনো প্রতিগ্রহণ নজরে পড়ে না। এই পর্বের বিনয় সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যঞ্জনা, উপমা, সবকিছু বর্জন করে কবি প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু দেখছেন তার সোজাসাপটা বর্ণনা দিচ্ছেন কবিতায়। *এক পংক্তির কবিতা* (১৯৮৮) এবং *হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ* (২০০৩) এর কবিতাগুলির মধ্যে অবশ্য কাব্যগুণ বর্তমান। এই পর্বে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সামগ্রিকভাবে জীবনানন্দীয় জগতের রেখাপাত খুব একটা ঘটেনি।

ছন্দের ক্ষেত্রেও বিনয় মজুমদার জীবনানন্দকে প্রতিগ্রহণ করেছেন। জীবনানন্দের মতো তিনিও মূলত মিশ্রকলাবৃত্তেরই কবি। উপরে বিনয়ের সমগ্র কবিজীবনকে যে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের সব কবিতাই লেখা হয়েছে মিশ্রবৃত্ত ছন্দে। এই ছন্দরীতিকে তিনি ‘পয়ার’ নামে অভিহিত করেছেন।[১৪] তাছাড়া, ‘আমি কাকে মাত্রা বলি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিনয় যেভাবে শব্দের মাত্রা গণনা করেছেন, তা কেবলমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই সম্ভব।

জীবনানন্দকে অনুসরণ করে শুধুমাত্র নিজের কবিতার প্রথম ও প্রধান ছন্দ হিসেবে মিশ্রবৃত্ত রীতির ব্যবহারেই নয়, পূর্বজ কবির ন্যায় সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তি রচনা

করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। *গায়ত্রীকে* তে যে পঙ্‌ক্তি ছিল আঠারো[১৫] কিংবা ছাব্বিশ[১৬] মাত্রার মিশ্রবৃত্তে নির্মিত, *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* কাব্যগ্রন্থে এসে সেই পঙ্‌ক্তি প্রসারিত হল কিংবা তিরিশ[১৭] মাত্রায়। এইভাবে জীবনানন্দের মিশ্রবৃত্তের তানপ্রবণতা[১৮] সংক্রমিত হয়েছে বিনয়ের মিশ্রবৃত্তে। এখানেই বিনয়ের কবিতার ছন্দে জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের সৌন্দর্য লক্ষণীয়।

সুতরাং দেখা গেল বিনয় মজুমদারের কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি কালানুক্রমিক ব্যস্তানুপাতিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় যা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। সময়ের সাথে সাথে শক্তির জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রা কমলেও মাঝে মাঝেই তার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছে। বিনয়ের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। *বাল্মীকির কবিতা-র* পরে দু একটি ব্যতিক্রমী কবিতা ছাড়া মোটের ওপর জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণ এক প্রকার অনুপস্থিতই বলা যায়। দ্বিতীয়ত, ছন্দের ক্ষেত্রে বিনয়ের জীবনানন্দ-প্রতিগ্রহণের মাত্রা শক্তির তুলনায় অনেক বেশি, কারণ শক্তি যেখানে তিন প্রকার ছন্দেই কবিতা লিখেছেন, বিনয় সেখানে দু একটি ব্যতিক্রম এবং শেষের দিকের গদ্য কবিতা বাদ দিয়ে একান্ত ভাবেই মিশ্রবৃত্তের শিল্পী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতার ছন্দে জীবনানন্দের প্রভাব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দে জীবনানন্দের প্রভাবের তুলনায় অনেক বেশি।

এরপর চতুর্থ অধ্যায়ের পরবর্তী উপ অধ্যায়ে পাঁচের দশকের আরো তিনজন কবির কবিতায় জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা হলেন আলোক সরকার (১৯৩১), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬) এবং উৎপল কুমার

বসু (১৯৩৭)। এঁদের কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা বিনয় মজুমদারের মতো প্রকট নয়। তাই এখানে আলোচনার পরিসর দীর্ঘায়িত করা হয় নি। এই তিন কবির প্রধান অনুপ্রেরণা জীবনানন্দ ছিল না। নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণের পথে স্থানে স্থানে অতি স্বল্প মাত্রায় প্রচ্ছন্ন ভাবে এঁরা প্রতিগ্রহণ করেছেন জীবনানন্দকে। তিন কবির মধ্যে আলোক সরকার যে জীবনানন্দকে গ্রহণ করেছেন, তিনি মূলত *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬)-র জীবনানন্দ। আলোক সরকারের প্রকৃতিচেতনার মধ্যে যে আপাত শান্ত পরিবেশ এবং আলো-আঁধারির মায়াময়তা রয়েছে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কিংবা *রূপসী বাংলা-র* জীবনানন্দকে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম। আপাতভাবে দেখলে প্রণবেন্দুর কবিতার বহিরঙ্গে জীবনানন্দের প্রভাবের প্রমাণ খুবই স্বল্প। কিন্তু, প্রেমের নিবিড় আন্তরিকতার অন্তরালে কোথায় যেন সুপ্ত থাকে জীবনানন্দীয় চেতনা জগতের শাশ্বত বেদনার নিয়ন্ত্রিত আবেগ। আলোক সরকারের প্রকৃতির মধ্যে যদি জীবনানন্দ রয়ে যান, তাহলে প্রণবেন্দুর সহজ আন্তরিক প্রেমের আহ্ববানে মিশে থাকেন জীবনানন্দ দাশ।

এবার উৎপল কুমার বসুর প্রসঙ্গে আসা যাক। উৎপল যেন 'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটা এক ক্লান্ত প্রাণ। প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজে তিনি মুছে নিতে চান সেই অনন্ত পথিকের ক্লান্তি। প্রকৃতি তাঁর কাছে যেন একমুঠো শান্তি। সাবলীল চলন তাঁর গ্রাম থেকে শহর- যেকোনো জনস্থানে। লোকালয় এবং নির্জন- কোনো প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণই বাদ পড়েনি তাঁর সুতীব্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা থেকে। তাই জীবনানন্দের

শুধু *ধূসর পাণ্ডুলিপি-বনলতা সেন* পর্যায় নয়, তার পাশাপাশি *মহাপৃথিবী-সাতটি তারার তিমির* পর্যায়ের নাগরিক জীবন বর্ণনার প্রতিবিম্বের প্রতিগ্রহণও ঘটেছে উৎপলের কবিতায়।

এইভাবে এই অভিসন্দর্ভে পাঁচের দশকের কবিদের কবিতার মধ্যে কীভাবে জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হল। আলোচনা থেকে উঠে এল যে পাঁচের দশকের কবিদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন একাধারে পাথেয় এবং প্রতিবন্ধকতা। জীবনানন্দীয় জগত থেকে কাব্যরচনার আকর সংগ্রহ করে এই সময়ের কবিরা যেমন কবিতা রচনার রসদ লাভ করতেন, তেমনি অনেক কবি সেই শৈলী থেকে বেরিয়ে এসে পরবর্তীকালে নিজস্ব কাব্যশৈলী নির্মাণ করতে ব্যর্থও হতেন। এই সময়ের অধিকাংশ কবিই কোনো না কোনো পর্যায়ে জীবনানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সমস্ত কবিকে এই সন্দর্ভের অন্তর্ভূক্ত করা বাস্তবিকই সম্ভবপর নয়। তাই প্রতিগ্রহণের মাত্রা এবং গ্রাহক কবিদের গুরুত্ব বিচার করে দেখা গেছে প্রধানত দুইজন কবির দ্বারা জীবনানন্দ সর্বাধিক প্রতিগৃহীত হয়েছেন। এঁরা হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩) এবং বিনয় মজুমদার(১৯৩৪)। এঁদের পাশাপাশি আরও তিনজন কবির কবিতাতেও জীবনানন্দের প্রতিগ্রহণ ঘটেছে। যদিও সেই প্রতিগ্রহণের মাত্রা পরিমাণগতভাবে আগের দুই কবির তুলনায় অনেক কম। এঁরা হলেন আলোক সরকার (১৯৩১), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৩৬) এবং উৎপল কুমার বসু (১৯৩৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই আলোচনা মূলত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যেই। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশের কবিদের এই অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

---

[১] Susan Basnett, *Introduction to Comparative Literature: A Critical Introduction* (Oxford, Blackwell, 1993), 10.

[২] Robert C. Holub, *Reception Theory A Critical Introduction.*,

(London and New York: Methuen1984),84.

[৩] তদেব।

[৪] দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* সম্পাঃ অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতাঃ ভারত বুক এজেন্সি ২০০৩), ১৫৯।

[৫] তদেব, ১৬০।

[৬] তদেব, ১৬১।

[৭] শঙ্খ ঘোষ, 'শত জলঝরণার ধ্বনি', *ছন্দের বারান্দা,* (কলকাতাঃ অরুণা ১৪১৪),৬৭।

[৮] নীলরতন সেন, শ্লোক কবিতাপত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পাঃ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪-০৫, ১৭৯।

[৯] শঙ্খ ঘোষ, 'শত জলঝরণার ধ্বনি', *ছন্দের বারান্দা,* (কলকাতাঃ অরুণা ১৪১৪),৬৭।

[১০] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ২১।

[১১] তদেব।

[১২] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *পদ্যসমগ্র-২* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮বঙ্গাব্দ), ৩৫।

[১৩] সত্রাজিৎ দত্ত, "দুই মেরু", *কবিতা পত্রিকা,* সম্পাঃ বুদ্ধদেব বসু, চৈত্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ২৫।

[১৪] বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয়':প্রথম পর্ব', *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য,* সম্পাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ, (কলকাতাঃ প্রতিভাস,২০০২), ৫৬।

[১৫] বিনয় মজুমদার, '২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১০।

[১৬] বিনয় মজুমদার, '১৪ অক্টোবর,১৯৬০', *ফিরে এসো,চাকা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ), ১২।

[১৭] বিনয় মজুমদার, '৪নং কবিতা', *অঘ্রানের অনুভূতিমালা, কাব্যসমগ্র-১,*সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬), ৯২।

[১৮] শঙ্খ ঘোষ, 'শত জল ঝরণার ধ্বনি',*ছন্দের বারান্দা* (কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), ৭০।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

আকর গ্রন্থ

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ২.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ৩.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ৪.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ৫.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ৬.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *পদ্যসমগ্র ৭.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *অগ্রন্থিত পদ্যগদ্য.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *অগ্রন্থিত পদ্য অনুবাদ.* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

দাশ, জীবনানন্দ। *ঝরা পালক* .কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *ধূসর পাণ্ডুলিপি.* কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *বনলতা সেন.* কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *মহাপৃথিবী.* কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *সাতটি তারার তিমির.* কলকাতাঃ ভারবি, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলিকাতাঃ ভারবি, ১৯৮৮।

দাশ, জীবনানন্দ। *বেলা-অবেলা-কালবেলা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

দাশ, জীবনানন্দ। *রূপসী বাংলা* .কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতার কথা.* কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

দাশ, জীবনানন্দ। *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র.* সম্পাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান। ঢাকাঃ অবসর, ২০০৫।

দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু। *কবিতা সমগ্র ১,* কলকাতাঃ প্রমা প্রকাশনী, ২০০৯।

বসু, উৎপল কুমার। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯১।

বসু, উৎপল কুমার। *কবিতা সংগ্রহ.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়।*নক্ষত্রের আলোয়.* কলকাতাঃ গ্রন্থজগৎ, ১৯৫৮।

মজুমদার, বিনয়।*গায়েত্রীকে.* কলকাতাঃ গ্রন্থজগৎ, ১৯৬১।

মজুমদার, বিনয়।*ঈশ্বরীর.* কলকাতাঃ ব্যাক্তিগত প্রকাশনী, ১৯৬৪।

মজুমদার, বিনয়।*ঈশ্বরীর কবিতাবলী.* কলকাতাঃ গ্রন্থজগৎ, ১৯৬৫।

মজুমদার, বিনয়।*অধিকন্তু.* কলকাতাঃ ব্যাক্তিগত প্রকাশনী, ১৯৭২।

মজুমদার, বিনয়। *অঘ্রানের অনুভূতিমালা.* কলকাতাঃ অরুণা, ১৯৭৪।

মজুমদার, বিনয়। বাল্মীকির কবিতা. কলকাতাঃ বিশ্ববানী, ১৯৭৬।

মজুমদার, বিনয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২।

মজুমদার, বিনয়।*আমাদের বাগানে.* কলকাতাঃ সিলভ্যান, ১৯৮৫।

মজুমদার, বিনয়।*আমি এই সভায়.* কলকাতাঃ এবং প্রকাশনী, ১৯৮৫।

মজুমদার, বিনয়।*এক পংক্তির কবিতা.* কলকাতাঃ নৌকা প্রকাশনী, ১৯৮৮।

মজুমদার, বিনয়।*আমাকেও মনে রেখো.* কলকাতাঃ অতএব প্রকাশনী, ১৯৯৫।

মজুমদার, বিনয়।*আমিই গণিতের শূন্য.* কলকাতাঃ দৌড় প্রকাশন, ১৯৯৬।

মজুমদার, বিনয়।*স্বনির্বাচিত ১৬.* কলকাতাঃ বাক্ প্রতিমা, ১৯৯৭।

মজুমদার, বিনয় *এখন দ্বিতীয় শৈশবে.* কলকাতাঃ শিলীন্দ্র, ১৯৯৯।

মজুমদার, বিনয়।*কবিতা বুঝিনি আমি.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০১।

মজুমদার, বিনয়। *ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য.* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০২ ।

মজুমদার, বিনয়।*সমান সমগ্র সীমাহীন.* কলকাতাঃ গ্রন্থি প্রকাশন, ২০০৪।

মজুমদার, বিনয়। শিমুলপুরে লেখা *কবিতা.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০৫।

মজুমদার, বিনয়। *ফিরে এসো, চাকা.* কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

মজুমদার, বিনয়। *হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়। *পৃথিবীর মানচিত্র.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়। *বিনোদিনী কুঠি.* কলকাতাঃ অফবিট, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়। *ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়। *বিনয় মজুমদারের ডায়েরি.* সম্পাঃ কমল মুখোপাধ্যায় ও অজয় নাগ। কলকাতাঃ শিলীন্দ্র, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়। *কাব্যসমগ্র-১.* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৬।

মজুমদার, বিনয়।*কাব্যসমগ্র-২.* সম্পাঃ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০০৭।

সরকার, আলোক। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

সহায়ক গ্রন্থ

আইয়ুব আবু সৈয়দ ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাঃ 'ভূমিকা', *আধুনিক বাংলা* কবিতা. কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯।

আচার্য, ফণীভূষণ। *ছেঁড়া ক্যান্‌ভাস.* কলকাতাঃ বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। সম্পাঃ *কৃত্তিবাস নির্বাচিত সংকলন-১.* কলকাতাঃআনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। সম্পাঃ *কৃত্তিবাস নির্বাচিত সংকলন-২.* কলকাতাঃআনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।

ঘোষ, শঙ্খ। *এই শহরের রাখাল.* কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, ১৯৯৬।

ঘোষ, শঙ্খ। *এই সময় ও জীবনানন্দ.* কলকাতাঃ সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।

ঘোষ, শঙ্খ। *কবিতা সংগ্রহ ১.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

ঘোষ, শঙ্খ। *কবির অভিপ্রায়,* কলকাতাঃ প্যাপিরাস. ২০০৫।

ঘোষ, শঙ্খ। *ছন্দের বারান্দা.* কলকাতাঃ অরুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

ঘোষদস্তিদার, গৌতম। সম্পাঃ *নিজের জীবন, বীজের জীবন,* হাওড়াঃ রক্তমাংস, ২০০১।

চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র। সম্পাঃ, *কবিতা পরিচয়.* কলকাতাঃ স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী, ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, সুমিতা। *জীবনানন্দঃ সমাজ ও সমকাল.* কলকাতাঃ সাহিত্যলোক, ১৯৮৭।

চক্রবর্তী, সুমিতা। *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়.* কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *গদ্যসংগ্রহ ১.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *গদ্যসংগ্রহ ২.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *গদ্যসংগ্রহ ৩.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *গদ্যসংগ্রহ ৪.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

চৌধুরী, শীতল।*জীবনানন্দ অন্বেষাঃ বোধের স্বরলিপি.* কলকাতাঃ প্রতিভাস, ২০১০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সোনার তরী.* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী.* দ্বিতীয় খন্ড. কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শেষের কবিতা.* কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী.* তৃতীয়খন্ড. কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী.* চতুর্থখন্ড. কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী.* দ্বাদশখন্ড. কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী.* ত্রয়োদশখন্ড. কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

ত্রিপাঠী, দীপ্তি। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮।

ত্রিপাঠী, দীপ্তি। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।

দত্ত, জ্যোতির্ময়। *জ্যোতির্ময় দত্ত'র প্রবন্ধ সংকলন.* কলকাতাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯।

দত্ত, মধুসূদন। *মেঘনাদবধ কাব্য.* সম্পাঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৮৭।

দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। *কবিতা সংগ্রহ. প্রথম খন্ড.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাঃ। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস.* কলকাতাঃ ভারত বুক এজেন্সি, ২০০৩।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথমপর্যায়.* কলকাতাঃ কলকাতাঃ এ মুখার্জি ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দেবসেন, নবনীতা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ। সম্পাঃ, *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *প্রসঙ্গঃ জীবনানন্দ.* কলকাতাঃ অয়ন, ১৯৮৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা। *কৃত্তিবাস বাংলা কবিতার পালাবদল.* কলকাতাঃ সিগনেট প্রেস, ২০১৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *আমার জীবনানন্দ.* কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

বসু, অম্বুজ। *একটি নক্ষত্র আসে.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭।

বসু, উৎপল কুমার। *গদ্যসংগ্রহ ১.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং ২০০৫।

বসু, বারীন্দ্র। *কবিতা, আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা.* কলকাতাঃ রত্নাবলী, ১৯৮৭।

বসু, বুদ্ধদেব। *কালের পুতুল.* কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স ১৯৯৭ ।

মজুমদার, অমল। সম্পাঃ *বিনয় মজুমদার। অনুধ্যানে, অনুভবে.* কলকাতাঃ কবিতীর্থ, ২০০৭।

মজুমদার, কুমার উজ্জ্বল। *বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।

মিত্র, প্রদুম্ন। *জীবনানন্দের চেতনা জগৎ.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।

মিত্র, মঞ্জুভাষ। *আধুনিক বাংলা কবিতায় ইওরোপীয় প্রভাব* , কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র.* কলকাতাঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬২।

মুখোপাধ্যায়, শরৎ কুমার। *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

রায়, তারাপদ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫।

রায়, দিজেন্দ্রলাল। *রচনাসমগ্র প্রথমখন্ড.* কলকাতাঃ সাক্ষরতা, ১৯৭৩।

রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। *দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড,* সম্পাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ও গোপাল হালদার. কলকাতাঃ সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

শিকদার, অশ্রুকুমার। *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়.* কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

শিকদার, অশ্রুকুমার। *কবির কথা কবিতার কথা.* কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

সিংহ, কবিতা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *কল্লোল যুগ.* কলকাতাঃ এম সি সরকার, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *নূতন ছন্দ পরিক্রমা.* কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.* প্রথম খন্ড, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.* তৃতীয় খন্ড, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.* চতুর্থ খন্ড, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.* পঞ্চম খন্ড, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

ইংরাজি গ্রন্থ

Abrams, M.H. and Geoffrey Harpham. *A glossary of Literary Terms*. USA: Cengage Learning,2001.

Abrams, M.H. *Doing Things with Texts: Essays in Criticism and Critical Theory*, ed. Michael Fischer, New York: W.W. Norton and Company, 1989.

Ayyub, Abu Sayeed. *Modernism and Tagore*. Translated by Amitava Ray, New Delhi: Sahitya Akademi, 1995.

Bakhtin, M, M. *The Dialogic Imagination* Four essays by M.M. Bakhtin. ed. M Holquist. USA: University of Texas Press, 1981.

Balakian, Anna. *Literary origins of Surrealism: a New Mysticism in French Poetry*, New York: New York University Press, 1966.

Baldick, Chris. *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. New York: Oxford University Press, 2004.

Bandopadhyay, Sibaji. Ed. *Thematology,* Literary Studies in India, Kolkata: DSA, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, 2004.

Barthes, Roland. *Image, Music, Text* Translated by Stephen Heath, New York: Hill and Wang, 1977.

Barthes, Roland. *The Pleasure of the Text* Translated by Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.

Basnett, Susan. *Comparative Literature: A Critical Introduction*. Cambridge: Blackwell, 1993.

Bloom, Harold. *The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry*. New York: Oxford University Press, 1973.

Bose, Buddhadeva, *An Acre of Green Grass*. Calcutta: Papyrus, 1997.

Bowers, Fredson. *Bibliography and Textual Criticism*, Oxford: Clarendon Press, 1964.

Chakraborty Dasgupta, Subha. *A bibliography of Reception,* Kolkata: Jadavpur University Press, 1992.

Chakraborty Dasgupta, Subha ed. Genology DSA, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, 2004.

Chanda, Ipshita. ed., *Historiography*, Kolkata: DSA, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, 1994.

Chanda, Ipshita. *Reception of the Received*, Kolkata: Jadavpur University Press, 2006.

Cudon, J.A. *The Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, London:Penguin Books, 1977.

Culler, Jonathan. "Presupposition and Intertextuality" in In Taylor, E. & Winquist, Ch.E. (eds.). *Postmodernism v.2*, London & New York (reprint from MLN v. 91, no. 6,1976). Postmodernism v.2 (1998).

Damrosch, David. What is World Literature?, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003.

Das, Sisir Kumar. A History of Indian Literature, Vol. III, 1800-1910 Western Impact: Indian Response, New Delhi: Sahitya Akademi, 1991.

Das, Sisir Kumar. Indian Ode to the West Wind: Studies in Literary Encounters, Delhi: Pencraft International, 2001.

De, Sushil Kumar. History of Sanskrit Poetics, Firma KLM Pvt Ltd:Calcutta, 1988.

Derrida, Jacques. Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1967.

Dev, Amiya and Sisir Kumar Das, eds. Comparative Literature Theory and Practice, Shimla: Institute of Advanced Study, 1989.

Dev, Amiya. The Idea of Comparative Literature in India, CalcuttA: Papyrus, 1984.

Durisin, Diony'z. Theory of Literary Comparatistics, trans. Jessie Koemanov'a, Batislava: Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 1984.

Eagleton, Terry. "Phenomenology, Hermeneutics, and Reception Theory", in Literary Theory: An Introduction, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.

Even-Zohar, Itamar. Papers in Culture Research, Tel Aviv: Unit of Culture Research, Tel Aviv University, 2010.

Even-Zohar, Itamar. " An Outline of a Theory of the Literary Text." Ha-Sifrut III,3-4, 427-446. (Hebrew: English Summary: i-iii), 1972.

Even-Zohar, Itamar. Papers in Historical Poetics, Tel Aviv : Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, 1978.

Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories, London, New York: Routledge, 1993.

Guillen, Claudio. The Challenge of Comparative Literature, translated by Cola Franzen, Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 1993.

Higgins, J. ed, The Raymond Williams Reader, Oxford: Blackwell, 2001.

Holquist, Michael. Dialogism: Bakhtin and World. London: Routledge, 1990.

Holub, Robert C. Crossing Borders: Reception Theory. Post structuralism, Deconstruction. Madison: University of Winsconsin Press, 1992.

Ingarden, Roman. The Literary Work of Art; An Investigation On the Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature. Translated by George G Grabowicz, Evanston, III: Northwestern University Press, 1973.

Irena R.Makaryk. ed., Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms Toronto: University of Toronto Press, 1993.

Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A theory of Aesthetic Response Baltimore: John Hopkins University Press, 1980.

Iser, Wolfgang. The Implied Reader Baltimore: John Hopkins University Press, 1978.

Jameson, Fredric. "The Ideology of the Text." In The Ideologies of Theory: Essays 1971-86 Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 1988.

Jauss, Hans Robert. Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics Translated by Michael Shaw, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

Jauss, Hans Robert. Toward and Aesthetic of Reception, Translated by Timothy Bahti, Minneapolis:University of Minnesota Press, 1982.

Kristeva, Julia. Revolution in Poetic Language. Translated by Margaret Waller. New York: Columbia University Press, 1980.

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. L.S. Roudiez (ed.) Translated by T. Gora, A. Jardine and L.S. Roudiez, New York: Columbia University Press, 1980.

Lodge, David. Twentieth Century Literary Criticism: A Reader, London: Longman, 1972.

Majumdar Swapan. Comparative Literature Indian Dimensions, Calcutta: Papyrus, 1987.

Mukherjee, Soma (ed). *Comparative Literature Terms and Concepts* Kolkata: Jadavpur University, 2015

Mukherjee, Sujit. Translation as Discovery. New Delhi: Allied Publishers, 1981.

Prawer, S.S. Comparative Literary Studies: An Introduction, London: Duckworth, 1973.

Saussure, Ferdinand de. Course in General Linguistics, London: Fontana, 1974.

Seldan, Raman. Ed. The Cambridge History of Literary Criticism Vol.8: From Formalism to Post structuralism, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Todorov, Tzvetan. “Reading as Construction” in S.R. Suleiman and I. Crosman eds. The Reader in the Text: The Essays on Audience and Interpretation, Princeton: Princeton University Press, 1980.

Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York: Routledge, 1995.

Weisstein, Ulrich. Comparative Literature and Literary Theory: Survey and Introduction, Translated by William Riggan, Bloomington: Indiana University Press, 1973.

Wellek, Rene and Austin Warren. Theory of Literature. London: Penguin Books, 1982.

Williams, Raymond. Marxism and Literature, Oxford: Oxford University Press, 1985.

পত্রপত্রিকা

আদম, সম্পাঃ গৌতম মন্ডল, উৎপল কুমার বসু সংখ্যা, কলকাতা, বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

আলোচনাচক্র, সম্পাঃ চিরঞ্জীব সূর, কলকাতা, অগাস্ট, ২০১৫।

খেয়ালী, সম্পাঃ গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বাঁকুড়া, ২০১৭।

চতুরঙ্গ, সম্পাঃ আবদুর রাউফ, কলকাতা, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩ সংখ্যা।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

নাব্যস্রোত, সম্পাঃ ইয়াসিন খান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৭।

নৌকা, উৎপল কুমার বসু সংখ্যা, বইমেলা, ২০১৬।

বিভাব, জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৮।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, সম্পাঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কলকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

যোগসূত্র, সম্পাঃ বিনয় ঘোষ, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৩।

শ্লোক কবিতাপত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা. সম্পাঃ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতাঃ বেহালা, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪-০৫।

সম্প্রতি ৩য় সংকলন, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

সময় ও সন্ধিক্ষণ, সম্পাঃ মাধব মন্ডল, ১৯ তম বর্ষ, প্রবন্ধ সংখ্যা, মে, ২০১৬।

সংবর্তিকা, উৎসব সংখ্যা, সম্পাঃ নারায়ণ চন্দ্র দাশ, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৬।

সাংস্কৃতিক খবর, সম্পাঃ কাজল চক্রবর্তী, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০০১।

ইন্টারনেট মাধ্যম

https://www.rabindra-rachanabali.nltr.org accessed on 02.02.15.

Fokkema, D. W. "A Semiotic Definition of Aesthetic Experience and the Period Code of Modernism: With Reference to an Interpretation of Les Faux Monnayeurs", Poetics Today *Vol.3, no.1 (winter, 1982): 61-79. http://www.jstor.org/stable/1772206.*

Todorov, Tzvetan. "The Origin of Genres." New Literary History Vol.8, no.1 (Autumn, 1976): 159-170. http://www.jstor.org/stable/468619. Accessed on 07.09.15

Said, Edward. "The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions:, Critical Inquiry Vol.4, no.4 (summer 1978): 673-714. http://www.jstor.org/stable/1342951. Accessed on 08.02.15.